বিজয়ায়ন

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর
জীবনালেখ্য

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

মুখার্জী ব্রাদার্স। কলকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : ১৯৫০

প্রকাশক
সুকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীচন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

গোস্বামী শিষ্য স্বর্গত শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সামন্ত পিতৃদেব শ্রীকরকমলেষু,

পিতঃ,

গোঁসাইজীর তিরোধানের পর কোন আত্মীয়-সতীর্থকে পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, পুরীর জগন্নাথ বড়, পুরীর সমুদ্র বড়, তোমার আরাধ্য গোঁসাইও সেইরূপ বড়। আমার সাধ্য কি সেই দেবপ্রতিম অনন্তপার মহামানবের যথাযথ আলেখ্য রচনা করি। তবু পুত্রের এই অক্ষম প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া যে গোঁসাই-প্রীতি প্রকাশিত, তার জন্য স্বর্গ হইতে নিশ্চয় তোমার সস্নেহ আশীর্বাদ বর্ষিত হইবে। আশীর্বাদ-লোভাতুর পুত্র তাই তোমার দিব্য হস্তে তার এই অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে।

তোমার স্নেহের

রাইমোহন

প্রস্তাবনা

আমার এই গ্রন্থের একটু ইতিহাস আছে। আজ হইতে পঁচিশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে, ইং ১৯৪১।৪২ সালে আমি বিজয়কৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করি, মুখ্যতঃ নিজের তৃপ্তির জন্য। পরে প্রভূত সংকোচের সঙ্গে তাহাদের একটি পূজ্যপাদ দরবেশজীর নিকট পাঠাই, তাঁহার "মন্দির" পত্রিকায় ছাপাইবার অভিপ্রায়ে এবং তিনি সাগ্রহে তাহা ইং ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় মুদ্রিত করেন। আশাতিরিক্ত উৎসাহ পাইয়া তাঁহার সকাশে আর একখানি প্রবন্ধ পাঠাই, তাহাও এপ্রিল সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া, আমার পরবর্তী প্রবন্ধ সহ একপত্রের উত্তরে তিনি আমায় যে পত্র দেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে কি উদার আশীর্বাদে তিনি আমার সামান্য প্রয়াসকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

"রামচন্দ্রপুর, পোঃ মুরাডি (মানভূম)

৩১শে বৈশাখ, ১৩৫০

কল্যাণভাজনেষু,

তোমার চিঠি ও প্রেরিত প্রবন্ধটি পাইলাম। আমি বর্ত্তমান রামচন্দ্রপুর আশ্রমে আছি। আর ৪-৫ দিন পরে পুরী চলিয়া যাইব।

তোমার প্রবন্ধ পাইয়াই তোমাকে চিনিয়া ছিলাম। তথাপি সংশয় ছিল। এবার পরিচয় পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। তুমি আমার আপনার জন; তোমার স্বর্গীয় পিতা ও জ্যেঠামহাশয় আমাকে সহোদর ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা এ জগতে অতুলনীয়।

তোমার লেখা faultless হইতেছে। যে দুটি ছাপাইয়াছি উহা সুন্দর হইয়াছে। যেটি পাঠাইয়াছ, পড়িয়া দেখিলাম এটিও চমৎকার। × × ×

রথ পর্য্যন্ত আমি পুরীতে থাকিব। সেখানে তোমার আরও লেখা পাঠাইও।

কল্যাণ হোক।

শুভার্থী

কিরণচাঁদ দরবেশ

বিজয়ায়ন প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

বিজয়ায়ন প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্বে। প্রথম মুদ্রণের প্রস্তাবনায় আমি শ্রীমদ্ কিরণচাঁদ দরবেশ মহারাজ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য স্বনাম ধন্য অসীমানন্দ সরস্বতী এবং সুসাহিত্যিক বন্ধুবর বিভুপদ কীর্ত্তীর আমার রচনা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার কিছু উল্লেখ করিয়াছি। পূজনীয় সমীমানন্দ সরস্বতী মহারাজ গ্রন্থখানির প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তবে "মন্দিরে" সাদরে উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার বইটি প্রকাশিত হইলে খুবই ভাল হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা বইটি প্রকাশিত হোক।" ৺বিভুপদ কীর্তি ভায়াও বইখানি মন্দিরের ফাইল হইতেই পড়েন এবং আমাকে লেখেন, "তোমার বিজয়ায়ন আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার বিশ্বাস রসগ্রাহীদের এ বই ভাল লাগবে। অনেক দিক দিয়েই রচনাটি সার্থক।" দুঃখের বিষয় তিনি গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই আমাদের ছাড়িয়া যান।

বিজয়ায়ন প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে অনেকেরই যে এই পুস্তক ভাল লাগিয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইবে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি অভিমত হইতে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "আপনি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবের ধর্মমতের, অন্ততঃ সম্প্রদায়গত ধর্মমতের ক্রমিক বিবর্ত্তন এবং তজ্জনিত স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত বিচ্ছেদের ইতিহাসটি এমন যত্ন এবং সূক্ষ্ম বিচারের সঙ্গে উপস্থাপিত করে গেছেন যে মহাপুরুষের ভক্তেরা ত বটেই সাধারণ পাঠকও মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। ···প্রথমে ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে এক অদম্য তত্ত্ব-লিপ্সা, যার জন্যই সমকালীন অনেক তত্ত্বান্বেষী যুবকের মতো গোসাইজী নবপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্মের আলোকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু এইখানেই সমাপ্ত হয়ে যাওয়া যে ভক্তিতত্ত্বের আকর অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এই কথাটি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে আপনি বইখানিতে দেখিয়ে গেছেন। ···গোস্বামী জীবনের মূল সত্যটিকে আপনি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। প্রথম খণ্ডে আপনাকে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে গোস্বামীজীর মতভেদ এবং বিরোধ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দলিল প্রমাণ সহযোগে আলোচনা করতে হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল। প্রথম খণ্ডে যেন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গোস্বামীজীকে তার তেজোময় মূর্ত্তিতে

পেলাম। এবার সম্পূর্ণ মুক্ত এক "হিন্দু" সাধকের পূর্ণ বিকশিত মূর্ত্তিতে তাঁকে দেখবার আগ্রহ লেগে রইল?"

কবি সমালোচক অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র লিখিয়াছেন, "লেখকের বর্ণনা, বিশ্লেষণ স্পষ্ট, সাবলীল এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে।"

বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা লেখেন, "প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসের একদিকেই দলিল বলা যেতে পারে এই জীবনচরিতকে। শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে লেখক বিবৃত করেছেন। আলোচনা সুন্দর এবং নূতনভাবে সেই মহাপুরুষ জীবন-দর্শনের উপর আলোকপাতে উদ্ভাসিত বইখানি আদৃত হবার যোগ্য।"

"মহাদেব" পত্রিকার মতে, "বিজয়ায়ন" গ্রন্থখানি অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেখক বিজয়কৃষ্ণের ঘটনাবহুল জীবনখানি পুরোপুরি চিত্রিত করিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী ধর্মতত্ত্ব, তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি হইতে বহু উদ্ধৃতি আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের পূর্বতন বিখ্যাত জীবনীকার বঙ্ক কর মহাশয় ব্রাহ্মধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে গোস্বামী জীবনের যে দিকগুলিতে আলোকপাত করিতে সাহস পান নাই, বর্তমান লেখক সে দিকগুলিকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নিজের ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। ...লেখকের বচনভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ জলের সহিত তুলনীয়। ...এক কথায় গ্রন্থটির সাহায্যে লেখক সাহিত্য খ্যাতি মন্দিরের বিজয়-তোরণে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছেন।"

উজ্জীবন লিখিয়াছেন, "বিজয়ায়ন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিজয় জীবনের ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরূপ ধারাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখক অশেষ শ্রমসহকারে সমসাময়িক কালের পত্র-পত্রিকার প্রভৃতির সাহায্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে সেকালের সমাজ জীবনের চিত্রও তাঁহার গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্ম প্রচারকের জীবনের মধ্যেই ভাবীকালের সনাতন হিন্দুধর্মের এক মহান সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবনের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার জীবনের অধ্যায়টি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। লেখকের ভাষা সরল ও তথ্যপূর্ণ।"

অমৃত লিখিয়াছেন, "বহুতথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থটি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর অনুরাগী মহলে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

ইহা ব্যতীত বহু পাঠক এই গ্রন্থের অভিনবত্বের প্রশংসা করিয়া অযাচিত পত্র পাঠাইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের আর উদ্ধার করিলাম না।

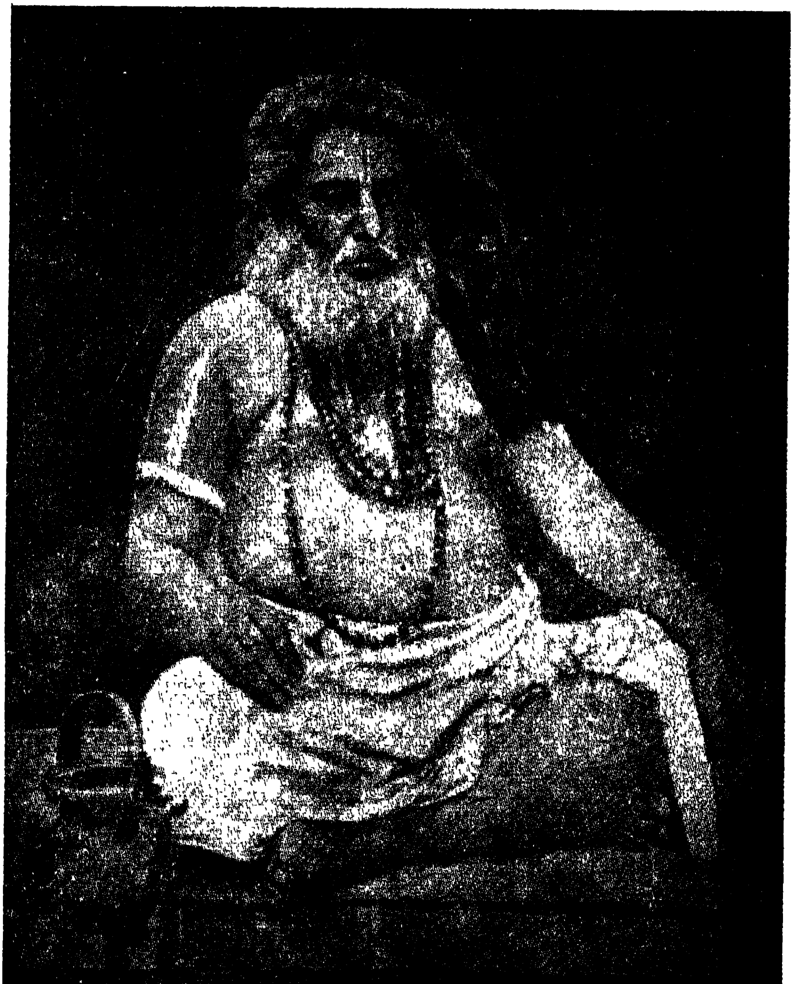
দুর্ভাগ্যের বিষয় বইখানির উৎকৃষ্ট স্বীকৃত হইলেও উপযুক্ত প্রকাশকের হাতে না

থাকায় এবং যথোচিত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা না করিতে পারায়, বিক্রয় খুবই শ্লথ গতিতে হইয়াছে এবং গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড যাহার জন্য অনেক ক্রেতা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করিয়া আছেন, তাহা প্রকাশের এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাও করা সম্ভব হয় নাই। এতদবস্থায় "ভারতের সাধক" গ্রন্থমালার প্রখ্যাত প্রকাশক "করুণা প্রকাশণীর" তরফ হইতে শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার হঠাৎ পরিচয় একটি দৈব ঘটনা বিশেষ। অজানা লেখকের এই সুবৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশের সকল দায় স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইবার উদার প্রস্তাব যেমনই আকস্মিক, তেমনই অপ্রত্যাশিত। বহু দিনব্যাপী সমস্যার এই অবিশ্বাস্য সমাধান আমার পরমারাধ্য বিজয়কৃষ্ণের দিব্য ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলিয়া আমি মনে করি। বর্ত্তমান কালে পুস্তক প্রকাশ যে কত ব্যয় সাপেক্ষ এবং কত বাধাসঙ্কুল, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ঐ সকল বাধা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের প্রথম খণ্ডখানির পুনর্মুদ্রণ শেষ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও ছাপায় কিছু কিছু ভুল রহিয়া গেল। শুদ্ধিপত্রে অপেক্ষাকৃত বড় ভুলগুলিরই শুদ্ধরূপ দেওয়া গেল। বাকী সুস্পষ্ট ভুল যাহা তাহা পাঠক-পাঠিকা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

সমগ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার গুরুভার এখন যথেষ্ট সবল স্কন্ধে বর্ত্তয়াইয়াছে; আশা করা যায় বহুজনের বহুকাল অপেক্ষিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডখানি প্রকাশিত হইতে আর বিলম্ব হইবে না। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থখানি সমাদরে গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া গ্রন্থকার তাহার শ্রম সার্থক বোধ করিবে এবং প্রকাশক তাঁহার সৎ সাহস প্রাপ্য মর্য্যাদা পাইয়াছে ভাবিতে পারিবেন।

প্রথম খণ্ডের প্রথম মুদ্রণের বিক্রয় ব্যাপারে যাঁহারা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেন, তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন আমার খুল্লতাত পুত্র শ্রীবলাইকৃষ্ণ সামন্ত ভ্রাতৃজীবন, পূজনীয় স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহারাজের পুত্র, পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম ও নেতাজী চক্ষু হাসপাতালের বর্ত্তমান সুযোগ্য পরিচালক দরবেশ-শিষ্য, আমার একান্ত স্নেহভাজন শ্রীমান নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী বাবাজীবন, দরবেশজীর অন্যতম উৎসাহী শিষ্য সোদর প্রতিম শ্রীসুখেন গাঙ্গুলি ভায়া এবং কলিকাতার বিখ্যাত ধর্ম-গ্রন্থ বিক্রেতা "মহেশ লাইব্রেরী"র কর্ত্তৃপক্ষ। ইহাদের উদার অকৃপণ সহায়তা না পাইলে কোনরূপ বিজ্ঞাপনের-ব্যবস্থা ব্যতিরেকেও এই জাতীয় ধর্ম-গ্রন্থের এত কপি বিক্রয় সম্ভব হইত না। ইহাদের প্রত্যেকের নিকট তাই আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক



বিজয়ায়ন

১৮৪১ সাল। উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষা বোধ না থাকিলে সালের কোন অর্থই থাকে না, তাই আমরা বাংলার তথা ভারতের জীবনধারায় এই সালটির যথার্থ অবস্থানের ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিব। রাজা রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নানারূপ সংস্কার প্রচেষ্টার পর, পরবর্তী গবর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতের পশ্চিম সীমান্তে রুশ প্রভাব প্রতিরোধ করিবার মানসে আফগানিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া বিস্তর লোকক্ষয় ও অর্থক্ষয়ে ব্যথিত হইয়া পদত্যাগ করেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এবং পরবর্তী গবর্নর জেনারেল হন লর্ড এলেনবারা। বাংলার ছোট লাটের পদসৃষ্টি তখনও হয় নাই, হয় তের বৎসর পরে। সার্ধ দ্বাদশবর্ষব্যাপী পাঠ কালের সমাপ্তির পর এই বৎসরেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন; নব্য বাংলার অন্যতম প্রধান স্রষ্টা বিদ্যাসাগরের কর্মজগতে প্রথম প্রবেশ সূচিত করে এই ১৮৪১ সাল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তিন বৎসরের শিশু মাত্র, তবে মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখনও হিন্দু কলেজের কৃতিছাত্র, নব্য-বাংলা গঠনে ভবিষ্যতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তাঁহারা। দুই বৎসর পরে ১৮৪৩ সালে একদিকে যেমন মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া কলিকাতা তথা বাংলা সমাজে যুগপৎ প্রভূত চাঞ্চল্য ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেন, অন্য দিকে তেমনি প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মাহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উহাতে নূতন শক্তির সঞ্চার করেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সময়টি নানা দিক দিয়া একটি সন্ধিক্ষণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার অপকেন্দ্রীয় প্রভাব তখনও মোটেই মন্দীভূত হয় নাই, তবে জাতীয় সমাজদেহে স্পষ্টই একটি অভিকেন্দ্র শক্তি জাগরিত হইতে শুরু করিয়াছে। মধুসূদন সেই অপকেন্দ্র শক্তির প্রতীক, দেবেন্দ্রনাথ অভিকেন্দ্র শক্তির। বাংলার নবজাগরণের এই অরুণোদয়ে, বাংলার ধর্মজীবনের এই সন্ধিক্ষণে, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগস্ট বাংলা ১২৪৮ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে নদীয়া জেলার শিকারপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বয়সে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর অপেক্ষা বিশ বৎসরের এবং দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তেইশ বৎসরের ছোট। উভয়ের সহিত তাঁহার সময়ের ব্যবধান একটা পুরা যুগের।

বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বাংলার এক অতি সম্মানিত বংশে। মহাপ্রভুর মর্মপাত্র সর্ব শিরোধার্য শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য হইতে তিনি দশম পুরুষ। বাংলার বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে অদ্বৈতাচার্যের স্থান কত উচ্চে, তাহার আর বিস্তারিত বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তিন প্রভুর তিনি একজন এবং বাংলার বৈষ্ণবধর্মের মধ্যমণি মহাপ্রভু গোরাচাঁদের আবির্ভাবের সর্ববাদিসম্মত হেতু তিনি। উভয়ের জীবিতকালে পরস্প'রর সম্বন্ধ ছিল নিবিড়, অদ্বৈতাচার্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে যেমন পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, গৌরাঙ্গদেবও তেমনি অদ্বৈত প্রভুকে বরাবার পিতৃসম্মান দিতে ভুলেন নাই। বলিতে কি বাংলার বৈষ্ণবধর্মের প্রাথমিক ইতিহাস যেন অদ্বৈতাচার্যের পাবিবারিক ইতিহাস। সুতরাং তাঁহার সাক্ষাৎ বংশধরের বৈষ্ণবসমাজে স্থান ও প্রভাব সহজেই অনুমেয়। একান্ত আধুনিক যুগে না হইলেও, শতাধিক বৎসর পূর্বে যখন বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বংশানুক্রমিক পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন প্রভুপাদ অর্থাৎ প্রভুর অংশ। বিজয়কৃষ্ণের সময়েও এই আখ্যা সমাজে প্রভূত সম্মানের দ্যোতক এটি ভুলিলে চলিবে না।

অদ্বৈতাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে, মহাপ্রভুর জন্মের ৫২ বৎসর পূর্বে এবং মুসলমানগণের বাংলা আসিবার কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পরে। এই কালের সহিত বিজয়কৃষ্ণের জন্মকালের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য লক্ষিত হয়। তখন যেমন একটি বিদেশীয় শাসন ও ধর্মের প্রভাব বাংলা সমাজে প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে এবং ধর্মানায়কদের প্রধান ভাবনা হয় দেশীয় ক্ষীয়মাণ ধর্মকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা, বিজয়কৃষ্ণের কালের অবস্থা ও সমস্যাও তদ্রূপই। অদ্বৈতাচার্যের কালের একটু নমুনা দিই :—

বম্রা দৃষ্টিপাতে সর্ব লোক সুখে বসে,
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ-নাম-ভক্তি শূন্য সকল সংসার,
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আঁচার।
ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে,
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

* *

নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহলে
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে। (চৈতন্য ভাগবত)

এই ত গেল তখনকার বাংলাদেশের কৃষ্টিকেন্দ্র নবদ্বীপ* শান্তিপুরে চৈতন্য আগমনের পূর্বের কাল, যাহার প্রতিরোধের জন্য শ্রীঅদ্বৈত কৃতসংকল্প।

কৃষ্ণ শূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ,
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুখ।
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ,
অবতারিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ

(চৈতন্য ভাগবত)

বলা বাহুল্য বিজয়কৃষ্ণের জন্মকালে বাংলা সমাজের কেন্দ্র পরিবর্তিত, ভাগীরথীর খাত বহিয়া বেশ কিছু মাইল দক্ষিণে নামিয়া উহা জব চার্নকের কলিকাতায় স্থিতিলাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকালেই উহা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। তাহার পর হইতে ১৮৪১ সালের মধ্যে ভারতে ইংরাজ আধিপত্যের এবং তৎসঙ্গে কলিকাতার প্রাধান্যের ক্রমিক বৃদ্ধি ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কলিকাতা তথা বাংলার গুরুত্ব বৃদ্ধি সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণ করা যাইতে পারে যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নতুন সনদ প্রাপ্ত হয় তাহার ফলে বাংলার গবর্নর জেনারেল ভারতের গবর্নর জেনারেল হন। তখন হইতে সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেলই মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন বাংলা সমাজজীবনকে একপ্রকার কলিকাতাশ্রয়ী করিয়া তুলে। সুতরাং ঐ কালের সমাজকে জানিতে হইলে কলিকাতার সমাজের দিকে চাহিতে হয়।

* বিগত যুগে নবদ্বীপের প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। তবু বিষয়টি বিশদ করিবার জন্য Gazetteer হইতে সামান্য উদ্ধৃত করি—

Nabadwip is a very ancient city and is reputed to have been founded in 1063 A. D. by one of the Sen kings of Bengal who is said to have been induced to transfer his capital there from Gour. For many centuries Nabadwip has been famous for its sanctity and learning. From its earliest days the patronage of the Hindu kings and the sanctity of its site attracted from far and near, erudite scholars who taught sanskrit philosophy to thousands of students.

১৮৪২ সালে কোন সাময়িক পত্রে "জনৈক বড় মানুষের ডায়েরী" নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহা হইতে ঐ কালের একান্ত বিষয়-সর্বস্ব, ধর্মহীন জীবনের বিশ্বস্ত যথাযথ ছবি পাওয়া যায়। বড় মানুষ লিখিতেছেন,

"গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বেলা নয় ঘণ্টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সাড়ে দশটার সময় প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চা পান করিলাম। পরে দুচারিজন বন্ধু আসিলেন। তাঁহাদিগের সহিত দুটো খোস গল্প করিয়া স্নান করিয়া আর কর্ম কি, বেলা সাড়ে এগারটা, তখন ভোজন করা গেল। ভোজনান্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞ্চিৎকাল নিদ্রাগত হইলাম এবং বেলা যখন দুইপ্রহর চারি ঘণ্টা তখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাস খেলা এবং অন্য প্রকার আমোদ করা গেল। তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল। পরন্তু সন্ধ্যার পর রাত্রি দশঘণ্টাব্যাপী গান বাদ্য করিয়া আহারান্তে স্থানান্তরে গমন করিলাম।" দিনের পর দিন এই রূপ উদ্দেশ্যহীন, নীতিজ্ঞান রহিত জীবন যাপনই ছিল তখনকার শিক্ষিত, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে সাধারণ নিয়ম। ইংরেজ বণিকদিগের সহিত কাজকর্ম করিয়া নবলব্ধ অর্থ, নৃত্যগীত, বুলবুলির লড়াই, ঘোড়দৌড়, সাহেবদিগকে ভোজ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ দিনে একে অপরকে টেক্কা দিবার প্রয়াসে জলের মত ব্যয়, ধনীদের ইহাই ছিল সাধারণ বৃত্তি। হিন্দু কলেজে ইংরাজি শিক্ষিত বাবুদের চলন বলন ব্যবহার কিরূপ উদ্ভট, অশোভন ও বিজাতীয় ছিল তাহা সেই সময়ের পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রেরিত পত্রের খেদোক্তিতে প্রকাশ পাইবে। খেদকারী পত্রপ্রেরক আপন পুত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন "শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান, জাতীয় বিষয়ে অভিমান ত্যাগী, উপদেশ কথা হইলেই nonsense কহে। * * * যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ডাকাইত গরু বলে, পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্বোধ কহে। নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেষী, যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই গ্রাহ্য। ইংরাজী ব্যবহার ও চলনে অসীম ভক্তি ইত্যাদি।" ১৮৪৫ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতার দুষ্ট প্রভাব সম্বন্ধে লিখেন, "অধুনা লম্পট-বিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লী-গ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয়কর্মের জন্য কলিকাতায় আগমনপূর্বক অনেক কৌশলে কোন এক ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগের ভাগ্যবশতঃ যদি সেই বাবু কু-চরিত্র ও লম্পট হয়েন তবে বিদ্যা বুদ্ধি যশবীর্য্য একেবারে তাহাদের নষ্ট হয়।"

ইংরাজ শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্মও বিস্তার লাভ করিতেছিল, কলিকাতায় ত বটেই, দেশের অভ্যন্তরে জেলাসমূহেও। বাংলা ধর্ম জীবনের

বিগত কেন্দ্রস্থল নদীয়া জেলাতেও খৃষ্টীয় ধর্ম কিরূপ বিস্তার লাভ করিতেছিল তাহা ঐ জেলার Gazetteer হইতে উদ্ধৃত নিম্নের অংশটুকু হইতেই বুঝা যাইবে :— The first recorded visit of the Church of England missionaries to the district in occurred in 1822 when Messrs Hill, Warden and Trawn went to Santipur to see whether it would make a suitable mission station. By 1843 the christian community numbured 3902. সুতরাং দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম যে একটা ঘোরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট।

এই ব্যভিচারী স্রোতকে স্থগিত করিয়া একটা কল্যাণকর উল্টা স্রোতের প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৪১ সালে যেন তাহারই আয়োজনের সুসংকল্পিত সূত্রপাত। নিছক অনুমান হইলেও আমার মনে হয় যে ঐ সালে বিজয়কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ যেন এই আয়োজনকে জোরদার করিবারই দৈব প্রতিশ্রুতি। বিপিন পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন যে আমরা ভারতীয়রা কোন ঘটনাকেই আকস্মিক মনে করিতে নারাজ, তাই আমরা পশ্চিম দেশীয়দিগের ন্যায় মাত্র জাত হই না, রীতিমত জন্ম গ্রহণ করি। বিজয়কৃষ্ণের জীবনী যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার সমগ্র জীবন সেই মহান প্রতিশ্রুতি পালনেরই নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। পুরাতন বাংলার ধর্মপ্রাণ সভ্যতার জ্বলন্ত প্রতীক অদ্বৈতাচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণের মাধ্যমেই যে নবযুগের কলিকাতায় বিপথগামী অর্থকরী সভ্যতা তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় ধর্ম শিক্ষা পাইবে, তাহা যেন সুস্পষ্ট বিধি নির্দেশ। আঠারো বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া সেই বিজয়কৃষ্ণ ব্যবহার রসে মত্ত কলিকাতাকে তাঁহার প্রথম বাণী শুনাইতেছেন "পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে প্রীতির উদয় হয় না, প্রীতি না হইলে প্রিয় কার্য্য সাধন করা যায় না। ঈশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার হৃদয় পাষাণময়, তাহা কর্তৃক কোন পাপই অকৃত থাকে না" (ধর্ম শিক্ষা)। দু এক বৎসরের মধ্যেই এই বাণী অভাবনীয় তেজ সঞ্চয় করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল "যিনি মরুভূমিতে তৃণগুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীরের মধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কখনও অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন না।" এই বাণী কঠোপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোক মনে করাইয়া দেয়,

> ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন,
> ইতরেন তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ।

অদ্বৈতাচার্যের ন্যায় বিজয়কৃষ্ণ ধর্মকে স্ব মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সারাজীবন সকল উপভোগ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। ২৪।২৫ বৎসর বয়সে বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ব্রাহ্মধর্মের জয় হউক, আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক।" দৈব প্রেরণা না হইলে এই ঐকান্তিকতা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম সত্যধর্মের প্রতিশব্দ ছিল। তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-ব্যাকুলতাকে আপন জীবনে মূর্ত করিয়া তাঁহার ভাবকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। এ সকল অবশ্য পরের কথা, পরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে মহাপুরুষের যে জীবনালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রস্তাবনা হিসাবে এই পূর্বাভাস ক্ষমার্হ।

দুই

পুরুষানুক্রমে বাংলাদেশের ধর্মশিক্ষার, বিশেষ বৈষ্ণব ধর্মশিক্ষার আচার্যরূপে পূজিত হওয়ার জন্য, অদ্বৈতাচার্যের বংশধরগণের মধ্যে নূতনকালের প্রভাব কম আধিপত্য লাভ করিয়াছিল বলা যায়। দেশীয় ধর্মবিশ্বাসের সাধারণ অবক্ষয়ের মধ্যেও শাস্ত্রাধ্যয়ন, ব্রাহ্মণাচার, দেবপূজা ইত্যাদিতে আস্থা অদ্বৈতবংশে একপ্রকার অটুট ছিল। সুতরাং এই বংশে যে পুরুষানুক্রমে বহু বিখ্যাত ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে তাহা স্বাভাবিক। অদ্বৈত বংশীয়দের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের পিতা আনন্দকিশোরের* বিশেষত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁহার সময়ের একজন প্রখ্যাত ভক্ত ছিলেন তিনি; কথিত আছে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে করিতে সময়ে সময়ে তাঁহার লোমকূপ সকল হইতে রক্তোদ্গম হইয়া তাঁহার উত্তরীয় সিক্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার শুচিতা সর্বজন বিদিত ছিল; গৃহদেবতা শ্রীশ্যামসুন্দরের ভোগ রন্ধনের কাষ্ঠ তিনি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতেন। সেই জন্য লোক তাঁহাকে "খড়ি ধোয়া গোঁসাই" অ্যাখ্যা দিয়াছিল। গোস্বামী (বিজয়) জননী স্বর্ণময়ী অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। তাঁহার বাড়িতে যাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত

* কেহ কেহ আনন্দচন্দ্র বলেন, তবে আনন্দকিশোরই বহুজন অনুসৃত। আমরা বঙ্ক কর, অমৃতলাল সেনগুপ্ত, অমিয় সান্যাল প্রভৃতি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম—লেখক।

তাহাদের তিনি উচিত মূল্য অপেক্ষা বেশি দিয়া আনন্দ পাইতেন। বিজয়কৃষ্ণ যদিও কখনও তাহাদের সহিত দরদস্তুর করিতেন তবে জননীর নিকট সস্নেহ তিরস্কার লাভ করিতেন। স্বর্ণময়ী আনন্দকিশোরের তৃতীয়া পত্নী; তাঁহার যখন দ্বিতীয়া পত্নী গতাসু হন তখনও আনন্দকিশোর অপুত্রক; তিনি আর বিবাহ করিবেন না মনস্থ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ (পিতৃব্য পুত্র) গোপীমাধব মৃত্যুর সময় তাঁহাকে ডাকিয়া অনুরোধ করেন, তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে আমার পত্নীর হাতে দত্তক দিও। আনন্দকিশোর আশ্চর্য হইয়া তাঁহার পুত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে মরণাপন্ন জ্যেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান যে তোমাকে পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে এবং তোমার দুটি পুত্র হইবে। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর আনন্দ-কিশোর নিত্যপূজার শালগ্রামচক্র গলদেশে বন্ধন করিয়া জগন্নাথ দর্শনে পুরীযাত্রা করেন। শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে এক বৎসরে তিনি গন্তব্যস্থান শ্রীক্ষেত্রে পৌছান। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁহার দেহ যে ক্ষতবিক্ষত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু তথাপি তিনি পুরীতে পৌছিয়া স্বপ্ন দেখিলেন যেন স্বয়ং জগন্নাথ বলিতেছেন, "তুই বাড়ী যা, আমরা দুইজন তোর পুত্ররূপে আবির্ভাব হব।" আনন্দকিশোর জ্যেষ্ঠের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া এবং এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া বাড়ী ফিরিয়া প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। স্বর্ণময়ী দেবী এক মুসলমান ফকিরের বরে জন্মগ্রহণ করেন; সেই কারণেই হয়ত পরিণত বয়সে তাঁহার অনেক সময়ে ফকিরের আবেশ হইত এবং তদবস্থায় অনেকরূপ আশ্চর্য ব্যবহার করিতেন। একবার তিনি বাড়ি হইতে চলিয়া গিয়া বনের মধ্যে এক বাঘের সহিত দিব্য বাস করিতে থাকেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন বড় হইয়াছেন, এবং মাতার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়া, দুই জন পথিকের কথায় উদ্দেশ পাইয়া বনে গিয়া দেখেন জননী তাঁহার বাঘের পিঠে হেলান দিয়া নানারূপ কথা কহিতেছেন। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক অলৌকিক ঘটনাসমূহ ভিড় করিয়া আছে। ভারতবাসিগণের পক্ষে এ সকল ঘটনা অবিশ্বাস্য হওয়া উচিত নয়, কারণ অনুরূপ ঘটনা আমরা অন্য বহুলোকের সম্বন্ধে শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। লৌকিকের পিছনে যে অতিলৌকিক জগৎ একটা আছে তাহা সকল দেশের লোকেই বিশ্বাস করেন এবং সেই জগতের ঘটনা সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে বলিয়াই অবিশ্বাস্য মনে করিবার হেতু নাই। বলিতে কি ঈশ্বর বিশ্বাস মাত্রেই অতিপ্রাকৃতের আওতায় আসিয়া পড়ে, তবে বিজয়কৃষ্ণ নিজে এই সকল অলৌকিক ঘটনার প্রচারকে প্রশ্রয়

দিতেন না, সুতরাং আমার এই গ্রন্থে যতদূর সম্ভব উহারা অনুপস্থিত থাকিবে। তবে সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি পণ করিলে বিজয় জীবনী নেহাতই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

স্বর্ণময়ী তাঁহার পুত্রকে একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ্, তোর জন্ম স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের দ্বারা যেরূপ হয়, সেরূপ হয় নাই। তোর পিতা শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া মনের দ্বারা আমার ভিতর তোকে স্থাপন করিয়াছিলেন।" সে যাহাই হউক, তবে গর্ভাবস্থায় স্বর্ণময়ী নানাবিধ দেবদেবী দর্শন করিতেন, সূর্যের প্রতি রশ্মিতে, বৃক্ষাদির প্রতি পত্রে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দেখিতেন। অনুরূপ কথা একালের আর এক মহাপুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) জীবনী গ্রন্থেও দেখা যায়।

বিজয়কৃষ্ণের জন্মের তিন বৎসর পরে আনন্দকিশোরের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠের অনুরোধ অনুসারে বিজয়কৃষ্ণের পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহাকে তাঁহার জেঠাইমা কৃষ্ণমণির নিকট দত্তক দেওয়া হয়। দত্তক গ্রহণের পর কৃষ্ণমণি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয়কৃষ্ণ আবার আপনার জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন। বাল্যের এই ঘটনাটি যেন বিজয়কৃষ্ণের পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মধর্মে গমন এবং পরে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনকে সূচিত করে।

বিজয়কৃষ্ণ যে আবেষ্টনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রতিরন্ধ্রে তাহার ধর্মভাব। অতিপ্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত তিনি দেখিতেন তাঁহার পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পূজা অর্চনা, সন্ধ্যাআহ্নিক, ঠাকুর সেবা তুলসী পরিচর্যা, শাস্ত্রপাঠ, ভোগরন্ধন, আরতি ইত্যাদিতে ব্যাপৃত। কাজেই অতি শৈশব হইতেই যে বিজয়কৃষ্ণের মনে ধর্মভাব জাগরিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে বয়স্কদের মত সেবা করিবার জন্য তিনি শিশু কাল হইতেই জিদ করিতেন। শ্যামসুন্দর যে প্রাণবন্ত দেবতা শিশুমনে এই সংস্কার তাঁহার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল এবং শ্যামসুন্দরের সহিত তাঁহাকে কি জাগ্রতে কি স্বপ্নে নানারূপে বাক্যালাপ করিতে শুনা যাইত।

অন্যান্য বহু মহাপুরুষের ন্যায় শৈশবে বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত চঞ্চল এবং দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে শান্তিপুরবাসী অতিষ্ঠ হইয়া থাকিত। তাঁহার প্রখ্যাত জীবনীকার বঙ্ক কর মহাশয় তাঁহার এই দুরন্তপনাকে শ্রীচৈতন্যের অনুরূপ শৈশব চঞ্চলতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে উহার সঙ্গে এমন এক অপূর্ব কোমল ভাব, সরলতা ও স্বর্গীয় মাধুর্য জড়িত থাকিত যে তাহা বিরক্তির কারণ না হইয়া আনন্দের কারণ হইত। শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চাঞ্চল্য সৎকার্যে উৎসাহ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

বিজয়কৃষ্ণ শৈশবে ভগবান সরকারের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ইনি বিজয়কৃষ্ণের সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, নির্ভীকতা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। ইঁহার অদ্ভুত মৃত্যু সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন, "গুরু মহাশয় একদিন পাঠশালার ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে ছেলেরা, কাল সকালে আসিস্ একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাবো, সেখানে আমি দেহত্যাগ করব। পরদিন স্নান শেষ করিয়া তিনি গঙ্গাজলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। জপ শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, ছেলে সব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ; আমি তোমাদিগকে কত তাড়না করিয়াছি। এখন বাপুসকল আমার মাথায় পা দাও, আর সময় নাই। ঐ দেখ আমার রথ আসিতেছে। এই বলিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন।" বলা বাহুল্য যে এই ঘটনা বিজয়কৃষ্ণের মনে বিশেষরূপে দাগ কাটিয়াছিল। এই সময়েই তাঁহার কয়েকটি সহপাঠী কলেরায় মারা গেলে, তিনি তাদের কথা চিন্তা করিতে করিতে যেন শুনিতে পান, তাহারা বলিতেছে "বিজয় আমরা আছি।" মানুষের জীবনের যে এইখানেই শেষ নয়, পরলোক বলিয়া একটা কিছু আছে, সাধারণ-ভাবে এই বিশ্বাস বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তবে পরলোকের অস্তিত্বের এই সকল প্রত্যক্ষ আভাষ সেই বিশ্বাসকে যে দৃঢ়তর করিল তাহা সুনিশ্চিত। আর পরলোকে বিশ্বাস আস্তিক্যবুদ্ধির নামান্তর মাত্র। গভীর আস্তিক্যবুদ্ধির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বিজয়-জীবন সুগঠিত। বাল্যকালে একটি পরলোকগত আত্মা বিজয়কৃষ্ণকে বিপদে আপদে রক্ষা করিতেন। গ্রামে যাত্রা আদি হইতে বিজয়কৃষ্ণকে বহুবার তিনি রাত্রে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন যে তিনি তাঁহাদের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজারী ছিলেন। সেবার জিনিস অপহরণ করার অপরাধে এই গতি প্রাপ্ত হন। পরে সাধনের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ পরলোকের অস্তিত্ব দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের যে তালিকা প্রস্তুত হয় তাহাতে তাঁহার এই বিশ্বাসের উপর কটাক্ষপাত করা হয়। সে কথা পরে প্রকাশ পাইবে। পরলোক স্বীকৃতি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় এবং পরলোক নাই কোন বৈজ্ঞানিক ইহা আজও প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের সাক্ষ্য যাহা কিছু তাহা বরং পরলোকের সপক্ষেই। আশ্চর্যের কথা এই যে, যে সকল ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণের এই বিশ্বাসকে নিন্দা করিতেছিলেন, তাঁহারাই অন্ততঃ অতিলোক সম্বন্ধে আপনাদের অল্প জ্ঞানের জাহির করিতে-ছিলেন। বিজদাস দত্ত মহাশয়ের Behold the man গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,

যে স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও একটি চাবি দ্বারা পরের মনের কথা বলিবার প্রক্রিয়া দেখাইতেন। (দত্ত মহাশয়ের ভাষায়, Used to give us demonstrations of telepathy with a key as early as 1877.) সে যাহা হউক, বিজয়কৃষ্ণ শৈশবের কাল হইতেই পরলোক এবং অতিলোকে বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। বহু বিপদ হইতে বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পাওয়ার কথা শুনা যায়।

ভগবান গুরুমহাশয়ের পাঠশালা উঠিয়া গেলে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে পাঠ করেন। এইখানেই অঘোরনাথ গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয়। এই পরিচয় পরে দৃঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং বহুদিন উভয়ের জীবন সমান্তরাল পথে চলিতে থাকে। অঘোরনাথেরও জন্ম ১২৪৮ সালে। তাঁর 'বুদ্ধচরিত' বাংলা সাহিত্যে একটি বিখ্যাত পুস্তক।

জননীর সহিত অধিকাংশ সময় শিষ্যালয়ে, বিশেষতঃ রংপুর জেলার আমলাগাছিতে অবস্থান করার জন্য বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষায় মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়িত। তথাপি তিনি যেখানেই পড়িয়াছেন, সেইখানেই শিক্ষকগণ তাঁহার স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়াছেন। অবশ্য বাল্যকালে তাঁহার অধিক অনুরাগ ছিল ঠাকুর দেবতায়। তাঁহার হাতের লেখা মুগ্ধবোধের মলাটে গোবৎস এবং কৃষ্ণ বলরামের ছবি দেখিয়া অধ্যাপক গোবিন্দ ভট্টাচার্য যাঁহার টোলে পরে বিজয়কৃষ্ণ প্রবিষ্ট হন, বলিয়াছিলেন "এই বয়সেই এই অনুরাগ। এ কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, কখনও গৃহে থাকিবে না।" অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণকে আর একদিন সস্নেহ তিরস্কার করিয়াছিলেন, "হাঁরে তুই প্রতিদিন ঠাকুর দেখতে যাস কেন? পড়াশুনা ত্যাগ করে ঠাকুর দখাতেই ব্যস্ত। আগে পড়াশুনা কর, বেশ উৎপত্তি জন্মাক, তারপর এসকল করিস।"

বিজয়কৃষ্ণের বয়স যখন নয়, তখন অদ্বৈত বংশেরই এক বিখ্যাত ষড়দর্শনবেত্তা পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন মহাশয় গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করেন। পরে মাতার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়া বিজয় এই তর্করত্ন মহাশয়কে উপগুরু পদে বরণ করেন এবং তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে পরে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার ভাষায়, "দীক্ষা গ্রহণের পরই বিজয়কৃষ্ণ 'হরিবোলা' হইয়া উঠিল। প্রতিদিন স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিত। পৃথিবীতে পরপীড়ন, ব্যথা, হাহাকার দেখিয়া তাঁহার মন মমতায় ভরিয়া যাইত। বিজয় জাতিস্মরের ন্যায় স্বতঃই জীবে দয়া ও ভগবানে ভক্তি এই দুইটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।" পরে বেদান্তশাস্ত্র পাঠ যত অগ্রসর হইতে লাগিল,

বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জগতে ততই পরিবর্তন হইতে লাগিল। এই পরিবর্তন তাঁহার আচার্য অধ্যাপকও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বিজয়ের অদ্ভুত মেধা আমি দেখিয়াছি। সে আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিল। প্রথমে কয়েক দিবস সাংখ্য দর্শন দেখিয়া পরে বেদান্তশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বেদান্ত পরিভাষা ও বেদান্ত দর্শন পড়াইয়া ছিলাম। অল্প আয়াসেই বালক গূঢ়তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করিতে লাগিল, ব্রহ্মজ্ঞান তাহার ভিতর দেখিতে লাগিলাম। তাহার মুখশ্রীতে অপূর্ব ভাব সকাল খেলা করিত। এইরূপে হরিবোলা বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্ম রসাস্বাদনে আত্মনিয়োগ করিল। এই বেদান্ত অধ্যয়নই যে বিজয়-জীবনে একটি মহা পরিবর্তন আনয়ন করে,—তাঁহার বংশগত পূজা অর্চনা ও ভক্তিভিত্তিক ধর্মের মূল শিথিল করিয়া দেয়, বিজয়কৃষ্ণ নিজে তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, "হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম, তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম, এই সত্য বিশ্বাস করিতাম, উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।" সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে কলিকাতা আগমনের পূর্বেই বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশের অনুকূল অবস্থা আসিয়া গিয়াছিল কারণ ব্রাহ্মধর্ম অর্থাৎ একেশ্বরবাদ সোঽহং ধর্মের সমার্থক না হইলেও, দেববাদ অস্বীকারে উভয়ে এক ; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—অহং ব্রহ্মোঽস্মি, ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞানই মুক্তি, সুতরাং সোঽহং বাদে উপাসনার স্থান নাই। অবশ্য ধর্ম বিশ্বাসের এই পরিবর্তন তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধিকে এতটুকু শিথিল করিল না, কারণ অদ্বৈতবাদে জগৎ মিথ্যা হইলেও, ব্রহ্ম অত্যন্ত সত্য এবং একমাত্র কাম্য। গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরে আশৈশব একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ পুরুষানুক্রমিক বৈষ্ণব বিজয়-কৃষ্ণের পক্ষে ধর্মবিশ্বাসের এই পরিবর্তন দেশীয় ধারায় হইলেও কম বৈপ্লবিক নয়। বিজয়কৃষ্ণের সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, এই পরিবর্তনকে ঈশ্বর ঈপ্সিত ভাবী কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুতি বলিয়াই মনে হয়। অদ্বৈতাচার্যের বৈষ্ণবীয় প্রভাবে অনড় বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার কূলপ্লাবী পশ্চিমা ভাবস্রোতের দ্বারা নিজেও যেমন প্রভাবিত হইতেন না, সেই ভাবস্রোতকে বাধা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সংস্পর্শও পাইতেন না। একেশ্বরবাদের সাধারণ ভিত্তিভূমিতেই জাতীয় জীবনের পক্ষে এই অতি প্রয়োজনীয় সংঘাত সম্ভব ছিল। এই একেশ্বরবাদের প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়াই তাই বিজয়কৃষ্ণ চলিলেন নব্য বাংলার কৃষ্টিকেন্দ্র কলিকাতায়। ক্রিশ্চানীধর্মের ক্রমিক বিস্তার তাঁহার অপরোক্ষ গোচরের একেবারে বাহিরে ছিল না, শান্তিপুরে থাকিতেই তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁর দুই সুহৃদের (রামময় ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য) ধর্মান্তর গ্রহণ, সুতরাং দেশীয় ধর্মের অবক্ষয়-

রোধের সংকল্প যে তাঁহার মনের গভীরেও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল তাহা বলা যায় না।

তিন

বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় আসিলেন খুব সম্ভবতঃ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পৃথিবীতে আগমনও যেমন বাংলা সমাজের একটি যুগসন্ধিতে, তাঁহার কলিকাতায় প্রবেশও সেইরূপ একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে। এ সম্বন্ধে অন্য এক প্রবন্ধে আমি এইরূপ লিখিয়া ছিলাম,—"সব দিক দিয়া বিচার করিলে এই কালটিকে নব্য বাংলার ভিত্তি স্থাপনের কাল বলা যায়। ১৮৫৮ সালের শেষে সিপাহী বিদ্রোহের সম্পূর্ণ বিরতির পূর্বেই 'জন কোম্পানির" অবসান হইল এবং মহারাণী ভিকটোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এবং তাহার শ্রেষ্ঠফল বঙ্কিমচন্দ্র বি-এ পাস করিলেন ঐ বৎসরেই। বাংলার প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" রচিত হয় ১৮৫৮ সালে, মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনা করেন ১৮৫৯ সালে, বাংলার নীলবিদ্রোহের অমর সাক্ষ্য নীল দর্পণ রচিত হয় ১৮৬০ সালে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালের শেষ দিকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করিয়া বাংলা সমাজ গঠনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতরণ করেন এবং একই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের শান্ত উদার পরিবেশ হইতে নূতন প্রেরণা লইয়া পশ্চিমী আলোকে উদ্‌ভ্রান্ত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তার বাঙ্ময় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে। ইংরাজি শিক্ষার বান সামান্য বাধা প্রাপ্ত হইলেও তখনও প্রশমিত হয় নাই। নবাগত আলোকে বিভ্রান্ত ইংরাজি-নবীশেরা পিতৃপিতামহের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার বেপরোয়া বাতিল করিয়া নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতেছিলেন তখনও। ফলে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসেই কেবল বিপ্লব দেখা দেয় নাই,—চিরাচরিত আচার আচারণের মূলও সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া গেল। সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দুই একটি বাঞ্ছিতগুণের বিকাশ লাভ ঘটিলেও, পানাহারাদি সম্বন্ধে তাঁহারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। প্রকাশ্যে মদ্যপান বীরত্বের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইল, অসংযত ইন্দ্রিয়-ভোগ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।" এহেন কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন বিজয়কৃষ্ণ পুরাতন বাংলার কৃষ্টিকেন্দ্র শান্তিপুরের যেন প্রতিনিধি হইয়া, সেই কৃষ্টির ভাবমূর্তি অদ্বৈত প্রভুর বংশধর হিসাবেই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বিজয়-কৃষ্ণের ধর্মমত যদিও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সে পরিবর্তন

একান্ত হিন্দুধারা বহিয়াই হইয়াছিল, সুতরাং তাহা তাঁহার বেশভূষা, আচার ব্যবহারকে তখনও তিলমাত্র টলাইতে পারে নাই। তাই তখনও তাঁহার মাথায় টিকি, গলায় তুলসীমালার গোছা ও কপালে তিলক। তাঁহার একাধিক জীবনী লেখক লিখিয়াছেন, "তাঁহার তৎকালের আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদ ও অনুলেপনাদি দর্শনে তাঁহাকে সহজেই শান্তিপুরের গোঁসাই বলিয়া অনুমিত হইত।" তাঁহার অদ্বৈতবাদ তাঁহার আরাধনার দেবতা অপসৃত করিয়াছিল, কিন্তু তখনও তাঁহার দেশগত আচরণে পরিবর্তন আনে নাই। বিজয়কৃষ্ণ নিজে লিখিয়াছেন, যে হিন্দুশাস্ত্র ধর্মের সংরক্ষক, সেই হিন্দুশাস্ত্রই তাঁহার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল। বিজয়-জীবনের আলোচনা করিতে গেলে এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন কোন বহিরাগত প্রভাবের ফলে নয়, এবং জাতীয় ধারা বহির্ভূতও নয়। তাই সকল পরিবর্তনের মধ্যেও তিনি জাতীয় ভিত্তিভূমিতে দৃঢ়সন্নদ্ধ।

বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে কাব্য বিভাগে ভর্তি হন। এই সময়ে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। আরব্ধ বেদান্তচর্চাও সমানে চলিতে থাকে। বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রের মধ্যে এমনই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল যে সকল পরিবেশেই সহজেই তিনি নেতৃত্বের সম্মান অর্জন করিতেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'বীরপূজায়' লিখিয়াছেন, "বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ ও আমি এই পাঁচজনের মধ্যে এক সময় সুদৃঢ় প্রণয় বন্ধন ছিল। সংস্কৃত কলেজের ঘোর নাস্তিকতার সময় আমরা পাঁচবন্ধু "ভাগবত" বলিয়া উপহাসিত হইতাম।······বিজয় আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন।"

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সময়েই বিজয়কৃষ্ণের বিবাহ হয় শিকারপুরের রামচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের কন্যা যোগমায়া দেবীর সঙ্গে। বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন আঠারো, যোগমায়া দেবীর মাত্র ছয়। আজকালের পাঠকের নিকট এই সংবাদ হাস্যকর ঠেকিবে কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের সময়ে ইহা নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল না। এই মহীয়সী নারীর ঔদার্য ও সরলতা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। ধর্মগত-প্রাণ স্বামীর ধর্মসাধনের তিনি আজীবন সাহায্য করিয়া গিয়াছেন এবং নিজেও ধর্মের অতি উচ্চ শিখরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কিছুদিন বিজয়কৃষ্ণ ভগিনীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের মাতুলালয় সাতরাগাছিতে চৌধুরীবাড়িতে অবস্থান করেন। প্রত্যহ পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতায় কলেজে উপস্থিত হইতে গিয়া তিনি অসুস্থ

হইয়া পড়েন। নিজ কলিকাতায় কোন স্থান সংগ্রহের চেষ্টা তখন হইতেই চলিতে থাকে।

ইতিমধ্যে রংপুর জেলার আমলাগাছী গ্রামে তাঁহার বংশের কোন শিষ্যবাড়ি যাইতে হয় তাঁহাকে। তথায় উপস্থিত হইলে কোন এক বৃদ্ধা শিষ্যা প্রচলিত নিয়মানুসারে সর্বজনবিদিত অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ইত্যাদি গুরু পূজার শ্লোক আওড়াইয়া তাঁহার চরণ পূজা করিয়া বলিতে থাকেন, "প্রভু, আমি ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন।" এ ঘটনা আমাদের দেশে কিছু নূতন নয়, আজও পল্লীগ্রামে অনেকে আপনাপন কুলগুরুর নিকট এইরূপ আকুতি করিয়া থাকেন। শতাধিক বর্ষ পূর্বে ইহা অহরহ হইত। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের নবজাগ্রত বিচারবুদ্ধি সমস্ত ঘটনাটির মৌলিক অযৌক্তিকতা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি নিজে কি করিয়া ত্রিতাপ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন তাহা জানেন না, তিনি ঐ শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধার মুক্তির কোন উপায় বলিয়া দিবেন? নিজের অজ্ঞান আজও তাঁর দূরীভূত হয় নাই, পরের চক্ষু তিনি কেমন করিয়া খুলিয়া দিবেন? গুরু ব্যবসায়ের উপর তাঁহার গভীর অনাস্থা জন্মিল, এ মিথ্যা ব্যবসায় পরিত্যাগের কথাও ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন তাঁহার বোধ হইল কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "পরলোক চিন্তা কর।" কে বলিল দেখিতে পাইলেন না, ভয়ে তাঁহার জ্বর হইল। তাঁহার আন্তর্নিহিত পরলোক বিশ্বাস উদগ্র হইয়া উঠিল, আপন পরকাল সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন তিনি।

এই সময়ে গুরু ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে একবার বগুড়া যাইতে হয় এবং সেখানে তিনজন সাধু-স্বভাব ব্রাহ্মের সহিত আলাপ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের ধারণা বিশেষ অনুকূল ছিল না, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া সুরাপান মাংস ভোজন করে, এইরূপ সাধারণ একটা লোকপ্রবাদেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং বগুড়ার তিন জন ব্রাহ্মের বিশুদ্ধ জীবন, তাঁহাকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিল। বেদান্ত দর্শন তাঁহার পূজাপ্রবণ হৃদয়ে যে শূন্যতার সৃষ্টি করিয়া ছিল, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে বিজয়কৃষ্ণ যে আপন পরিত্রাণের উপায় খুঁজিতে ছিলেন তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এই নবলব্ধ বন্ধুগণ কলিকাতা ফিরিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। বিজয়-জীবনের গতি পরিবর্তনের ইহা একটা মূল্যবান অঙ্কুর, তবে এই ঘটনাতেই পরিবর্তন শুরু হইয়া গেল ভাবিলে ভুল করা হইবে। বিজয়কৃষ্ণ সেই ভুলের

নিরসনের জন্য নিজে তাঁহার "ব্রাহ্মধর্মের বর্তমান অবস্থা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মই রহিলেন, আমি বৈদান্তিকই রহিলাম।"

ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। বগুড়া হইতে ফিরিয়া তিনি এক বন্ধুর দুশ্চেষ্টায় অত্যন্ত কষ্টে পড়েন। বন্ধুটি তাঁহার যথাসর্বস্ব চুরি করিয়া পলায়ন করে। তখন তিনি "কোন দয়াবান" বাবুর নিকট স্থানপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন, কিন্তু উক্ত মহাশয় এর পূর্বে কয়েকজন ভদ্রসন্তানকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের পরবর্তী অশিষ্ট আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং আর কাহাকেও ঐরূপ আশ্রয় না দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। অনেকে এই "দয়াবান বাবু"কে ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়া মনে করেন এবং অনুমান অসম্ভব নহে। যাহা হউক পরে বিজয়কৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের নিকট আপন আবেদন পেশ করেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সে আবেদন পত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে এই যে বিজয়কৃষ্ণ, যাঁহার অপেক্ষা যোগ্যপাত্র কল্পনা করা যায়, না, তাঁহার সামান্য প্রার্থনাও সেই সময়ের দুইজন বিখ্যাত বদান্য ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইল। অল্পায়াসে প্রাপ্ত সুখের জন্য বিজয়কৃষ্ণ সৃষ্ট হন নাই, সারাজীবন যাঁহাকে সুদুর্লভ আদর্শের জন্য অভাবনীয় ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার সুখপ্রাপ্তি অত সহজে ঘটিলে চলিবে কেন? তাঁহার চরিত্রের স্থায়ী ইস্পাতকে দৃঢ়তর করিবার জন্যই যেন বিধাতার পূর্বকল্পিত বিধানবশেই এই দুই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যান। সর্বগুণবরেণ্য এই দুই ব্যক্তির উপর কিঞ্চিৎমাত্র বিরক্ত না হইয়া বিজয়কৃষ্ণ দিবসে উপবাস, রাত্রিতে গোলদীঘিতে, কালেজের বারান্দায় শয়ন, এই অবস্থায় তিন চারি দিবস অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার কয়েকদিন আহার হয় নাই জানিতে পারিয়া কোন সহৃদয় ভদ্রলোক তাঁহাকে একটি সিকি দেন, তিনি ঐ সিকিটি লইয়া একটি মিষ্টান্নের দোকানে ঢুকিবেন এমন সময় দেখেন তাঁহার সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিজয়কৃষ্ণ বন্ধুকে দেখিয়া তাঁহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরেন এবং চুরির টাকা সব জুয়া খেলায় খোয়া গেছে শুনিয়া এবং তিনিও অভুক্ত জানিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র যথাসম্ভব জলযোগ করেন। এই বিজয়কৃষ্ণ,—বন্ধু বৎসল, ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু!

পরে দুই বন্ধুতে এক ভদ্রলোকের বাটীর একাংশে সামান্য ভাড়া দিয়া থাকিতে লাগিলেন। বাড়ির মালিক (তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়) আপন আপন বন্ধুবান্ধব লইয়া [illegible] লোকপ্রাসঙ্গ স্বভাববশে তিনি

বিজয়কৃষ্ণকেও দলে টানিবার চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তেজের সহিত সেই ঘৃণিত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। আমি অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, আমি সুরাপান করিলে অথবা কোন পাপাচরণ করিলে আমার নির্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে এই সংস্কার বিজয়কৃষ্ণকে সর্ববিধ পাপ হইতে ফলদায়ী কবচের মত চিরকাল রক্ষা করিয়াছে।

এই সকল ঘটনাপ্রবাহে আন্দোলিত হইয়া যখন স্বভাবতঃইতিনি আপনার আত্মার যথার্থ হিতসাধনের কথা চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন বগুড়ার ব্রাহ্ম বন্ধুদের অনুরোধ তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা শুনিতে বলিয়াছিলেন। এক বুধবারে দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ* শুনিতে তিনি ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। সমাজের শান্ত গম্ভীর পরিবেশ, সুমধুর সংগীত ও স্তোত্রপাঠ এবং পরিশেষে "পাপীর দুর্দ্দশা ও ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" বিষয় অবলম্বনে স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণে বিজয়কৃষ্ণ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রাচীন হিন্দুধর্মের আরাধনা-অর্চনা মূলক বিগ্রহপূজায় শ্রদ্ধা হারাইয়া তিনি প্রাণে যে শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন, সেই শূন্যতা পুরণের তিনি যেন একটি মনোমত উপায়ের হদিস পাইলেন। ব্রাহ্মসমাজের "ব্রহ্মোপসনা" অর্থাৎ জগতের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তাঁহার প্রকৃতির বিশেষ অনুকূল হইল। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "যখন পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাস ছিল তখন ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতাম, এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এইমাত্র শুনিলাম তুমি অনাথের নাথ ; প্রভো, আমি তোমার স্মরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।" প্রার্থনা করিয়া তিনি অনেকখানি শান্তি লাভ করিলেন এবং মনে মনে দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মজীবনের গুরু বলিয়া প্রণাম করিয়া সমাজগৃহ ত্যাগ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য জানিলেনও না যে তাঁর ভগবদ্ভক্তির বাত্যায় স্ফুলিঙ্গ অদ্বৈত কুলরত্ন বিজয়কৃষ্ণের অনুকূল ক্ষেত্রে পড়িয়া সেখানে এক জ্বলন্ত বহ্নির সৃষ্টি করিয়াছে। এই বহ্নিতেই ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ তথা সমগ্র জাতীয় প্রয়োজনীয় অগ্নিশুদ্ধি লাভ করিবে।

* দেবেন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষার্ধে এবং শেষ বক্তৃতা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুলাই। বিজয়কৃষ্ণ ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের শেষের দিকের কোন এক বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইয়া থাকিবেন, কারণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন।

প্রার্থনার কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া বিজয়কৃষ্ণ সেই দিন হইতে প্রতিদিন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থনান্তে মনে যে সকল ভাবোদয় হইত তাহা লিখিয়া রাখিতেন। সেইগুলি পরে 'ধর্ম-শিক্ষা' নামে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে কিছু বিতরণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট একশত পুস্তকসহ গ্রন্থের স্বত্ব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি উপদেশের সামান্য একটি বাক্য, যদিও পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তথাপি আবার উদ্ধৃত করি; তিনি বলিতেছেন, "পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে প্রীতির উদয় হয় না, প্রীতি না হইলে প্রিয়কার্য সাধন করা যায় না।" ইহাই তাঁহার জীবনের মূলসূত্র, তাঁহার বিকাশশীল, আপাত বিভিন্ন জীবনধারা ঐ সূত্রেই বিধৃত।

এই মানসিক রূপান্তরের পর বগুড়ায় গিয়া তিনি ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত পুনরায় দেখা করেন। তাঁহার ভাষায়, ব্রাহ্মবন্ধুগণ আমার পরিবর্তন দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে কৌলিক গুরুব্যবসায় তাঁহার পক্ষে আর অসম্ভব বুঝিয়া, কতক বিকল্প উপজীবিকা হিসাবে এবং কতক জনসেবা কামনায় তিনি ডাক্তারী পড়িবার মানসে মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বগুড়ায় কিছুকাল থাকিয়া তিনি শান্তিপুর গমন করেন। সেখানে একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরের পরম পিতৃত্ব হইতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুতরাং জাতিভেদের অসমীচীনতার কথা উঠে। এইরূপ চিন্তা যে বিজয়কৃষ্ণের মনকে অধিকার করিয়াছিল তাহা তাঁহার 'ধর্মশিক্ষার' নিম্নোক্ত উপদেশ হইতে বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেছেন, "যেরূপ ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিবে সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া অকৃত্রিম প্রীতি স্থাপন করিবে।" তাঁহার যুক্তি শুনিয়া একাদশ বর্ষীয় এক বালক তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠে, "তুমি যদি জাতিভেদ না মান, তবে পৈতা রাখিয়াছ কেন।" বিজয়কৃষ্ণ বালকের উক্তির যৌক্তিকতা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পৈতা ত্যাগ করিলেন। ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় বিজয়জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সে যাত্রা বিজয়কৃষ্ণ উপবীত পুনর্গ্রহণ করেন। শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া বিজয়কৃষ্ণ সংকল্পমত মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "বিজয় কাব্যের শ্রেণী হইতে আমাদিগকে ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজে গিয়া ভর্তি হইলেন। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আমি বিদ্যাভূষণ উপাধি পাইলাম। বিজয় ও অঘোর নিম্নশ্রেণী হইতে কলেজ পরিত্যাগ করায় সংস্কৃত কলেজ হইতে কোন উপাধি পান নাই। অথবা সাধু হইবেন বলিয়াই বঝি মা তাঁহাদিগকে কোন উপাধি ভূষণে বিভূষিত করেন নাই।"

চার

শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের সন্তানের পক্ষে তখনকার দিনে ডাক্তারী পড়িবার সংকল্প-কম যুগান্তকারী এবং বাধাবহুল ছিল না। তবে বিজয়কৃষ্ণের মনে তখন সংস্কার মুক্তির নবলব্ধ প্রেরণা জাগিয়াছে, কাজেই তাঁহার বলিষ্ঠ হৃদয়ের কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আত্মার উন্নতিব জন্য দীক্ষা প্রয়োজন জানিয়া দেবেন্দ্রনাথেব নিকট দীক্ষিত হইলেন (১৮৬১ সালেব মাঝামাঝি)।

উপবীত ত্যাগ কবিতে না পাবায় তাঁহার মনে শান্তি ছিল না, কারণ বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি তাঁহার নিকট ভয়ানক কপটাচার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক পৈতা আমাকে কাল ভুজঙ্গের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বর দর্শন হবে না। এই ভয়ে প্রাণ আমার অস্থির হইত।" তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয় উপবীত রাখা উচিত কি না?" দেবেন্দ্রনাথের সংরক্ষণশীল উত্তব, "উপবীত রাখা নিতান্ত কর্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি" বিজয়-কৃষ্ণের মনঃপূত হইল না। যিনি ঈশ্বরের অন্বেষণে তাঁহার আশৈশব আদরেব অতিপ্রিয় শ্যামসুন্দরকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কাছে এই উত্তর সত্যের অবাঞ্ছনীয় আপোস বলিয়া মনে হইল। তিনি ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথের সহিত কোন বাদানুবাদ না ক'রয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অচিরেই আপন কলেজের "হিত সঞ্চারিণী" নামীয় এক সভায় "যাহা সত্য বুঝিব তাহা পালন না করা মহাপাপ ও কপটতা" এই মমে এক আলোচনার পরই উপবীত ত্যাগ করিলেন। পত্রে বাড়িতেও সংবাদ পাঠাইলেন (১৮৬২ গোড়ার দিকে)। অদ্বৈত বংশের সন্তান বিজয়কৃষ্ণ নূতন যুগকে বরণমাত্র করিলেন না, একেবারে তাহার পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল ব্রাহ্মই হইলেন না, সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ব্রাহ্ম হইলেন। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তাঁহার পূর্বে মাত্র রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ই প্রথম উপবীত ত্যাগ করেন। বিজয়কৃষ্ণ দ্বিতীয় উপবীত ত্যাগী। তাঁহার এই অগ্রগামিত্ব অনেক খ্যাতনামা ব্রাহ্মকেও সন্ত্রাসিত করিল, তাঁহাবা বলিতে চাহিলেন, অত বাড়াবাড়ি কেন বাপু স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও ত পৈতা ফেলেন নাই। কেবল "সোমপ্রকাশের" দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার পত্রে বিজয়কৃষ্ণকে সমর্থন করিয়াছিলেন। অবশ্য নিন্দাস্তুতি বিজয়কৃষ্ণকে কখনই আপন আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। এই একরোখা মনের জন্য তাঁহাকে ত্রাসে ও বিরূপতায় ছাড়িয়াছেনও যেমন

অনেকে, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অনুসরণ করিয়াছেনও তেমনি অনেকে। কিন্তু কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন আপন লক্ষ্যের পানে। অগ্রগামিত্ব ও নেতৃত্ব ছিল তাঁহার সহজাত।

কলিকাতা আগমনের তিন বৎসরের মধ্যে বিজয়-জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন হইয়া গেল তাহা অনুধ্যান করিলে অবাক হইতে হয়। মালা তিলক শিখা সূত্র সমন্বিত শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশীয় গোঁসাই সকল সংস্কারমুক্ত হইয়া অগ্রগামী ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সর্বাগ্রগামী হইলেন। এখন হইতে পরবর্তী পঁচিশ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মধর্মের গতিপথ বহুলাংশে যে বিজয়কৃষ্ণ-নিয়ন্ত্রিত তাহা যে কোন সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকই স্বীকার করিবেন। আলোচ্য সময়ের বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "একদিন একজন আসিয়া বলিলেন, ওরে বিজয় গোঁসাই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, চল তাঁকে দেখতে যাই। আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, সন্ধ্যা হইল বিদ্রূপকারী বন্ধুগণের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আমি তথায় রহিলাম। বিজয়বাবু আমার বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে আমরা দুই বন্ধুতে যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ভোজনপাত্র দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইলাম। উহা আর কিছুই নয়, মেটে সান্কি। আমি বলিলাম, ও বিজয় এ কি? এ যে মেটে সান্কি। তিনি বলিলেন, যাও, যাও, কাঁসাতে আর মাটিতে প্রভেদ কি? ইহার পর একজন ঝিকে ভাত নিয়া আসিতে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম এ কি? বামুনের জাত মারলে? তিনি বলিলেন, ওকি? জাতটাত আবার কি? ওসব কিছু নয় এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না।" কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে আজিকার যুক্তিবাদী যুগেও নিম্ন জাতীয় ঝির ছোঁয়া ভাত খাইতে আপত্য অনেকের না থাকিলেও, মাটির ভোজনপাত্রে একাধিক বার অন্নগ্রহণ করিবার মত সংস্কার শূন্যতা সহজপ্রাপ্য হইবে কিনা সন্দেহ। এইখানে বলিয়া রাখি যে কেশবচন্দ্র ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "অনুষ্ঠান" নামক পুস্তকে উপবীত গ্রহণের বিপক্ষে মত জ্ঞাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহা পড়িয়া এবং বিজয়কৃষ্ণের উপবীত ত্যাগ দেখিয়া উপবীত ত্যাগ করেন। "অনুষ্ঠান" পুস্তকে কেশবচন্দ্রের মত উপবীত গ্রহণের প্রতিকূল দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ স্বভাবতই প্রীত হইলেন এবং কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গত সভার সভ্য হইলেন। এই সভাতেই কেশবের সহিত তিনি সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদের সহিত পরিচিত হন। বিজয়কৃষ্ণ কোন কাজই অর্ধেক মন লইয়া (half-heartedly) করিতেন না। তিনি জীবনে এক নূতন সত্য পাইয়াছেন, এক নূতন পথের পথিক হইয়াছেন

তিনি। তাঁহার হৃদয় মন তাই এক নূতন উৎসাহে ভরপুর। এই নূতন সত্যে আরও অনেককে অংশীদার করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চারিপাশের ধর্মহীনতার পরিপ্লাবী বন্যাকে প্রতিহত করিবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল তাঁহার করুণাপ্লুত হৃদয়ে। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে উৎসাহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে লোকের অধর্ম পাপ দেখিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। একদিন মনে হইল পথে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব। সেই দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মের সকল সত্যগুলি প্রচার করিতে লাগিলাম। চারি পাঁচশত লোক একাগ্র মনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।" প্রথম দিনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তিনি কয়েকদিন যাবৎ এইরূপ করিয়া চলিলেন। পূর্বেই দেশের ধর্মভাবের সুস্পষ্ট অবনতিকে বলিয়াছি যে কলিকাতা আগমনের পূর্বেই প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের মানসে হয়ত একটা অস্পষ্ট সজ্ঞানতা ছিল। তাহা না হইলে কলিকাতা আগমনের দুই তিন বৎসরের মধ্যে কুড়ি একুশ বৎসর বয়সেই ধর্মপ্রচারের এই তীব্র ব্যাকুলতার যেন যথেষ্ট explanation পাওয়া যায় না। সে যাহাই হোক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে মূলতঃ বিজয়কৃষ্ণের চেষ্টাতেই ব্রাহ্মধর্মের বাণী, বেদী এবং সভার সীমিত পরিসর হইতে সাধারণের সুপ্রশস্ত দরবারে তাহার অমোঘ আবেদন জানাইল। প্রধানতঃ বিজয়কৃষ্ণের উৎসাহেই ব্রাহ্মধর্মের জয়যাত্রা শুরু হইল। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁহার সহিত তিনি মেদিনীপুর গমন করিয়া রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যার বিবাহে আচার্যের কার্য করেন। (১৮৬২, জুলাই) এই বিবাহের ফল মনোমোহন, অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি দেশপূজ্য ভ্রাতৃবৃন্দ।

ঐ বৎসর হয়ত কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার অবকাশে কিংবা কোন এক বৃহস্পতিবারে তিনি শান্তিপুরে গিয়া পৌঁছান। তখন বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হইতেছিল, বিজয়জননী পুত্রকে দেবী-সম্মুখে ডাকিয়া আকুল কণ্ঠে পুনরায় পৈতা গ্রহণ করিতে জিদ করিতে লাগিলেন। মাতৃভক্ত সন্তান বিজয়কৃষ্ণের নিকট মায়ের আকুতি অগ্রাহ্য করার ন্যায় মর্মন্তুদ ব্যাপার কল্পনা করা যায় না। অথচ মাতার অনুরোধ রক্ষা করাও বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাব পক্ষে অসম্ভব। তিনি মাতার অনিবার্য দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে জ্ঞান ফিরিলে তিনি সানুনয়ে বলিলেন, "যদি পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ ত্যাগ করিব, আমি আর অসত্যকে ধারণ করিব না।" পুত্রের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বিজয়জননী বলিলেন, "তোমায় উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে না। আমি মনে করিব তোমার উপবীত হয় নাই।"

মা ক্ষমা করিলেও সমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিল না। সমাজপতিগণের প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল সভা ডাকিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং সাধারণের সক্রিয় বিরূপতার জন্য শান্তিপুরে তাঁহার স্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে তাঁহার উপর গালাগালি এমন কি ধুলাবালিও বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ অত সহজে দমিবার পান নন। তিনি জানিতেন সত্য তাঁহার দিকে, তাই তিনি শান্তিপুর পরিত্যাগ না করিয়া সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সংকল্পের দৃঢ়তার ফলে সেই আপাত অসম্ভবও সম্ভব হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "সেই বারেই শান্তিপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল।" বিজয়কৃষ্ণ বার বার বলিতেন বিশুদ্ধ জীবনই ধর্ম-প্রচারের প্রধান অবলম্বন। এই বিশুদ্ধ জীবন চিরদিনই তাঁহাকে শক্তি যোগাইয়াছে, মতবিরোধ সত্ত্বেও অনেককে চুম্বকের শক্তিতে তাঁহার কাছে টানিয়াছে। এই সময়ে আত্মীয়গণের মধ্যে তাঁহার ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় কেবল সস্ত্রীক তাঁহার পাশে দাঁড়ান। মৈত্র পরিবারের সহিত বিজয়কৃষ্ণের সম্বন্ধ বরাবর যেমন নিবিড় তেমনি মধুর ছিল।

আনুমানিক এই সময়েই মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের কোন অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নেতৃত্বে বাংলা বিভাগের ছাত্রগণ একযোগে কলেজ ত্যাগ করেন গোলদীঘিতে বক্তৃতা করিয়া বিজয়কৃষ্ণ বহু ইতস্ততকারীকে স্বমতে আনিয়া ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যবর্তিতায় ব্যাপারটি ছোটলাট বিডন সাহেবের গোচরে আনা হইলে, তাঁহারই আনুকূল্যে ছাত্রগণের নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়। কর্তৃপক্ষ তখন বিনা বাধায় ধর্মঘটকারী ছাত্রদিগকে পুনঃপ্রবেশ করিতে দেন। বিডন সাহেব ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কার্যভার গ্রহণ করেন, সুতরাং ঘটনাটি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে হওয়াই সম্ভব, কারণ তাহা হইলেই বিজয়কৃষ্ণের মেডিকেল কলেজে তিন বৎসরের পাঠ প্রায় সমাপন হইয়াছে বলা যায়। বিজয়কৃষ্ণ দলের নেতা, তাই কর্তৃপক্ষের রাগ তাঁহার উপরই বেশী, সুতরাং কর্তৃপক্ষ তাঁহার জন্য ভিন্ন কোন কাঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আঁটিতেছিলেন। তবে ব্যাপারটি যখন বিচারাধীন সেই সময় বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহ দিন দিন বর্ধিত হইতেছিল, এবং কলেজের পাঠের প্রতি আকর্ষণও কমিয়া আসিতেছিল। বঙ্ক কর মহাশয়ের গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় যে এই বিক্ষোভের পর তিনি আর বড় একটা কলেজ যান নাই, তবে তাঁহার শেষ পরীক্ষা নিকটবর্তী এবং সেই পরীক্ষা না দেওয়ার কারণ হয়ত এই ব্যাপারে কলেজ ত্যাগ নয়, পরন্তু কয়েকমাস পরের প্রচারকার্যে ব্যস্ততা। সে

যাহাই হোক, ঘটনাটিতে বিজয়জীবনে একটি বড় লাভ হইল, প্রতিবাদকারী ছাত্রদের নেতা হিসাবে তিনি সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের সান্নিধ্য-লাভ করিবার সুযোগ পান। বিজয়কৃষ্ণের তেজস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও ধর্মভাব দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং বাংলা বিভাগের উন্নতিকল্পে এক রিপোর্ট প্রণয়ন ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণের প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেন। এই রিপোর্টের ফলেই বাংলা বিভাগ স্বতন্ত্র হইয়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পরিণত হয়। শুনা যায় একদিন বিজয়কৃষ্ণের মুখে ঈশ্বর আলোচনা শুনিয়া বিদ্যাসাগরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। বিজয়কৃষ্ণ তাহা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলেন, "তবে কেন আপনাকে লোকে নাস্তিক বলে ?" বিজয়কৃষ্ণের সারল্যমাখা প্রশ্নে কিছুটা কৌতুকবোধ করিয়া তিনি প্রতি-জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কেন নাস্তিক বলে ?" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনার বোধোদয়ে সকল বিষয়েই পাঠ আছে কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধেই কোন কথা নাই।" মন্তব্যের অকাট্যতা অনুভব করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র আশ্বাস দিলেন পরের সংস্করণে ঈশ্বর বিষয়ে একটি পাঠ থাকিবে। ঈশ্বরচন্দ্র সে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছিলেন। নব্য বাংলার সর্বাগ্রগণ্য স্রষ্টার নিগূঢ় ঈশ্বরপ্রেমের সামান্য প্রকাশের জন্য দেশ বিজয়কৃষ্ণের নিকট ঋণী। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার ঈশ্বরচন্দ্র-জীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

পাঁচ

১৭৮৪ শকের শেষভাগে অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে একদিন এইরূপ আলোচনা হইল যে দেশবিদেশের লোকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিতেছে কিন্তু উপযুক্ত উপদেষ্টার একান্ত অভাব। এই আলোচনার পর বিজয়কৃষ্ণ প্রচারব্রত অবলম্বন করিতে চাহিলেন। আসন্ন ডাক্তারী পরীক্ষা দেবার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি অনায়াসেই পরিত্যাগ করিলেন। অনেক বিজ্ঞ বন্ধু ডাক্তারী পাস না করিলে জীবিকা অর্জনে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া সতর্ক করিলেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের মন বলিয়া উঠিল যিনি মরুভূমির তৃণগুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীরমধ্যে প্রাণিপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিই অসহায় পরিবারকে অনাহার হইতে রক্ষা করিবেন। কেশবচন্দ্রকে মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি বলিলেন প্রচারক হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইবে। বিজয়কৃষ্ণ তাহাতেও সম্মত হইলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ও কেশবচন্দ্রের প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমগ্র ফাইল পড়িয়া

ফেলিলেন। পরে কেশবচন্দ্রের নির্দেশ মত শ্রীরামপুরে দেবেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া আপনার যোগ্যতায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ভার প্রদান করিলেন। (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে)। প্রথম প্রচার বিবরণে তিনি তাঁহার নীতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।" এই নীতি সম্বল করিয়া তিনি এই বৎসরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চারিমাস কাল একযোগে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যেতার কার্য, এবং কোন্নগর, নেবুতলা, পটলডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, সাঁতরাগাছি, শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিয়া এবং উপদেশ দিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কাটাইলেন। তাঁহার ধর্মানুরাগ, ব্যাকুলতা, সংস্কারপ্রিয়তা, উদ্যম ও উৎসাহ ব্রাহ্মধর্মে সহসা একটা অভূতপূর্ব সজীবতা আনয়ন করিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত একটি চিঠিতে (১৮৬৩ পৌষ) কোন ব্রাহ্মকে ব্রাহ্ম মতে পিতার শ্রাদ্ধ-কর্ম করিতে যাওয়ায় যে সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহার উল্লেখ আছে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে আপন মতে অটল থাকিতে উৎসাহ দেন এবং আপন বাসায় আনিয়া সকল ব্যবস্থা করেন। এই চিঠিটি তাঁহার এই সময়ের সমাজ সংস্কারপ্রিয়তার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিকে (১১ই পৌষ) তিনি বাগআঁচড়ায় যান। যশোহর জেলার এই গ্রামটি কলিকাতা হইতে মাত্র সত্তর মাইল দূর হইলেও সেই সময়ে সেখানে গিয়া পৌছান বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল। চাকদহ পর্যন্ত ট্রেনে গিয়া ষোল মাইল পায়ে হাঁটিয়া গোপালপুরে রাত্রি যাপন করিতে হয় তাঁহাকে। পরদিন আবার সাত আট ঘণ্টা হাঁটিয়া বেলা প্রায় দুইটার সময় তিনি গন্তব্য স্থানে পৌছান। প্রচারের জন্য এই কায়িক পরিশ্রম বিজয়-জীবনে মোটেই ব্যতিক্রম নয়—আমরা পরে দেখিব যে পূর্ব বাংলায় প্রচারের জন্য এর অপেক্ষা অনেক ক্লেশসাধ্য ভ্রমণ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। বাগআঁচড়া গ্রামে বিজয়কৃষ্ণ নয়দিন ছিলেন এবং কয়দিনের মধ্যে ঐ গ্রামের তেইশটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে আনয়ন করেন। বাগআঁচড়ার সাফল্যে সারা সমাজ বিজয়কৃষ্ণের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার উপযুক্ত স্থান পান নাই, তবে এই বাগআঁচড়ার প্রচার সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসে যাহা আছে তাহা উল্লেখ করিলেও বিজয়কৃষ্ণের কার্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "An important event of this year (1863) was the formal

appointment of Bijay Goswami as a missionary of the Samaj and his visit to Bag Anchara. Bijoykrishna initiated 23 families into Bramhaism during this memorable year." এই বাগআঁচড়ার ব্রাহ্মদিগের উপর বিজয়কৃষ্ণের প্রভাব অত্যধিক ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায়, He was their patron saint as it were, and his influence amongst them was supreme. বাগআঁচড়ার একজন পত্রপ্রেরক তত্ত্বকৌমুদীতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "এই ক্ষুদ্র পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে জ্ঞানে ধর্ম্মে, সামাজিকতায়, শিক্ষায় সর্বপ্রকারে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় পিতৃসম ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ঐকান্তিক প্রাণে আমাদের জন্য খাটিয়াছিলেন তাহা যদি আমরা কোনও দিন ভুলি তবে আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হইবে।" এই বাগআঁচড়ায় বিজয়কৃষ্ণ পরে বহুবার আসিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি এই যাত্রায় ও পরবর্তীকালে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সত্বর ইহাকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করেন। এ সম্বন্ধে অজিত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার কথায়, "নূতন দলের মধ্যে এই প্রচারের কাজে তখন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সর্বপ্রধান। বাগ-আঁচড়া হইতে কতকগুলি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া দেবেন্দ্রনাথের কাছে খবর পাঠাইলেন। বিজয়কৃষ্ণ সেখানে গেলেন, সেই নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া তাঁহাদিগের মন ভক্তিরসে এমন গলাইয়া দিলেন যে নয়দিনের মধ্যে তেইশটি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। তত্ত্ববোধিনীতে লেখা হইয়াছে যে বাগআঁচড়া গ্রামে ১৫০টি পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গৃহীত হইয়াছে। (ইহা অবশ্য পরবর্তী চেষ্টার ফল) ইহার পরে বাগআঁচড়াতে ইস্কুল, ব্রাহ্মসমাজ, দাতব্য চিকিৎসালয় সমস্ত তিনি নিজের চেষ্টায় তৈরি করিয়াছিলেন। প্রভাতে করিতেন চিকিৎসা, দুপুরে স্কুল মাষ্টারি, রাত্রিতে নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও সপ্তাহে একদিন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা। সেই নিরক্ষর গ্রামটিকে তিনি একা নিজের চেষ্টায় একটা আদর্শ গ্রাম করিয়া তুলিলেন। সেখানকার দোকানীরা দরদস্তুর করা ছাড়িয়া দিল, মামলা মোকর্দমা গ্রাম হইতে উঠিয়া গেল। এক একটি গ্রামের হৃদয় জয় করিয়া গ্রামবাসীদের ভিতর শিক্ষা কর্মনীতি সমস্তই যে কেমন করিয়া দেওয়া যায়, গ্রামের শ্রী কেমন করিয়া ফেরান যাইতে পারে, গোস্বামী মহাশয়ের কর্তৃক এই বাগআঁচড়া গ্রামের উন্নতিসাধনই তাহার হাতে কলমে দৃষ্টান্ত।"

বাগআঁচড়া হইতে ফিরিয়া তিনি বর্ধমান, পাবনা, কুমারখালি, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থানে অবিশ্রান্ত প্রচার করিয়া, তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ও আদর্শ চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্মের দিকে লোকের মন আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। চৈত্রের শেষ দিকে শিলাইদহে দেবেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে বলেন, এখন প্রচণ্ড রৌদ্র, অতএব এ সময়ে পথে পথে ভ্রমণ করা ভাল নয়, তুমি কলিকাতা গমন কর। দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশমত তিনি কলিকাতা ফিরিলেন বাংলা বৎসরের প্রথম দিকে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি প্রচারকের অতি উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ, পবিত্র জীবন, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শক্তি অনেক লোকের মনকে পরিবর্তিত করিয়াছে। তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি সংসারের সমুদায় আশা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ বড় একটা বাহির হইত না, তবে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রথম প্রকাশিত মাসিক ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত বিজয়কৃষ্ণের একটি প্রচার বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে ৯ই জ্যৈষ্ঠ তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ১২ই আপনার প্রিয় বাগআঁচড়ায় পুনরায় গিয়া পৌছান। এ যাত্রায় তিনি সেখানে ৩৯ দিবস অবস্থিতি করিয়া বাগআঁচড়া, কলারোয়া, বগুড়া ও অমৃতবাজার প্রভৃতি নিকটস্থ পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। এইবার বাগআঁচড়ায় গিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজ গৃহস্থাপন করেন, একটি ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় ও স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ ভ্রমণ সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্বের মন্তব্য এইরূপ—"প্রায় দেড়মাসকাল সেখানে অতিবাহিত করিয়া তিনি যে সকল গৃহের সূত্রপাত করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে সেই সকল গৃহ নির্মাণ করিতে প্রতিব্রাহ্মেরই স্বাবকাশানুসারে তথায় যাওয়া কর্তব্য। যদিও গোস্বামী মহাশয়ই ঈদৃশ সরল পল্লীগ্রামবাসীদিগের মনে ব্রাহ্মধর্মের সহজ ভাবসকল মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত, তথাপি প্রতি ব্রাহ্মেরই তাঁহাকে সাহায্য করা আবশ্যক।" এইখানে বলিয়া রাখি যে বিজয়কৃষ্ণ সুবিধা হইলেই এই গ্রামটিতে মাঝে মাঝে গিয়া গ্রামবাসীদিগকে প্রেরণা দিয়া আসিতেন। এই গ্রামে তাঁহার আরব্ধ কাজগুলিকে স্থায়ী করিবার মানসে তিনি সেখানে কয়েকজন আদর্শবাদী যুবককে স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য প্ররোচিত করেন এবং পর বৎসর (১৮৬৫) শেষের দিকে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (পরে চিরঞ্জীব শর্মা

নামে খ্যাত) এবং গোবিন্দচন্দ্র রায় (কত কাল পরে বল ভারত ওরে প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতা) মহাশয়দ্বয়কে ঐ কর্মে নিয়োজিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় "He returned to Calcutta and soon succeeded in inducing some young men who offered themselves for the service of the Samaj to accompany him to Baganchra to open a regular field of mission work in that village. Amongst them the names of Trailokya Nath Sanyal and Gobinda Chandra Roy may be specially mentioned. এই বারের অবস্থিতি-কালে, বাগআঁচড়ার একজন ব্রাহ্ম (প্রাণনাথ মল্লিক) তাঁহাকে বলিলেন, "যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ তবে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়, এবং বেচারামবাবু উপবীত ত্যাগ না করিয়া কি প্রকারে বেদীর কার্য করিতেছেন ? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে।" বিজয়কৃষ্ণের নিকট এ প্রশ্ন সমীচীন মনে হইল এবং ২৩শে আষাঢ় কলিকাতায় ফিরিয়া সমাজের সম্পাদক কেশব সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি পত্রযোগে জানাইলেন যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যাহা অন্যান্য সমাজের আদর্শ সেখানের উপাচার্যগণ যদি উপবীতধারী হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অসত্যের আলয় বলিয়া ত্যাগ করিবেন। কেশব সেন মহাশয় এই ব্যাপার মহর্ষির গোচরে আনিলে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে পূর্বাহ্নে বিজ্ঞাপন দিয়া, পরিশেষে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২১ আগস্ট তারিখে বিজয়কৃষ্ণ ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে উপাচার্য নিয়োগ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ অবশ্য এই পদ গ্রহণ করিতে প্রথম সম্মত হন নাই, তবে কেশব সেন মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে পরে রাজী হন। এই অভিষেক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করিতে গিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেন, "এই ব্রাহ্মদ্বয় যেরূপ উৎসাহ ও নিষ্ঠা সহকারে এতৎকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ পালন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকেই উক্ত পদের বিশেষ উপযুক্ত বোধ হয়। কাহারও অকারণ প্রশংসা করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পক্ষে সম্ভবে না। কিন্তু এই দুই ব্যক্তি ধর্মের জন্য যেরূপ ক্লেশ, যতদূর অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, তাহা সর্বসাধারণ সকল ব্রাহ্মের অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্ঞান করা উচিৎ।"

অভিষেক উপলক্ষ্যে দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে যে উপদেশ দেন, তাহা এইরূপ :

"সৌম্য, তুমি অদ্য ঈশ্বর প্রসাদে উপাচার্য পদে অভিষিক্ত হইলে। তুমি এই

ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্তব্যজ্ঞান উপার্জনে সর্বদা যত্নশীল থাকিবে; এবং সর্বসাধারণ মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনে ও গৃহধর্ম যাজনে নিরলস হইবে। নিয়ত ধর্মানুষ্ঠানে পবিত্র স্বরূপের সহবাসে আনন্দ উপভোগ করিবে এবং সদুপদেশ ও সাধুচেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে। গুরুজনকে ভক্তি করিবে, বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান দিবে। স্বাধীন হইয়া বিনয়ী হইবে। পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে, কাহারও প্রতি দ্বেষ করিবে না। অন্যে যদি তোমার প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবে। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, কিন্তু সর্বদা সাধুই থাকিবে। সম্পদে বিপদে, স্তুতি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, অভিপ্রায় মহান হউক, ধর্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক, তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্রকথা শ্রবণ করুক। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওঁ।"

বিজয়কৃষ্ণের সমগ্রজীবন সাক্ষ্য দিবে যে মহর্ষির উপদেশের ষোল আনার অতিরিক্তই যেন তিনি পালন করিয়াছিলেন। বন্ধুবর যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'বীরপূজায়' লিখিয়াছেন, বিজয়ের হৃদয় ছিল শোধিত সুবর্ণ। সোনাকে সোনা হইতে বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ বড় বেশী দাবী করেন নাই। বিজয়কৃষ্ণ সকলের সকল প্রত্যাশার উর্ধ্বে উঠিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শের অচিন্তনীয় উচ্চতাই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সংঘর্ষের কারণ। এই উচ্চাদর্শের জন্যই দুইটি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সামান্য মতানৈক্য হয়। এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ নিজে যেমন লিখিয়াছেন (ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা) তাহাই উদ্ধৃত করি। "একদিন দুই প্রহর বেলায় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি গরদের বস্ত্র, অঙ্গুরী ও একখানি পত্র লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। পত্রখানি দেবেন্দ্রবাবুর হস্তাক্ষরে লিখিত, কিন্তু তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে অদ্য সায়ংকালে আমার পৌত্রের নামকরণ হইবে। আপনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন এবং প্রেরিত বস্ত্র সকল গ্রহণ করিবেন।"

"বরণের দ্রব্যগুলি দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইতে লাগিল। মনে করিলাম এই সকল ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পৌরোহিত্য প্রথা প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া বরণের দ্রব্যগুলি প্রতিপ্রেরণ করিলাম। আমি বরণ গ্রহণ

করিলাম না বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দর্শন করিলাম। তজ্জন্য আমার মনে এত দুঃখ হইয়াছিল যে দেবেন্দ্রবাবুর নিকট ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।"

"একদিন দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমি তোমাকে যেখানে যাইতে বলিব সেখানে যাইতে হইবে। সেই কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। যে জীবন ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব? আমি দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলাম, 'ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচারক্ষেত্রে গমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন, প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্রবাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল স্থানে গমন করিতে পারি না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।' পরে বলিলেন যে স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর; বীজ বপন কর, ঈশ্বরের কৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের চিন্তা করিও না, ফলদাতা ঈশ্বর, তিনি তোমার সহায় থাকুন।"

বিজয়কৃষ্ণের সহিত দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগতভাবে হৃদ্যতার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীন ও নবীনদলের মধ্যে মতানৈক্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। দেবেন্দ্রনাথেব নেতৃত্বাধীনে প্রাচীনগণ মূলত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়াই ব্রহ্মোপাসনায় রত থাকিতে চাহিতেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি নবীনদের আদর্শ কেবলমাত্র ধর্মসংস্কারেই আবদ্ধ ছিল না, প্রয়োজনীয় সমাজসংস্কারেও তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল সুস্পষ্ট। বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়" এই নবীন প্রবীণের বিরোধটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম মনে করিলেন যে কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের ভার লইয়া যেরূপ কাজ আরম্ভ করিয়াছেন ইহাতে পৌত্তলিক সমাজে মহা গোলযোগ হইবে। সপ্তাহান্তে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিলেই হইল, পৌত্তলিকতা ছাড়িবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্ম অগ্রসর হইতে ভীত হইয়া দেবেন্দ্রবাবুর নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, কেশববাবুর হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার দেওয়াতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যেরূপ হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর কিছুদিন তাঁহার হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ লোকশূন্য হইবে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবে না। এখনও যদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে

চান, তবে শীঘ্র কেশববাবুর নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করুন। বিশেষতঃ বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবুকে উপাচার্য্য হইতে না দেওয়াতে তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হইয়াছে। আপনি পুনর্বার তাঁহাদিগকে উপাচার্য্য করুন।" দেবেন্দ্রনাথ বন্ধুগণের রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার ব্যবস্থা যথার্থ মনে করিয়া প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিপক্ষের বক্তব্য ও শক্তির পরিমাপ করিলেন না।

দুই পক্ষের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় ঐ বৎসরের বিশে আশ্বিনের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত কলিকাতা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "কলিকাতা নগরে মহাপ্রলয় ঘটিল। প্রকাশ্য পথে বর্ষাকালের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বে গৃহ সকল ভগ্ন হইতেছে, আহত ব্যক্তিদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কার সাধ্য গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে? সে দিবস বধুবার, এজন্য যতই বেলা অবসান হইতে লাগিল, ততই সমাজে যাইবার জন্য মনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে আর থাকিতে পারিলাম না। বন্ধুবান্ধব সকলেই বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাজে যাইবার জন্য মন এত ব্যাকুল হইল যে আর কাল বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সমস্ত পথ প্রায় সন্তরণ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখি কেহই উপস্থিত হন নাই।" তখন ভৃত্যদ্বারা একখানি পত্র পাঠাইয়া তিনি মহর্ষির মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, "আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার হইতেছে, তুমি তাহাতে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।" তৎপর বিজয়কৃষ্ণ একাকী উপাসনা করিয়াই গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় আচার্য কেশবচন্দ্রকে পাল্কী করিয়া মন্দিরে যাইতে দেখিয়া, পুনর্বার মন্দিরে গিয়া উভয়ে একযোগে উপাসনা করিলেন। অত্যানুরক্তি যদি ভক্তি হয়, তবে ইহা অপেক্ষা উচ্চস্তরের ভক্তি কোথায় মিলিবে? ঘটনাটি যেন বিজয়কৃষ্ণের ঈশ্বরের নিকট সুস্পষ্ট নোটিশ যে হে নিভৃত গুহাবাসী ঈশ্বর, জানিয়া রাখ তোমার সন্ধানে বিজয় তাহার মহান যাত্রা শুরু করিয়াছে, তুমি যতই কেন লুকাইতে চাও, বিজয় তোমায় আবিষ্কার করিবেই।

ছয়

আশ্বিনের এই ঝড়ে ব্রাহ্মসমাজ গৃহটি এমনই ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় যে সমূহ সংস্কার ভিন্ন সেখানে উপাসনা সম্ভব ছিল না। সুতরাং পরবর্তী বুধবার হইতে

দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে উপাসনা হইবে এই মত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। উপাসনার দিন দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন, "অন্নদাবাবু পীড়িত আছেন আসিতে পারিবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়াশী মহাশয় অদ্য বেদীর কার্য্য কর।" এই মর্মে কেশবচন্দ্রকেও পত্রদ্বারা জানাইলেন। পাকড়াশী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করেন নাই, সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের বুঝিতে বাকী রহিল না যে উপবীতধারী ব্রাহ্মকে বেদীতে আনিয়া, যে সামান্য সংস্কার মাত্র দুইমাস পূর্বে সাধিত হইয়াছিল তাহাও নাকচ হইতে চলিয়াছে। কেশবচন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেও মহর্ষি পরিচালিত উপাসনায় প্রথম যোগ দেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিজয়কৃষ্ণই দেবেন্দ্রনাথের ঐ কার্যের প্রধান আপত্যকারী ছিলেন, তিনি অগ্রগামী ব্রাহ্মদিগকে ঐ উপাসনায় যোগ দিতে নিরস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া অন্যত্র উপাসনা করেন। কেবশচন্দ্রও পরে বিজয়ের উপাসনায় উঠিয়া আসেন। শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "On that occasion, however, Mr. Sen quietly took his seat amongst the congregation but his more ardent associate Bijay stood at the door and prevented such of the younger party as he could persuade from joining the congregation and led them out to hold an independent service on the terrace of the house of one of them." স্মরণ থাকে যে বিজয়ের এই সময় বয়স মাত্র তেইশ। * চরিত্রের কতখানি দৃঢ়তা থাকিলে মহর্ষির ন্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক সহায়-সম্বলহীন তরুণ এইরূপ সম্মুখ সমর ঘোষণা করিতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তখন বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে জাতিভেদের শৃঙ্খল দূর করিতে কৃতসংকল্প, এবং যাহা তাঁহার নিকট একবার সত্য বলিয়া মনে হইত তাহা পালনের জন্য কোন স্বার্থত্যাগই তাঁহার নিকট অধিক মনে হইত না। সমাজ হইতে জাতিভেদ দূরীকরণের জন্য অসবর্ণ বিবাহের কথাও তিনিই প্রথম ভাবিতে শুরু করেন এবং তাঁহার ভগ্নীপতি কিশোরী মৈত্র মহাশয়ের কন্যা রাজলক্ষ্মীর সহিত প্রসন্ন সেন মহাশয়ের বিবাহও এই সময় বরাবরই হয়।

---

* বিজয়-জীবনীতে কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম বার বার উল্লিখিত হইবে, সুতরাং শেষোক্ত দুই জনের জন্ম তারিখ দুটি জানিয়া রাখা ভাল। কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এবং শিবনাথ ১৮৪৭এ; অর্থাৎ একজন বিজয়কৃষ্ণ অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়, অন্যজন ছয় বৎসরের ছোট।

প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ এতদিন ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে বিস্ফোরিত হইয়া উঠিল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কার্য পরিত্যাগ করিলেন এবং বিজয়কৃষ্ণ ও অগ্রগামী যুবকদের লইয়া স্বতন্ত্র প্রচার বিভাগ গঠন করিলেন ; ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্তিক মাস হইতে দলের মুখপত্র হিসাবে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হইল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৌষ (১৮৬৪ ডিসেম্বর) সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নের বিজ্ঞাপন দুইটি এই বিচ্ছেদকে ঘোষিত করিল :

বিজ্ঞাপন (১)

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কায্যের ভার তাহার ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সহিত আমাদের সম্বন্ধ অদ্যাবধি শেষ হইল।

১লা পৌষ
১৭৮৬ শক

শ্রীতারকনাথ দত্ত
শ্রীউমানাথ গুপ্ত (অধ্যক্ষ)
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন (সম্পাদক)
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার (সঃ সম্পাদক)

(২)

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীড অনুযায়ী উপাসনা কার্য্য সম্পাদনের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় ট্রাষ্ট সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নবীন ব্রাহ্মদলকে যে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবে স্বর্গীয় প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া অদম্য উৎসাহে যুবকদল সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে লাগিয়া

গেলেন। বলা বাহুল্য প্রগতিশীল দলের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বিজয়কৃষ্ণকে কেশব সেন মহাশয়ের more ardent associate বলিয়াছেন তাহাতে এতটুকু অতিরঞ্জন নাই। ঐ সময়ের সকল কাজে বিজয়কৃষ্ণ কেশব সেন মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত এবং সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় পরামর্শদাতা ছিলেন। নূতন সমাজের জন্যও বিজয়কৃষ্ণ অমানুষী পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তকার লিখিয়াছেন, "বর্ষার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরি তরঙ্গিণী যেমন প্রবল বেগে উভয়কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমুচ্ছ্বসিত প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মনামে সেইরূপ দেশ দেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন।" তাঁহার দেহান্তের পরই তত্ত্বকৌমুদী তাঁহার প্রচারকার্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিল, "বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গদূতের ন্যায়, প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নামিলেন। দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ মহামন্ত্র সার করিয়া, প্রভুর চরণে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া, প্রভুর মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃক্‌পাত করিলেন না, পরিজনের সুবিধা অসুবিধা সুখ স্বচ্ছন্দতার পানেও চাহিলেন না এবং নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে পূর্ণ প্রাণে প্রভুর কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাঙ্মুখী হইল।" এই কথাগুলি বিজয়কৃষ্ণের সমস্ত প্রচারক কাল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাঁহাকে যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার কার্যের যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শক তাঁহারা তাঁহার প্রশংসার যেন সমুচিত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্য বিজয়কৃষ্ণের ক্রমান্বয় ভ্রমণকে আজকালের ভাষায় hurricane campaign বলা যায়। এই ব্যপদেশে তিনি পূর্ববাংলার বহু স্থানে, এবং পরে এলাহাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, মথুরা, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থানে একাধিকবার গমন করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় কিছুদিন করিয়া থাকিয়া স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে জ্বলন্ত বক্তৃতা দ্বারা এবং আপনার অনুপম জীবনাদর্শ দ্বারা ধর্মাকাঙ্ক্ষা জাগরিত করেন। এই সকল ভ্রমণের ঠিক ঠিক তারিখ তাঁহার জীবনী গ্রন্থগুলিতে ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না। আমার এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহার জীবন আলোচনায় যতদূর সম্ভব একটি সাময়িক ক্রম আনয়ন করা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি তাঁহার প্রচাবক পদে বৃত হওয়ার পর হইতেই তাঁহার আত্যন্তিক প্রচারকার্য শুরু হয়। ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পরেই এই সমাজ তাঁহার প্রচারকার্যের উপর কতটি নির্ভরশীল ছিল তাহা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে

বুঝা যাইবে। ধর্মতত্ত্ব লিখিতেছে, যাঁহারা ধর্মের উন্নতির উপর জীবনের যাবতীয় সুখ নির্ভর করিয়াছেন, ধর্মের উন্নতির বার্তা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহারা তৃষিত চাতকের ন্যায় লালায়িত হইয়া থাকেন। যখন পৃথিবীর চতুর্দিকে কেবল আপনার জয়, আপনার মহিমা, আপনার ক্ষতিলাভ গণনা করিতে লোকে ব্যতিব্যস্ত থাকে, যাঁহারা সেই পরম পিতার চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, সেই পিতার জয়, পিতার মহিমার প্রতি তাঁহারা অনিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। এবং যিনি ক্ষুদ্রতম বালকের অর্ধপরিস্ফুট প্রার্থনা বাক্যের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া তাহার আশা পূর্ণ করিবার জন্য স্বীয় কোমল হস্ত পরিচালিত করেন, তিনি যে পূর্ণ মহিমাতে এ পৃথিবীকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহার অনুগত ভৃত্যাদিগের আশা পূর্ণ করিবেন তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি যদি তাঁহার স্বর্গীয় জ্যোতি এ পৃথিবীর একজনের হৃদয়েও বর্ষণ করিয়া থাকেন, তবে সেই এক হৃদয়ের প্রভাবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত জ্যোতিষ্মান হইবে। কিন্তু সত্যের জয় আকস্মিক ও অস্থির নহে। দুর্জয় শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে, জটিল কুটিল কণ্টকময় ক্ষেত্র সকল অতিক্রম করিতে হইবে, বিশাল পর্বত সকল সমভূমি করিতে হইবে। শুদ্ধ এই কারণে আমরা সকল সময়ে সত্যের জয় বা সত্যের উন্নতির সংবাদ শুনিতে পাই না। এই বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে যিনি শরীরের, পার্থিব সুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সত্যের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, এ পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা তাঁহার নিকট উত্থিত হউক, তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রতি ব্রাহ্মের হৃদয়-সূত্র আকর্ষিত হউক ; তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে প্রতি ব্রাহ্মের অন্তরে অঙ্কিত হউক।" এই দীর্ঘ প্রশস্তি যে বিজয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা পরের পরিচ্ছেদে স্পষ্ট হইবে। তাহা এইরূপ, "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঈদৃশ বিঘ্ন রাশির মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিবার জন্য নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। বাগআঁচড়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কালনা, ঢাকা ও কুমিল্লা প্রদেশে প্রচার করিবার জন্য তিনি কয়েকমাস হইতে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতেছেন। এবং সেই প্রদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল পত্র আসিতেছে তাহাতে বিশেষরূপে তাঁহার পরিশ্রমের ফল অবগত হওয়া যাইতেছে। তিনি সম্প্রতি ঢাকা ও কুমিল্লা প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার স্মরণলিপি আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা তাহার সার সংগ্রহ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পাঠে সকলেরই হৃদগত হইবে যে এখন অল্প আয়াসে কতদূর ফললাভের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে।"

বাগআঁচড়া ভ্রমণ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই যথাস্থানে লিখিয়াছি। ধর্মতত্ত্ব

অনুসারে আশ্বিন মাসের বিরোধের পর, কার্তিক মাসের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ মাসের বিংশতি দিবস পর্যন্ত তিনি শান্তিপুরে থাকিয়া, শান্তিপুর, কালনা, কৃষ্ণনগরে দশটি বক্তৃতা করেন। তারপর পুনর্বার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ২৮শে অগ্রহায়ণ দিবসে ঢাকা প্রদেশে যাত্রা করেন।[১] "প্রায় দুই মাস তিনি পূর্ব প্রদেশে অবস্থিতি করেন। ইহার মধ্যে একমাসে কুমিল্লায় ২২টি বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতাতে ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস সুন্দররূপে বিবৃত করেন এবং অসাধারণ উৎসাহ সহকারে শ্রোতৃদিগের উৎসাহ ও অনুরাগ বর্ধন করেন। ঐ সকল বক্তৃতা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই উপযোগী হইয়াছিল এবং একজন বন্ধুর পরিবারের হৃদয়ে বিজয়ের অগ্নিময় বাক্য ও মধুময় গান যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিল তাহা ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।"

ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের গোড়াপত্তন করেন ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং আলোচ্য সময়ে তিনি কুমিল্লায় ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম মিলনটি তাঁহার কন্যা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "পিতৃদেবের কুমিল্লায় অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্ন একটার সময় দুইটি ভদ্রলোক[২] আসিয়া সদরের ঘরের বারান্দায় বসিলেন। ভৃত্যেরা ঘুমাইয়াছিল, কেহ তত্ত্ব লয় নাই। অপরাহ্ণ চারটার সময় পিতৃদেব তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভৃত্যগণকে স্নানের তেল ইত্যাদি দিতে ও বাড়ীর ভিতর হইতে জলখাবার আনিয়া জল খাওয়াইয়া শীঘ্র রান্নার আয়োজন করিয়া দিতে বলিলেন। এবং অন্দরে আসিয়া বলিলেন, "শান্তিপুরের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আলিয়ারগঞ্জ হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বেলা একটার সময় হইতে বসিয়া রহিয়াছেন, বাসার লোকগুলা ঘুমাইয়া ছিল, একবার সংবাদও লয় নাই। ইহাতে মনে বড় ক্লেশ পাইয়াছি। ইনি সাতশত ঘর শিষ্য ছাড়িয়া পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন। তৎপর গৃহে এবং ব্রাহ্মসমাজে গোস্বামীমহাশয়ের উপাসনায় কুমিল্লা সহর জাগিয়া উঠিল। পিতৃদেবের সঙ্গে ইহার অত্যন্ত বন্ধুতা জন্মিল। ইঁহার স্বার্থত্যাগ, ধর্ম-

---

১ অর্থাৎ উল্লিখিত "বিজ্ঞাপন" প্রকাশের কয়েকদিন পূর্বেই। মনে রাখিতে হইবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরই বিচ্ছেদ পুরাপুরি হয় নাই। ১৭৮৬ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে বিজয়কৃষ্ণকে পৌষ মাসের প্রচারক বৃত্তিবাবদ ৩০৲ টাকা ও ঢাকা গমনের পাথেয় হিসাবে ১০৲ টাকা দেওয়ার সংবাদ আছে। —লেখক।

২ এ দফায় অঘোর গুপ্ত তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় যান নাই—যাইলে তাঁহার নামও তত্ত্ববোধিনীতে উল্লিখিত হইত। —লেখক।

পিপাসা ব্যাকুলতা দেখিয়া ইহার উপর আমাদের অত্যন্ত ভক্তির উদ্রেক হইল।" মিত্র মহাশয়ের জন্ম ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তিনি বিজয়কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রায় বিশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে পরে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা জন্মে এবং তাঁহাকে লিখিত বিজয়কৃষ্ণের পত্রের কথা আমরা কিছু পরেই বলিব। সম্প্রতি বিজয়কৃষ্ণের কুমিল্লা ও ঢাকায় বক্তৃতা সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরবাবুর অভিমত মাত্র উল্লেখ করিব। তিনি আপন ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, "কুমিল্লায় অবস্থান কালে বিজয়-কৃষ্ণ প্রতিদিন একবার কখনও কখনও দিনে দুইবার ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। ইহার পর বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় গমন করিয়া সেখানেও ঐরূপ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এত লোক সমাগম হইতে যে ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজ হলে শ্রোতাদিগের স্থান সঙ্কুলান হইত না, অনেকে বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন।" বঙ্ক কর মহাশয় তাঁহার বিজয় জীবনীতে লিখিয়াছেন "শোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত অনুরাগ ও আগ্রহের সহিত (ঢাকায়) তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বক্তৃতায় অনেক যুবকের মনে ব্রাহ্মধর্মের স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহার ফলস্বরূপ বিখ্যাত গৌরসুন্দর রায় মহাশয়ের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত ত্যাগ করিয়া সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন।"* বিজয়কৃষ্ণের আগমনের পূর্বে ঢাকায় ব্রাহ্ম-ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের কোন বিরোধের বিশেষ কারণ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু উপবীত ত্যাগী ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণের অগ্রসর মত প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজের শান্ত বক্ষ বাত্যাবিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ণ নিজে লিখিয়াছেন, "এমন কি আমি উপবীত ত্যাগী বলিয়া অনেক স্থানের ব্রাহ্মগণ আমাকে বাসায় স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কেহ কেহ বাসায় স্থান দিয়া সমাজচ্যুত হইলেন।" হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয় কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যখন বিজয়কৃষ্ণের অভাবনীয় প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তখন হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার্থে সজাগ হইয়া উঠিল এবং হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করিল। তেইশ বৎসরের যুবক বিজয়কৃষ্ণের এই স্বল্পস্থায়ী স্থিতিতেই ঢাকা শহর জাগিয়া উঠিল, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র সত্যই উন্মুক্ত হইল। বিজয়কৃষ্ণের সাফল্যে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছিল তাহা ধর্মতত্ত্বের উদ্ধৃত

* বাগআঁচড়া প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। ইনি বিজয়কৃষ্ণের সহিত কলিকাতা গিয়া বিজয়কৃষ্ণের শান্তিপুর বাটীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরে বাগআঁচড়ায় গিয়া বিজয়কৃষ্ণের আরব্ধ কার্যে সহায়তা করেন। —লেখক।

অংশই প্রমাণ। স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে পত্র লিখিলেন,

"জয় জগদীশ"

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

জয় জয় বিজয়ের জয়। তুমি যে জয় পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আসিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জ্বলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? আবার বলি জয় জয়! ব্রাহ্মধর্মের মহিমা এতদিন সত্য-পরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। আর আমাদের ভয় কি ? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর। বৈরাগী হইয়া সংসারকে পদানত কব। উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর। প্রীতিসূত্রে সকলকে বদ্ধ কর, এবং দেশ বিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তৃত কব, এবং তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সম্রাট অপেক্ষা ধনবান কর। আমবা আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ কবিয়া বহিয়াছি। তুমি যত প্রচার করিবে, ততই আমাদের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইবে। ভাল একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন ? তুমি কি একা সমুদায় সুখ ভোগ করিবে ? ঢাকাতে যে সকল অমূল্য রত্ন ঢাকা ছিল তাহা কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে ? আমাকে কি একবারও ডাকিতে নাই ? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবে না ? আমার কি ঢাকায় যাইবার কোন সুবিধা নাই ? তুমি না পথ দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসব হইবার যো নাই।

কলিকাতা কলুটোলা
২৪শে মাঘ, ১৭৮৬শক
(১৮৬৫ ফেব্রুয়ারী)

আভিন্ন হৃদয়ে—
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এই উদার এবং অন্তবঙ্গ চিঠিখানি এই দুই বিখ্যাত বাঙালীর মধ্যে আলোচ্য-কালে যে মধুব সম্পর্ক ছিল, তাহা প্রকাশ করিতেছে। তবে এটুকু জানিয়া রাখিতে হইবে যে সেন মহাশয়ের উচ্ছ্বাসময় এই প্রশংসার সবটুকুই বিজয়কৃষ্ণের ন্যূনতম প্রাপ্য ছিল। ব্রাহ্মধর্মের জন্য তাঁহার প্রাণভোলা আত্ম-বিনিয়োগের সম্যক প্রশংসাব জন্য উপযোগী ভাষাই বোধ করি নাই। শুধু কেশব সেন মহাশয় বলিয়াই নন তাঁহাব সমসাময়িকগণ সকলেই একবাক্যে বিজয়কৃষ্ণের প্রচার প্রচেষ্টার

অনুরূপ আবেগময় প্রশংসাই করিয়াছেন। বঙ্ক কর মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন, "প্রচার কার্য্যে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না, যেন ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়াছেন; কোথাও এক সপ্তাহ, কোথাও দুই সপ্তাহ, কোথাও বা ততোধিক সময় অবস্থান করিয়া বক্তৃতা উপাসনাদি করিয়াছেন, এবং কার্য্যাবসানে পুনরায় স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই, আহার নিদ্রার প্রতি দৃষ্টি নাই, অথচ কোন কোন দিন দুইবার তিনবার উপাসনা বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। এইরূপ ক্লান্তি-বিহীন পরিশ্রম ও বিশ্রামবিহীন পর্য্যটন কখনও কেবল মানুষের ইচ্ছায় হইতে পারে না।" প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়াই বিজয়কৃষ্ণ ঐরূপ দৈবী উৎসাহের সহিত তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাই "দেশ বিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তার কর" কেশবচন্দ্রের পত্রের এই স্থানটি পড়িয়া বিজয়কৃষ্ণের অন্তরপুরুষ বোধ হয় ঈষৎ হাসিয়া ছিলেন,—কারণ বিজয়ের আগমন ত "আমাদের" রাজ্য বিস্তার করার জন্য নয়, তাঁহার আগমন "ঈশ্বরের" রাজ্য বিস্তার করার জন্য। যাক্ সে অবশ্য পরের কথা—এখন বলিবার প্রয়োজন নাই।

সাত

এই দফায় বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের পত্র পাইবার কিছুদিন পরই ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়া থাকিবেন। মাঘের শেষ হইতে পর বৎসরের প্রথম কয়েকমাস আমরা বিজয়কৃষ্ণের কার্যাবলীর বিশেষ কোন লিখিত প্রমাণ পাই না। কারণ তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত প্রচারবিমুখ ছিলেন। এই কয়মাস তিনি কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বক্তৃতা ও উপদেশাদি দিয়া থাকিবেন, তবে ঢাকায় থাকা কালে অত্যধিক পরিশ্রম ফলে কলিকাতায় ফিরিয়া যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন তাহা মনে করিবার হেতু আছে।

আমরা ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সহিত বিজয়কৃষ্ণের নবার্জ্জিত ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। হেমলতা দেবী প্রণীত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জীবনীতে বিজয়কৃষ্ণ লিখিত মোট একুশটি পত্র প্রকাশিত আছে। বিজয়কৃষ্ণ লিখিত পত্র খুব বেশী পাওয়া যায় না, সুতরাং বিজয়কৃষ্ণকে জানিবার পক্ষে এই পত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান। বিজয়কৃষ্ণের কোন চরিত্র লেখকই এই পত্রগুলিতে কিছু সময় না দিয়া পারিবেন না। আমরাও এই পত্রগুলি হইতে প্রয়োজনীয় অংশাদি উদ্ধার করিয়া আমাদের আলোচনা চালাইব। এই পত্রগুলির রচনাকাল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ এপ্রিল প্রথম পত্রখানির রচনা কাল ১৭৮৭

শক ২৩শে শ্রাবণ, অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট। এই পত্র হইতে জানি যে বিজয়কৃষ্ণ অসুখে পড়িয়া ছিলেন, এবং পত্র রচনা কালেও সম্পূর্ণ নীরোগ হন নাই। ১লা ভাদ্রে লেখা দ্বিতীয় পত্রেও দেখি, "এখনও শরীরে জ্বর আছে, বমন উদ্রেক হইতেছে।" এই পত্র হইতে আরও জানা যায় কবি গোবিন্দ্রচন্দ্র রায় বিজয়কৃষ্ণের শান্তিপুরস্থ বাটীতে রহিয়াছেন। নিজের অসচ্ছল অবস্থার মধ্যেও বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে তিনি সর্বদাই ব্যাকুল থাকিতেন। তৃতীয় পত্রখানি বিশেষ মূল্যবান। ইহার তারিখ ১২ই ভাদ্র। এই পত্রে বুঝা যায় যে মিত্র মহাশয় বিজয়কৃষ্ণের অসুখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কারণ বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "আমার পীড়ার ঔষধ ব্যয় অধিক নয়, বিশেষতঃ এইক্ষণ পীড়া নাই। আপনি আমাকে যে অমূল্য স্নেহরত্ন দান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আমি অন্য দানের অভিলাষী নই। আপনার অর্থ আমাকে চিরকাল সুখী করিবে না, কিন্তু আপনার স্নেহ দ্বারা চিরকাল সুখভোগ করিব। আপনার পত্র পাইলে এবং আপনাকে পত্র লিখিতে আমার যে আনন্দ হয়, অর্থের সহিত তাহার বিনিময় হয় না। আমি যদি আমার পাষাণ হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত করিতে পারি এবং বন্ধুদিগের অমূল্য স্নেহরত্ন উপভোগ করি, তাহা হইলে দারিদ্র্য যন্ত্রণা আমার নিকটেও আসিবে না। তখন ছিন্নবস্ত্র পট্টবস্ত্র বোধ হইবে, তৃণশূন্য পর্ণকুটির রাজপ্রাসাদকে তিরস্কার করিবে। বলিতে কি এই অবস্থাই এই অধমের প্রার্থনীয়।" অযাচিত অর্থ সাহায্যের এই অতি বিনীত প্রত্যাখ্যান, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা কড়ি প্রভৃতির প্রতি তাঁর একান্ত অনাসক্তি নিঃসংশয়রূপে বিঘোষিত করে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে দারিদ্র্য মানুষকে ঈশ্বরের নৈকট্য দেয়, নতুবা তিনি অগণিত শিষ্যবাড়ির স্থায়ী আয় পরিত্যাগ করিয়া এই অনশন, অর্ধাশনের পথ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবেন কেন? পয়লা সেপ্টেম্বরের পত্রে বুঝিতে পারি যে তিনি প্রচারক বৃত্তি না লইয়া স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া প্রচার কার্য চালাইতে সংকল্প করিয়াছেন. তিনি লিখিতেছেন, "আমি কাহারও সাহায্য না লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে অভিলাষ করিয়াছি, এজন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে মাসিক যে সাহায্য পাইতাম তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।* ধর্মের কার্য্য করিয়া অর্থ গ্রহণ করা কর্তব্য বোধ হয় না। ধর্মের জন্য যদি অন্নাভাবে শুষ্ক হইয়া মরিতে হয়, তজ্জন্য কি ধর্মপথ

* ১৭৮৬ শকের পৌষের বৃত্তির পর আর তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়ার উল্লেখ নাই। মনে হয় তখন হইতেই বৃত্তি বন্ধ না হইলেও অনিয়মিত হইয়া থাকিবে। —লেখক।

পরিত্যাগ করিতে হইবে? কখনই নয়। যদিও আমি ধনহীন দরিদ্র কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে, তাঁহার উদার সদাব্রতে কেহই উপবাসী থাকে না। আমি মনে করিয়াছি যে কোন স্থানে কৃষি কার্য্য করিব এবং সেখানে ডাক্তারি শিক্ষা করিব। × × × কোন মনুষ্যের অধীনতায় থাকিতে পারিব না।" ৩০শে ভাদ্রের পত্রে দেখি ব্রজসুন্দরের পরামর্শে তিনি ঢাকা শহরে চিকিৎসা করিবেন এই সংকল্প করিতেছেন কিন্তু ঢাকার মত শহরে তাঁহার মত পাস না করা ডাক্তারের মোটেই চাহিদা হইবে কি না সে সম্বন্ধে তাঁহার জিজ্ঞাসা উঠিতেছে। তাঁহার ভাষায়, "কিন্তু দেখা কর্ত্তব্য আমার দ্বারা ঢাকার লোকেরা চিকিৎসা করাইতে সম্মত হইবে কি না। আমার বিষয় আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে মেডিকেল কলেজে বাংলা ক্লাশে যতদুর শিক্ষা হয় তদ্বিষয়ে আমার অপরিপক্বতা নাই। তবে আমার ডিপ্লোমা নাই, সেইজন্য লোকে শ্রদ্ধা না করিতে পারে। যাহা হৌক আপনি যদ্যপি ঢাকায় থাকা উচিৎ বোধ করেন, সেখানে একটা বাসা স্থির করিয়া রাখিবেন।"

পরের কয়েকখানি পত্রে বুঝা যায় যে বিজয়কৃষ্ণের প্রাথমিক অভিপ্রায় ছিল কলিকাতা হইতে সঙ্গে করিয়া কিছু ঔষধ লইয়া যাওয়া এবং ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় সে বিষয়ে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত "ঢাকার অবস্থা শুনিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে সাহসী হইলাম না। যদি রোগী পাওয়া যায় তবে অল্প মাত্র ভিজিট লইয়া প্রেসক্রিপসন দিব।" এই পত্রের শেষের অংশটুকু প্রয়োজনীয়। বিজয়কৃষ্ণ লিখিলেন, "আপনি এই পত্রখানি পাইয়াই অনুগ্রহপূর্বক কোন সম্ভ্রান্ত হিতৈষীলোকের নিকট পত্র লিখিবেন যেন আমি উপস্থিত হইলে প্রচার ও চিকিৎসার সুবিধা হইতে পারে। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লিখিবেন যে চিকিৎসা দ্বারা ধনী ও মান্য হওয়া কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নহে, কোনরূপে কষ্টে পরিবার ভরণ-পোষণপূর্বক প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

এরপর কেশবচন্দ্রের পূর্বলিখিত আকাঙ্ক্ষা অনুসারে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে ও বন্ধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। (৩০শে আশ্বিন, ১৮৬৫ অক্টোবর) ভার্যা যোগমায়া ও শশ্রূমাতা মুক্তকেশী দেবীকে কলিকাতায় রাখিয়া গেলেন। ১৭৮৭ শকের (১৮৬৬ মার্চ) চৈত্র সংখ্যায় ধর্মতত্ত্ব এই প্রচার বিবরণী প্রকাশ করে। আমরা মূলতঃ সেই বিবরণী হইতেই এই কয়মাসের খবর দিব। মুখবন্ধরূপে ধর্মতত্ত্ব এইরূপ লিখিয়া ছিল, "কিছুদিন পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নিমিত্ত পূর্বাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন তথায় দুই মাসকাল

অবস্থিতি করিয়া বিগত পৌষ মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় তৎপ্রদেশে প্রায় ছয়মাস ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি (১৮৬৬ মার্চ) এখানে পুনরাগমন করিয়াছেন ; এবং আমরা বহু অনুরোধ সহকারে তাঁহার কার্য্য বিবরণ সাধারণের গোচর করিবার সম্মতিলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছি। গোস্বামী মহাশয়ের মহৎ চরিত্র ও প্রচার কার্য্য বিষয়ে তাঁহার অসামান্য স্বর্গীয় উৎসাহ বোধ হয় পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নাই। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রচারকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে ততই ব্রাহ্মসমাজের মুখোজ্জ্বল হইবে এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইবে। × × তাঁহার স্বকীয় স্বাধীন চেষ্টায় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কিদৃশী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের অপেক্ষা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ উত্তমরূপে অবগত আছেন। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামস্থ নিস্তব্ধ গিরিশিখর অবধি নবদ্বীপস্থ পৌত্তলিকতার দুর্গম দুর্গস্বরূপ চতুষ্পাঠী পর্যন্ত তাঁহার চরণদ্বয় নিরবধি ভ্রমণ করিয়াছে। তিনি বঙ্গদেশের পূর্বসীমা হইতে অকূল বঙ্গোপসাগরের ঘন নীলাম্বুরাশি মধ্যে সূর্য্যের সন্ধ্যাবগাহন দর্শন করিয়াছেন, তিনি শত শত তরঙ্গাস্ফালিত নদনদীর ভ্রূকুটি অতিক্রম করিয়াছেন এবং একখানি ক্ষুদ্র তরণীযোগে বিশাল বক্ষ ভীষণ পদ্মার বিষম আবর্ত্তের সন্নিহিত হইয়াছেন, যে তরণী সংকীর্ণ ভাগীরথীর সামান্য আন্দোলনেও সহজে জলসাৎ হইতে পারে। তিনি অনেক ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার হৃদয়ে স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন।"

উল্লিখিত প্রচার বিবরণীতে বিজয়কৃষ্ণ লিখিতেছেন, "বিগত ৩০শে আশ্বিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমভিব্যাহারে আমি এবং শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১২ই কার্ত্তিক ফরিদপুরে উপস্থিত হই।" ফরিদপুরে কয়েকদিনব্যাপী কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার পর, তাঁহারা ১৯শে কার্ত্তিক ঢাকায় উপস্থিত হন। ঢাকায় পৌঁছিয়া ব্রজসুন্দরকে বিজয়কৃষ্ণ লিখিতেছেন "কিছুতেই অসুবিধা নাই কিন্তু ভৃত্যাভাবে রন্ধন করিতে করিতে দিন দিন অসুস্থ হইতেছি। এই যে ভৃত্য না পাওয়া, ঈশ্বরের সমীপে ইহাও একটী ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে পরিগণিত।" কেশবচন্দ্র প্রায় একমাসকাল ঢাকায় ইংরাজি ও বাংলায় বক্তৃতা করিয়া, ১১ই অগ্রহায়ণ অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। পরে ত্রিপুরার পথে অসুস্থ হইয়া পড়ায় ঢাকা হইয়া পৌষ মাসে কলিকাতায় ফিরেন। বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরবাবুর আরমানিটোলাস্থ গৃহে অবস্থান করিয়া চিকিৎসা ও প্রচার কার্যে রত রহিলেন। ব্রজসুন্দরবাবুকে পত্রযোগে বিজয়কৃষ্ণ ঐ দিনই জানাইলেন, "আমি আপনার প্রকাণ্ড ভবনে একাকী নহি,

যাহার সহিত কোন কালেই বিচ্ছেদ হইবে না সেই চিরজীবন সখাই আমার সঙ্গী।" ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থা দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ বন্ধুদের সঙ্গে ময়মনসিংহ না গিয়া ঢাকাতে অবস্থিতি করাই কর্তব্য মনে করিলেন। ৮ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র-খানিতে এই সম্বন্ধে আরও বিশদ করিয়া জানাইলেন, "এক্ষণ ঢাকাতে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব এত ম্লান হইয়াছে যে কেবলমাত্র নামমাত্র শ্রবণ করিতেছি। এখনও ব্রাহ্মধর্ম এখানকার নিদ্রিত জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। বস্তুতঃ ঢাকাতে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। যাহা হৌক এই অধম পাপীর হৃদয় ঢাকার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছে। ঢাকায় অনিত্য শরীর রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক চিকিৎসক আছেন কিন্তু চিরস্থায়ী আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য কাহারও যত্ন নাই এই ভয়ানক মারী ভয়ে একজন বিকারী চিকিৎসকের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে? বিশেষতঃ আমাকে অর্থের জন্য অনেক সময় ক্ষেপণ করিতে হইতেছে। এইজন্য অনেক সময় বোধ হইতেছে যে অর্থোপার্জন ও ধর্মপ্রচার এক সঙ্গে হওয়া সুকঠিন।" এই পত্রে বিজয়কৃষ্ণের নিরাসক্ত মনটিকে পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, স্বাধীন হইয়া ধর্ম প্রচার করিবার জন্য। অর্থোপার্জন তাঁহার উদ্দেশ্য ত ছিলই না বরং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কার্য আরম্ভ করিয়া, নামমাত্র ভিজিট লইয়াও যখন দেখিলেন চিকিৎসা কার্যেই জড়াইয়া পড়িতেছেন তখন উহা ত্যাগ করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন এই ভাব। ১লা পৌষের চিঠিতে দেখিতে পাই বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার ক্রমবর্ধমান পসার ও অর্থাগমে আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "বোধহয় আমাকে পুনর্বার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে মাসে ৬০ টাকা উপার্জন করিতেছি। এত অধিক স্বীয় উপার্জিত অর্থ আমার নিকট বিষতুল্য বোধ হইতেছে। এক্ষণে একস্থানে বসিয়া প্রাণসম ব্রাহ্মধর্মের দুর্দ্দশা দর্শন করিতে নিতান্তই অক্ষম হইতেছি। ঔষধ আনাইয়াই বিপদ হইয়াছে। এক্ষণে কোন সদুপায় আছে কিনা লিখিয়া শান্ত করিবেন।" বিজয়কৃষ্ণের বৈরাগ্যের ছবি এই কয়টি ছত্রে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপার্জনের বৃদ্ধিতে আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন এই ভাবিয়া যে এভাবে চলিলে তিনি সাধারণ সংসারীর মত অর্থোপার্জনেই আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন, ঈশ্বরের নাম প্রচার যাহা তাঁহার আসল লক্ষ্য তাহা করিবেন কখন এবং কি করিয়া? অর্থোপার্জন ত তাঁহার মূল লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ঈশ্বরান্বেষণ, অর্থোপার্জন দেহ ধারণের উপায় মাত্র। উপায় যদি উপায় মাত্র না থাকিয়া লক্ষ্যের বাধা হইয়া উঠে তবে সে উপায় ত্যাগ করাই বিধেয়। বিজয়কৃষ্ণ ব্যাপারটিকে আর এক দিক হইতে

বিচার করিয়া থাকিবেন। নিজে উপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার করিব, এই সংকল্পের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন অহমিকা রহিয়াছে—বিজয়কৃষ্ণের অতি সূক্ষ্ম আত্ম-বিশ্লেষণে তাহাও যেন ধরা পড়িয়াছিল—স্বেচ্ছায় পরের উপর নির্ভর অন্তরের অমানিত্বের পরিপোষক এবং ঈশ্বরে নির্ভরশীলতারই নামান্তর। বৈরাগ্য কতদূর অকৃত্রিম এবং গভীর হইলে চিন্তাধারা এইরূপ হয়, তাহা প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তী অর্থাৎ ৫ই পৌষের চিঠিতে দেখি বিজয়কৃষ্ণ নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। চিঠিখানি এতে তেজব্যঞ্জক এবং সুন্দর যে সমগ্রটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিতেছেন, "অধমের নিবেদন, আমি ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্যবসা আমার কার্য্য নহে। আমি পুনর্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। বোধ হয় অল্প দিন মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্য থাকিবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আমায় সাহায্য করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমাকে অনেকে অব্যবস্থিত চিত্ত বলিতেছেন ও বলিবেন; অন্তর্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মধর্মের জয় হউক, আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক।" এই যে ত্যাগ ইহা অক্ষমের ত্যাগ নহে, বীরের ত্যাগ। আঙুর পাইলাম না, তাই টক বলিয়া অন্বেষণ পরিত্যাগ করিলাম, —ইহা অক্ষমের ত্যাগ। ইহাকে escapism বা পলায়ন বৃত্তি বলা যায়। আঙুর আমার মুঠার মধ্যে কিন্তু আঙুরে আমার লোভ নাই, তাই পরিত্যাগ করিলাম, ইহা বীরের ত্যাগ, সত্যকার বৈরাগ্য। বিজয়কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই অর্থোপার্জন করিতে পারিতেন, সাধারণের অপেক্ষা বেশীই। ইহা অনুমান নহে—আমরা দেখিলাম যে ইহা প্রমাণিত সত্য। একমাসের মধ্যেই যে ডাক্তারের আয় মাসিক ৬০৲ টাকায় উঠে, তিনি ইচ্ছা করিলে সংসারে বিত্তশালী হইতে পারিতেন, তাহা নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু আজন্ম সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণের ভাবনা অন্যরূপ, তিনি গীতায় পুরুষোত্তমের যোগক্ষেম বহন করিবার অঙ্গীকারে দৃঢ়-প্রত্যয় হইয়া ঈশ্বরের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিলেন, সম্পূর্ণরূপে আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া। বিজয়কৃষ্ণকে যাঁহারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই মূল সত্যটিকে ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার কার্য বিবরণীতেও তিনি লিখিয়াছেন, "চিকিৎসা ও প্রচার একসঙ্গে অবলম্বন করাতে প্রচার বিষয়ে সময়ের অনটন হইতে লাগিল, এজন্য আমি চিকিৎসা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম।"

তিনি ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র প্রচারকার্যে গমন করিবার স্বাধীনতা পাইলেন

১২ই পৌষ, অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর তিনি ঢাকা ছাড়িয়া, তিন দিন পর বরিশালে উপস্থিত হইলেন। বরিশালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, স্বনামখ্যাত দুর্গামোহন দাসের বাড়িতে থাকিয়া তিনি প্রচার কার্য নির্বাহ করিতে থাকেন। সেখানে বার তের দিন বক্তৃতাদির পর তিনি নোয়াখালি যান, নোয়াখালি হইতে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া ১৪ই ফাল্গুন তারিখে পুনবায় বরিশালে ফিরিয়া আসেন। বিজয়কৃষ্ণের চেষ্টায় এবং দাস মহাশয়েব সাহায্যে এই সময় কয়েকটি পতিতা নারীব এবং কয়েকটি বিধবা মহিলার বিবাহ হয়। বিজয়কৃষ্ণের এই সময়ের কার্যকলাপকে বুঝিতে হইলে একটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখিতে হইবে। বহুদিন ধরিয়া প্রথা ও অনুশাসন চালিত বঙ্গসমাজ, যুক্তিবাদী শিক্ষার আলোকে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটা দুর্বার স্বাধীনতা কামনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্বাধীনতা-কামনাকে সংযম ও নীতির নিয়ন্ত্রিত খাতে তিনিই চালিত করিবার উপযুক্ত নেতা, যিনি নিজে সকল প্রথা ও অনুশাসন মুক্ত, যুক্তিবাদী, স্বাধীন, কিন্তু সংযমী, নীতিমান, ঈশ্বর বিশ্বাসী। এই বিচারে বিজয়কৃষ্ণই সেই সময়ের যেন শ্রেষ্ঠ নেতা; তাঁহার ন্যায় সংযমী, নীতিমান এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী সকল যুগেই বিরল, কিন্তু তাঁহার এই সকল গুণ সত্ত্বেও যদি তিনি সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত না হইতেন তাহা হইলে সেই সময়ের স্বাধীন চিন্তার আবেগের সহিত একাত্মীয়তার দাবী করিতে পারিতেন না, সুতরাং নেতৃত্বের অধিকারও পাইতেন না। বিজয়কৃষ্ণের এই সময়ের এই অভাবনীয় সংস্কাব-মুক্তি কোন প্রচ্ছন্ন শক্তির নিগূঢ় অভিপ্রায় কিনা বলিতে পারি না, তবে তাঁহার মাধ্যমে যে জাতি একটি ঘোরতর দুর্বিপাকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। বিজয় তথা ব্রাহ্ম-ধর্ম যদি স্বাধীন চিন্তার ধাবাত্মক উত্তাপকে মুক্তি দিয়া, তাকে নীতির খাতে চালিত না করিত, তবে দেশ অনেক বেশী উচ্ছৃঙ্খল ও স্বধর্মচ্যুত হইয়া পড়িত। বিজয়-কৃষ্ণ যে তখন হইতেই যথেষ্ট সজ্ঞানতার সহিত আপনার দায়িত্ব পালন করিতে-ছিলেন তাহা বুঝি প্রচার বিবরণীতে তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকুতে; তিনি লিখিতেছেন, "বরিশালে ৪।৫টি ব্রাহ্ম পরিবার একত্রিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের প্রসাদে ৫।৬ জন ব্রাহ্মিকা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। দুঃখিনী বঙ্গবাসিনী ভগ্নিগণ কারা-মুক্ত হইলে কোন পাষাণ হৃদয় আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে? যাঁরা স্বাধীনতা লাভ করিতেছেন তাঁহাদিগের জানা কর্তব্য যে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অধীন হওয়া অর্থাৎ ধর্মপথে চলাই স্বাধীনতা। স্বীয় ইচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিলে স্বেচ্ছাচারী হওয়া যায়, স্বেচ্ছাচারিতাই অধর্মের প্রসূতি, অতএব কেহ যেন স্বাধীনতা লইতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণ না করেন।" এইখানে

বলিয়া রাখি লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় এই সময় সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং উপবীত ত্যাগ করেন। এই পরিবার আমরণ বিজয়কৃষ্ণকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের কথা আমাদিগকে পরেও অনেকবার বলিতে হইবে।

ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিত চিঠিগুলির বাকী কয়েকখানিতে উপরিউক্ত স্থানসমূহে বিজয়কৃষ্ণের মহা উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কিছু কিছু আভাষ আছে। তাঁহার বক্তৃতায় এত লোক সমাগম হইত যে, "স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেককে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে হইত।" তাঁহার অগ্রসর মতামত এবং সমাজ সংস্কার চেষ্টা যে বহু সংস্কার বিমুখ ব্রাহ্মের ত্রাসের ও ক্রোধের কারণ হইয়াছিল, তাহা বিজয়কৃষ্ণ "ব্রাহ্মধর্মের বর্তমান অবস্থায়" এইরূপ লিখিয়াছেন, "পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মগণ যতই দিন দিন ব্রাহ্মধর্মে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হিন্দুসমাজ ততই তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অনেক ব্রাহ্ম পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। আবার অনেক দুর্বল ব্রাহ্ম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুসমাজের শাসনানুসারে মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সেই সকল দুর্বল ভ্রাতার জন্য নির্জনে কত অশ্রুপাত করিয়াছি তাহা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু তাঁহারা গালি দিয়া পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা পূর্বে আমার নাম শুনিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এখন সেই সকল হৃদয়-বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কঠোররূপে নির্যাতন করিতে লাগিলেন।"

আজকালের পাঠকগণ বিবৃত ভ্রমণের ক্লেশ ও বিপদাশঙ্কা ভাবিতেও পারিবেন না। এই সমস্ত ভ্রমণ হয় পায়ে হাঁটিয়া, নতুবা ক্ষুদ্র নৌকাযোগে করিতে হইয়াছে। রেল বা স্টীমারের সাহায্য তখন এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে, অন্য আধুনিক যানবাহন ত তখন স্বপ্নের অগোচর। উল্লিখিত প্রচার বিবরণীতে বিজয়কৃষ্ণ পথের কষ্ট বা ভয়ের কথা মোটেই লেখেন নাই, তবে বরিশাল হইতে নোয়াখালি যাত্রার বর্ণনায় বিপদ সম্ভাবনার সামান্য ইঙ্গিত আছে মাত্র। তিনি লিখিতেছেন, "২৯শে পৌষ বরিশাল হইতে নোয়াখালি যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে একটি বিস্তৃত নদী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ইহার এক পার হইতে অপর পার দর্শন করা সুকঠিন। হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলে সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অবগত হইলাম এখান হইতে এক ভাটায় সমুদ্রে যাওয়া যায়। মাঝিদের ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তাহারা পুনঃপুনঃ ঈশ্বরের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে সেই ক্ষুদ্র জীর্ণ তরীখানি অল্পে অল্পে পরপারে লইয়া গেল। ইহাদের বিশ্বাস দেখিয়া নিশ্চয় জানা গেল যে সরল বিশ্বাস বিপদকালের অকৃত্রিম বন্ধু।" এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বিজয়কৃষ্ণ সকল

ব্যক্তিগত বিপদাশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করিয়া পরম প্রিয় পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিয়া চলিতেন। চট্টগ্রামের পার্বত্য জঙ্গলাকীর্ণ পথে বহুবার বন্য জন্তুর হস্তে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছে, প্রমত্তা নদী পদ্মার মধ্য-পথে নিমজ্জিত হইয়া জীবনাশঙ্কা হইয়াছে, কিন্তু সে সকল বিপদকে কখনও তিনি প্রাধান্য দেন নাই, এমন কি প্রচার বিবরণীতে উল্লেখ মাত্র করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কুণ্ডাদির বর্ণনা করিয়াছেন, আর মন্তব্য করিয়াছেন, "এই সকল চিত্ত চমৎকারিণী শোভা দর্শন করিতে করিতে আমার নীচ মনও ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে লাগিল।" কিন্তু পথে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর কতবার সম্মুখীন হইয়াছেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। বঙ্ক কর মহাশয়ের গ্রন্থে এই সকল বিপদের কিছু কিছু বিবরণ আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা আর তাহা লিখিলাম না। জীবনধারণোপযোগী আহারের অভাবও কম ভুগিতে হয় নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক, বিজয়কৃষ্ণের অভিন্নহৃদয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, প্রচারার্থে ভ্রমণকালে বিজয়কৃষ্ণ অনেক সময় খাদ্যাভাবে কর্দম ছাঁকিয়া উহা খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমরা সাধু জীবনে অলৌকিকের আভাষ দেখামাত্রই অবিশ্বাসে নাসিকা কুঞ্চন করি, কিন্তু ধর্মের জন্য স্বেচ্ছায় এই অমানুষিক দুর্ভোগ অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনা কি আছে, এবং যে জীবনে ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই জীবনে কিই বা সম্ভব নয়?

এই যে অবিশ্রান্ত ঈশ্বরানুরাগ ইহার মূল জানিতে হইলে, বর্ণিত ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে বিজয়কৃষ্ণ লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। বিজয়-কৃষ্ণ প্রচারব্রতকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এই প্রবন্ধে অতি সুন্দর-ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের আশ্বিনের ধর্মতত্ত্বে বাহির হয়। বঙ্ক কর মহাশয় ইহাকে সামান্য সংক্ষিপ্ত করিয়া আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও আমি ইহার সমগ্রটিই উদ্ধার করিলাম, কারণ অন্যথায় এই মূল্যবান রচনাটি আপন সমগ্রতায় কখনই সাধারণ পাঠকের গোচরে আসিবে না। অথচ ইহাই বিজয়কৃষ্ণের জীবন দর্শন, তাঁহার জীবনব্যাপী প্রয়াসের উৎস-পরিচয়। তিনি লিখিতেছেন, "আমি একজন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক এই শব্দ ব্যবহার করিলে যেন একটু গর্হিত শুনায়। আমি একজন ব্রাহ্মধর্মের অধম প্রচারক। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বলিলেই লোকে স্বভাবতঃ যে সকল মহদ্‌গুণ প্রত্যাশা করিয়া থাকেন আমার হৃদয়ে তাহার অত্যল্পই আছে। একথা বলিলে আপনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে তুমি প্রচারকের নাম ও ব্রত গ্রহণ করিলে কেন? প্রচার কার্য্যে অনুপযুক্ত হইয়া প্রচারক নাম গ্রহণ করাতে

ব্রাহ্ম ধর্মকে কলঙ্কিত করাই কি তোমার উদ্দেশ্য, না তুমি যৌবন সুলভ উষ্ণ মস্তিষ্কতা প্রভাবে অবলম্বিত ব্রতের মহত্ত্ব বিচার না করিয়া কেবল নামের ও গৌরবের জন্য, অথবা হৃদিস্থিত কতকগুলি কাল্পনিক অপ্রকৃত ভাবের চরিতার্থতার জন্য প্রচারক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছ? এপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আপনার অধিকার আছে, আমি বিনীতভাবে স্বীকার করি।

আমি নামের ও গৌরবের জন্য প্রচার ব্রত গ্রহণ করি নাই, ব্রাহ্মধর্মকে কলঙ্কিত করা আমার উদ্দেশ্য আমি ইহাও বলিতে পারি না। স্বকল্পিত অস্বাভাবিক ভাব বহুল পরিমাণে আমার হৃদয়ে থাকিতে পারে এবং সে সকল ভাবকে হয়ত আমি যথার্থ ধর্মভাব বলিয়াও মনে করি। কিন্তু ইহার কিছুরই জন্য আমি প্রচারক নাম অবলম্বন করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটি আশ্চর্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে, ইহা আমার যত্ন সাপেক্ষ নহে, ইহার উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই, আমার ইচ্ছার সঙ্গে প্রায় কোন সম্বন্ধই দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালন করে এবং ভবিষ্যতে ইহা আমাকে কোথায় পরিচালন করিবে আমি বলিতে পারি না। ইহাই আমার প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুমত কার্য সম্পাদনে ইহাই আমাকে সর্বদা উত্তেজিত করে এবং নিজ আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতেও ব্যাকুল করে। ইহার আদেশ এরূপ পরিষ্কার ও বোধগম্য যে আমি কখনই তাহা বিস্মৃত হইতে ও অগ্রাহ্য করিতে পারি না। ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

আমি "বাধ্য" শব্দ ব্যবহার করিলাম, আর কোন শব্দ আমার মনের অনুরূপ ভাবকে প্রকাশ করে না। আমি সর্বদাই মনকে বুঝাই, বলি হৃদয়, তুমি কি জানিতেছ না যে তোমার দুর্বলতা, তোমার অজ্ঞানতা ভয়ানক। কি সাহসে হৃদয়, তুমি প্রচার কার্যের গুরুভার আপনার মস্তকে লইতে সাহসী হইলে, তোমার উচিত যে এখনই তুমি সরলভাবে সাধারণ সমক্ষে প্রচারকের নাম ও কার্য পরিত্যাগ কর, নতুবা লোকের হাস্যাস্পদ হইবে, কপটতা আসিয়া তোমার যথা কিঞ্চিৎ ধর্ম-ভাবকেও বিনষ্ট করিবে, তুমি পরিণামে ঈশ্বরহীন ও লোকহীন হইয়া মহাসঙ্কটে নিপতিত হইবে। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় এক একবার বিলক্ষণ ব্যাকুল হয় এবং কি করিতে হইবে কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু পরক্ষণেই উপরোল্লিখিত শক্তি আমার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং বলে, "তুমি অগ্রসর হও"। ইহাতে এক একবার আমার হৃদয় অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। আমি মনে করি হা! এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন সততই হইয়া থাকি, সর্বদা আমার অন্তরে এ প্রকার অন্ধকার, আমি কোথায় অগ্রসর হইব? কিন্তু আমি সততই এ শক্তির

আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীঘ্রই হউক আর একটু বিলম্বেই হউক তাহা প্রতিপালন করি এবং যখনই প্রতিপালন করিতে সাহসী হই তখনই সফলতা লাভ করি। তখন আমার আত্মাতে আলোক আইসে, বিশুদ্ধতা আইসে, আমার কর্ণে শব্দ আইসে এবং আমার জিহ্বায় সত্য আইসে। আমি যাহা বলি, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। আমি যাহা বলি, যাহা করি তাহাতে আমার অনুমাত্র গৌরব নাই, কারণ আমি নিঃসন্দেহ জানিতে পারি যে ইহা আমার শক্তি হইতে নহে। যদি আমার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে লোকের নিকট এরূপ হাস্যাস্পদ ও বিফল হই যে তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারি না। কার্য্যের সময় আপনার উপর নিভর করিতে হইবে ইহা মনে হইলে যথার্থ বলিতেছি, আমার শরীর কম্পিত হয়।

আমি মূঢ়তা এবং স্বভাবগত দুর্বৃত্ততা হেতু অনেক সময় গর্বিত হই বটে, ঈশ্বরের কার্যকে আমার কার্য, তাঁহার গৌরবকে আমার গৌরব বলিতে যাই, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি কাহার শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছি, এবং তাহার প্রশংসাভাগী কে। আমি অন্যের নিকট আপনার ভাব ও কথা গোপন করিতে পারি ও করি, কিন্তু নিজের নিকট আর কি গোপন করিব? আমি নিশ্চয় জানিতেছি আমার দ্বারা কোন মহৎকার্য সম্ভবে না এবং কোন কার্যের গৌরবেই আমার অধিকার নাই।

সে যাহা হৌক, এই প্রকার একটি ঈশ্বর প্রেরিত শক্তিই আমার প্রচারক নাম গ্রহণ করিবার কারণ। আমি জানি আমার জীবনে বহু বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, আমি নিশ্চয় জানি সংসার সহস্র প্রকারে আমার নিরুৎসাহের উপায় প্রস্তুত করিতেছে। এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়া আমি বারম্বার হতাশ হইয়া পড়ি, কিন্তু তত্রাপি হৃদিস্থিত শক্তি বলিতে থাকে, "তুমি অগ্রসর হও!" পাপ পুণ্যে, সুখ অসুখে, সম্পদে দারিদ্র্যে আমি ঐ অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তখন ইহা আমাকে বলে, তুমি এমত সুন্দর জগতের একস্থানে বসিয়া কি করিবে? এই উজ্জ্বল আকাশ যতদুর বিস্তৃত, ততদুর তোমার কীর্ত্তি বিস্তৃত কর, ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর, লোকের মনস্তাপ দুর কর, "অগ্রসর হও"। শীঘ্র গৃহ পরিত্যাগ কর, ঈশ্বরের কার্যে গমন কর, বিলম্বে কোন প্রয়োজন নাই। যখন সুমন্দ সুমিষ্ট মারুৎ আমার তাবৎ শরীরকে সুখী করে তখন ইহা বলে তুমি কি সুখে গৃহে বসিয়া আছ, এই অনিল হিল্লোল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইবে বিবেচনা কর এবং তুমিও সেইরূপ সর্বস্থানে ভ্রমণ কর। ইহার রমণীয়তা যেরূপ দেশভেদে কালভেদে অসমান নহে, তোমার অনুরাগ ও তোমার চেষ্টা সেইরূপ মধুবাহিনী হইবে, "অগ্রসর হও"।

অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠে এবং যেখানে তাঁহার কার্য্য সেইখানেই যাইতে ব্যস্ত হয়। "অগ্রসর হও"—উক্ত শক্তির এই আদেশ শুনিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, ভয়ে দুঃখে, বিশ্বাসে, বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। আমি কোন ক্রমেই ঐ আদেশ না শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, ইহা আমার গৌরব নহে, কিন্তু মনের কথা এবং কেনই যে একথা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না তাহা আমি বুঝতে পারি না। আমার সকল অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্ত্তী হইয়াছি, এবং সকল অবস্থাতেই হইব। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া আমার আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি। অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও নিরাশা ইহারই জন্য আমাকে গতাসু করিতে পারে না, নতুবা আমি যেরূপ অসদ্বৃত্তি সম্পন্ন, এতদিনে আমার আত্মার সর্বনাশ হইত। আমার বিশ্বাস এই শক্তির আদেশ—ঈশ্বরের বাক্য, ইহা প্রচারকের জীবন, ইহাই ভয় বিপদের সম্বল,—নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহা ব্যতীত আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমূর্ষু অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া যাই। যে কার্য আমি অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে যদি কিছুমাত্র সফলতার আশা থাকে তবে ইহাই সেই আশা, আমি আশান্তর দেখি না। গল্পে শুনিয়াছি পূর্বকালে ইহুদিরা মিশর হইতে স্বদেশে গমনের সময়ে ঘোর অরণ্য মধ্যে এক জ্যোতিঃস্তম্ভ দেখিয়া নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে সেই ভয়াকীর্ণ বন অতিক্রম করত তীর্থস্থানে গিয়া উপনীত হইয়াছিল, আমার মনে হয় যে আমিও সেইরূপ তাঁহার এই জ্যোতির্ময় অখণ্ড শক্তির ইঙ্গিতে এই ভয়ানক পৃথিবী-অরণ্যে নিস্তার পাইব, আপনার দুর্বলতা সত্বে তাঁহার কার্য সাধন করিতে সক্ষম হইব, এবং যে তীর্থস্থান গমন করিবার আমার এত আশা, যেখানকার কথা শুনিলে আমার নয়নবারি বিস্ফুরিত হয় এবং যেখানে যাইবার জন্য সততই আমার দুর্বল চরণ ব্যস্ত হইয়াছে, পরিণামে নির্বিঘ্নে আমি সেই প্রাণসম প্রিয় তীর্থস্থানে উপনীত হইতে পারিব। পরমেশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করুন। কি কারণে আমি প্রচারক হইয়াছি, এবং কেনই যে আমি অদ্যাবধি প্রচারক নাম ধারণ করিতেছি তাহাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।"

প্রবন্ধটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহার আন্তরিকতায় ও সত্যতায় আবিষ্ট না হইয়াই পারা যায় না। চব্বিশ বৎসরের এক যুবক কেবল মাত্র কথার জাল বুনিয়াছেন, এইরূপ মনে করিতে বিজয়কৃষ্ণ প্রবন্ধেই আমাদের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বে এবং পরে তাঁহার কার্য কলাপও প্রবন্ধে বর্ণিত মনোভাবের সত্যতার অকাট্য সাক্ষ্য দেয়। বস্তুত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পরই যেন প্রচার কার্যে তাঁর অম্লানমুখী উৎসাহ এবং সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন বিপদের প্রতি অনন্যসাধারণ নিরুদ্বিগ্নতার মূল কোথায় বুঝিতে পারি। এক অদৃশ্য

শক্তি যে তাঁহাকে কোন গূঢ় জাতীয় অভিপ্রায় সাধনের জন্য (বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের কথাই উঠিতে পারে না) নানা পরিবর্তন এবং নানা অবস্থা সঙ্কটের মধ্য দিয়া দুর্নিবার্যরূপে চালিত করিতেছে, এই বিশ্বাস এই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই তাঁহার কত দৃঢ় ছিল তাহা এই প্রবন্ধটি হইতেই বুঝা যায়। বিজয়কৃষ্ণের সমগ্র জীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে এই নিগূঢ় জাতীয় অভিপ্রায়টির সশ্রদ্ধ অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার সময় অবশ্য পরে আসিবে, এখন তাঁহার জীবন অনুসরণ করা যাউক।

আট

কলিকাতায় ফিরিয়া (২৪শে মার্চ ১৮৬৬) বিজয়কৃষ্ণ আর্থিক অনটনের পরাকাষ্ঠার মধ্যে পড়েন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত যে ক্ষীণ যোগসূত্র এতদিন ছিল, তাহাও কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে ছিন্ন হইতে চলিল। ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জীবনীতে প্রকাশিত বিজয়কৃষ্ণ লিখিত পত্রগুলির শেষখানির তারিখ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল। পত্রখানি বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা হইতে লিখেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত কেশব ও তাঁহার অনুগামীদিগের বিরোধ যে তখন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এই চিঠিখানিতে তাহার আভাষ রহিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ লিখিতেছেন, "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আর বিদ্বেষানল প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, যাহাতে প্রচার কার্য্যালয় বিলুপ্ত হয় ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় সংকল্প। যাহাতে কেশববাবুর প্রতি সাধারণের ঘৃণা হয় সেই জন্য তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইতেছে।"* অপেক্ষাকৃত সঙ্গতি-সম্পন্ন কলিকাতা সমাজের প্রতিকূলতা এবং আর্থিক অনটনের মধ্যেও বিজয়কৃষ্ণের উৎসাহের এতটুকু কমতি নাই। বঙ্ক কর মহাশয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিত অতিরিক্ত যে একখানি চিঠি আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখি বিজয়কৃষ্ণ ডাকটিকিট ক্রয়েও অসমর্থ। তিনি লিখিতেছেন, "পয়সার অনটন বশতঃ আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। এবার বেয়ারিং লিখিতে হইল। আমার স্ত্রীর শরীর অসুস্থ আছে। রীতিমত ঔষধপত্র দিলে সুস্থ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মধর্মের মঙ্গলের জন্য এইরূপে শরীর নাশও ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কেবল আমার নহে। প্রত্যেক প্রচারক পরিবারেরই এইরূপ দুর্দশা। মরুক সকলে

* কেশব সেন মহাশয়ের খৃষ্ট বিষয়ক বক্তৃতা এই সময়েই প্রদত্ত হয়—তাঁহার Great Men প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে—লেখক।

শুষ্ক কণ্ঠায়, অনাহারে রোগ-বিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রাণত্যাগ করুক; তবু যেন কেহ ব্রাহ্মধর্মের জয় ঘোষণা করিতে বিরত না হন। এই আমার আন্তরিক বাসনা।" (১৯ মে, ১৮৬৬) এই সময়েরই অন্য এক পত্রে তিনি ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "অনাথ-নাথ ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধু বান্ধবই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কোন দিন শরীরও ত্যাগ করিবে; ঈশ্বরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হউক, যিনি দুঃখীদিগের বন্ধু।" শুধু আপনি নন, নবাগত অন্যান্য প্রচারকগণের মধ্যেও আপনার ঈশ্বর নির্ভরতা এবং আদর্শে দৃঢ়তা সংক্রামিত করার দায়িত্বও তাঁহার। তিনি তাঁহার "ব্রাহ্মধর্মের বর্তমান অবস্থায়" এই সকল ধর্মবন্ধুদের প্রশস্তি গাহিয়াছেন এইরূপে, "প্রচার বিভাগ পৃথকরূপে সংস্থাপিত হইলে কতিপয় ব্রাহ্ম-ভ্রাতা বিষয়কর্মের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক সুখ-দুঃখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, অভয়দাতা ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হইয়া প্রচারকের অনন্ত ব্রত গ্রহণ করিলেন। যে ব্রত অবলম্বন করিলে প্রাণান্তেও আর পরিত্যাগ করা যায় না, এই দেবপ্রকৃতি মহাত্মাগণ সেই প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতে লাগিলেন।"* এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ প্রচার আশ্রমের একটি প্রকোষ্ঠে সস্ত্রীক বাস করিতেন এবং একরূপ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার উপজীবিকার অর্থ সংগৃহীত হইত। বঙ্ক কর মহাশয় লিখিয়াছেন, ধর্মোৎসাহ তাঁহাকে সকলপ্রকার পার্থিব চিন্তা হইতে নির্মুক্ত রাখিয়াছিল। তাঁহার ধর্মভাব দর্শনে অনেকের উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ক্রমে আরও কতিপয় ব্যক্তি চাকুরী ছাড়িয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এক সময়ে তাঁহার কয়েকটি বন্ধুতে মিলিয়া রাধানাথ মল্লিকের গলির ভিতর একটি বাসাতে বাস করিতেন। এই বাসাটী ব্রাহ্মদিগের মধ্যবিন্দু ছিল। কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন জুটিত না; আহার কোনরূপে জুটিলেও, ব্যঞ্জন বলিতে অধিকাংশ দিনই মাত্র কাঁটানটে শাক বা সামান্য তেঁতুলগোলা। তাঁহার এই এই দারিদ্র্যবরণ যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, তখন এই সকল কষ্টকে যে তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। অভুক্তাবস্থাতেই তিনি একান্ত অনুদ্বিগ্ন মনে অনন্য উৎসাহে আপনার দৈনন্দিন ধর্মসাধন, ধর্মপ্রচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, প্রচারপত্রাদির জন্য প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি ব্যাপারে মগ্ন থাকিতেন।

* ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে সাত জন প্রচারকের মধ্যে কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ছিলেন উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্র বসু, অন্নদা চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্তী ও অঘোরনাথ গুপ্ত।—লেখক।

পত্নী যোগমায়া এবং শাশুড়ি মুক্তকেশী দেবীও সানন্দে তাঁহার সহিত উপবাস করিয়া চলিতেন।

অবশেষে প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে মতভেদ যখন চরমে উঠিল তখন নবীন দল কলিকাতা সমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর)। ঐ দিনের অধিষ্ঠিত সভায় বিজয়কৃষ্ণ প্রস্তাব করেন, যে সকল নরনারী ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করিবেন তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। প্রস্তাব গৃহীত হয় ; ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের ভার অবশ্যম্ভাবী রূপে বিজয়কৃষ্ণের উপরই পড়িল।

ইহার অব্যবহিত পরেই বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় ফিরিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য নূতন উৎসাহে চালাইতে লাগিলেন। অনেক কৃতবিদ্য যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং যথারীতি উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত এবং সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত হইতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণ নিজেও পার্থিব সুখের কাঙাল ছিলেন না, অনুগামীদিগকেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্গীকার দিতে অপারগ ছিলেন। যীশুখৃষ্টের ন্যায়ই যেন তাঁহার অঙ্গীকার, "He that findeth his life shall lose it and he that loseth his life for my sake shall find it—জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে যিনি কাম্য বলিয়া বরণ করিবেন, তিনিই সত্যকার জীবন হইতে বঞ্চিত হইবেন, যিনি স্বাচ্ছন্দ্যকে ঈশ্বরের জন্য পদদলিত করিতে পারিবেন, তিনিই সত্যকার জীবন লাভ করিবেন। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ধর্মকে অনুসরণ কর, এই ছিল বিজয়কৃষ্ণের মূলমন্ত্র, এবং তাঁহার আহ্বান এমনই প্রেরণা-স্পৃষ্ট ছিল যে বহু ব্যক্তিই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ঢাকায় অবস্থান কালেই তিনি ময়মনসিংহ গমন করেন। সুখের বিষয় যে শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় তাঁহার "ব্রাহ্ম-সমাজে চল্লিশ বৎসর" গ্রন্থে এই ভ্রমণের প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়াছেন ; সমসাময়িক ঘটনার অপক্ষপাত বিবরণ হিসাবে ইহার মূল্য সমধিক। তিনি লিখিতেছেন, "১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র এখানে ব্রাহ্মধর্মের যে অগ্নি প্রধূমিত রাখিয়া যান, ১৮৬৭ সালের প্রথম ভাগে মহাতেজস্বী প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ এখানে আসিয়া সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় যেন অগ্নিবৃষ্টি হইত। উহাতে মৃত জীবনে নব চেতনার সঞ্চার হইত। স্থানীয় বিজ্ঞাপনী নামক সংবাদপত্রে তাঁহার প্রচার কার্য্যের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তিনি নগরের নানা স্থানে, ৩০শে মাঘ "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ", ৫ই ফাল্গুন "উপাসনা", ৭ই "মুক্তি" ১১ই "পবিত্রতা", ১৪ই "সংসার", ১৮ই "পৌত্তলিকতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতার শ্রুতিসুখ

উৎপাদন করিয়াই বিরত হইত না, হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিত। সত্যসত্যই বিজয়কৃষ্ণের বিজয়ভেরীতে নগর কম্পিত হইতে লাগিল।" বহু লোকের উপবীত পরিত্যাগ, তাঁহার সহিত আহার, হিন্দুসমাজে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ও নির্যাতনে অনেকের আবার উপবীত পুনঃগ্রহণ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া চন্দ মহাশয় ময়মনসিংহের তৎকালীন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশ সেন মহাশয়ের স্বকীয় বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন। সেন মহাশয় লিখিতেছেন, "মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমার ন্যায় পতিত সন্তানকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে ময়মনসিংহ প্রেরণ করেন। তখন আমি তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া জীবন্ত ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া নিজের পাপ ও অভাব অনেক বুঝিতে পারিলাম ও তাহা মোচন করিয়া আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিতে যত্নবান হইলাম।" এইবারের ময়মনসিংহে প্রচারের উল্লেখ আছে ডেপুটি পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ের From Hinduism to Hinduism গ্রন্থে। আলোচ্য সময়ে তিনি ময়মনসিংহে শিক্ষাকার্যে রত ছিলেন এবং আর আর বহু যুবকের ন্যায় তিনি বিজয়কৃষ্ণের তেজস্বিনী বক্তৃতায় ও পৈতা ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া নিজেও পৈতা ত্যাগ করিয়া (তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন) ইতর জাতির সহিত আহার করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য কাজেই National Libraryতে রক্ষিত কপি হইতে প্রয়োজনীয় খানিক অংশ তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিতেছেন, "One of the missionaries Pandit Bijay Krisna Goswami happened to visit in 1867 the town of Mymensingh where I was a school master. When Bijay Krisna Goswami who lost his caste by throwing his paita or sacred thread and dined with others of low caste, came to visit Mymensingh in the course of his missionary tours, I felt that I could no longer observe the caste rule and refuse to dine with them." পরে অবশ্য রায় মহাশয় অন্যান্য কয়েকজনের সহিত সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং আরও পরে হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাইয়া পালহীন নৌকার মত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বিজয়কৃষ্ণেরই ইঙ্গিতে পুনরায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। সে কথা আমাদের পরে উল্লেখ করিতে হইবে।

মনে হয় ময়মনসিংহ হইতে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ফিরিয়া তারপর সপরিবারে বরিশাল গমন করেন। সঙ্গে এবার অঘোরনাথ ও যদুনাথ চক্রবর্তী ছিলেন

যথারীতি তাঁহারা দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া প্রচারকার্য চালাইতেন। দাস মহাশয় আপন গৃহের প্রাঙ্গণে প্রচারক মহাশয়দিগের জন্য কয়েকটি কুটির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সস্ত্রীক তিনি ইহাদিগকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন, এবং নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিমত, বাটীর ভৃত্যগণ ইহাঁদিগকে বাবুর গুরুঠাকুর মনে করিয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া ইহাদের পরিচর্য্যা করিত। এখানে প্রচারকগণ ফাল্গুনের মধ্যেই পৌছাইয়া থাকিবেন নতুবা বঙ্ক কর মহাশয় লিখিত নিম্নলিখিত ঘটনাটির সামঞ্জস্য থাকে না। কর মহাশয় লিখিতেছেন, এই সময় একদিন দুর্গামোহন বাবু বিজয়কৃষ্ণকে একখানি উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় পথের একটি দুঃখী লোককে শীতে কাতর দেখিয়া তাহাকে ঐ বস্ত্র দান করেন। দাস মহাশয় আর একখানি কিনিয়া দিলেন। দ্বিতীয়খানিও ঐরূপে বিতরিত হইল। তখন দাস মহাশয় একখানি মোটা কাপড় কিনিয়া দিলেন। চৈত্র মাসের বেশী ভিতরে আর শীতবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

এই সময় বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া বিজয়কৃষ্ণ আমদিয়া, পাঁচদোনা, কালিকচ্ছ প্রভৃতি স্থানে যান। এই সময়েই কালিকচ্ছের (ত্রিপুরা) বিখ্যাত আনন্দ নন্দী মহাশয় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বরিশাল হইতে বিজয়কৃষ্ণ চৈত্র মাসের মধ্যেই কলিকাতা ফিরিয়া থাকিবেন। এই ধারণা করার কারণ শীঘ্রই প্রকাশ পাইবে। কলিকাতা ফিরিয়া বিজয়কৃষ্ণ দেখিলেন কলিকাতায় ব্রাহ্মদিগের দুই দলের মধ্যে মত ও অনুষ্ঠান লইয়া আন্দোলন তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতাগুলিতে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের আভাস পাইয়া যে বাদানুবাদের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা ক্রমেই বেগ সঞ্চয় করিতে থাকে। "ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থায়" বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতকর্ম, নামকরণ, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মধর্ম মতে এই সকল কার্য যতই হইতে লাগিল, ততই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। দুর্বল ব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার মধ্যে কেশববাবু 'যিশুখৃষ্ট—ইউরোপ ও আসিয়া' (১৯৬৬ May.) এবং 'গ্রেটম্যান' (১৮৬৬ September) এই দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতাদ্বয়ের গূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেশববাবুকে খৃষ্টান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অসদ্ভাব এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া কেশববাবু খৃষ্টান হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতে

লাগিলেন।” আজ কালের পাঠকগণের পক্ষে এই বিতণ্ডার তাপ পরিমাপ করা দুরূহ, তবে বিজয়কৃষ্ণের মন্তব্য, “যদি ইংরাজ রাজ্যের প্রবল শাসন না থাকিত তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেবল গালি দিয়া যে নিরস্ত হইতেন এরূপ বোধ হয় না,”—অবস্থার বিশেষ গুরুত্বকে সূচিত করে। ধর্মের নামে এই সকল অবান্তর বিষয় লইয়া ঝগড়া দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের শান্তিকামী মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। আমরা বিজয় জীবনে বারংবার দেখিয়াছি যে জীবনের সেই সব সন্ধিক্ষণে যখন সম্মুখের পথ সমধিক কুয়াশাচ্ছন্ন ও অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তিনি নগরের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া শান্ত পরিবেশে নূতন আলোকের সন্ধান করিয়াছেন। শান্তির খোঁজে এবার তিনি শান্তিপুর গমন করিলেন (১৮৬৭ মার্চ এপ্রিল) এবং বসন্তকালে শান্তিপুরের গঙ্গার চড়ার হৃদয়গ্রাহিণী শোভা দেখিয়া তাঁহার অন্তরের অশান্তি যেন তুলনায় আরও বেশী মনে হইল। শান্তিপুরে যে তিনি বসন্তকালে উপস্থিত ছিলেন তাহা তিনি নিজে ‘ব্রাহ্মধর্মের বর্ত্তমান অবস্থায়’ লিখিয়াছেন। চৈত্র শেষ হইয়া গেলে আর বসন্তকাল আছে বলা যায় না। তাই বরিশাল হইতে চৈত্র মাসেই প্রত্যাবর্তন অনুমান করিয়াছি। তিনি শান্তিপুর নিবাসী বিখ্যাত বৈষ্ণব হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়কে আপনার দুর্দশার কথা বলিলে তিনি বিজয়কৃষ্ণকে ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থ পাঠ করিতে বলেন। চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকট যেন একটি নূতন দুয়ার খুলিয়া গেল। চৈতন্যদেবের জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মাধ্যমে, “জীবে দয়া নামে ভক্তি” এই তত্ত্ব তাঁহার মনে গভীর অঙ্কপাত করিল। প্রামাণিক মহাশয়ের সহিত তিনি কালনায় গিয়া ভগবান দাস বাবাজীকে দর্শন করিতে গেলেন। বাবাজীর আশ্রমে ৺নাম ব্রহ্মের পূজা সন্দর্শন করায় অঙ্কপাত গাঢ়তর হইল। পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিই যে এই ভগবান দাস বাবাজীর নিকট পরমহংসদেবও একবার গিয়াছিলেন ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে। সে যাহা হৌক, এখান হইতে বিজয়কৃষ্ণ চৈতন্য দাস বাবাজীর নিকট গিয়া ভক্তিলাভের উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী বিজয়কৃষ্ণে কি দেখিলেন তিনিই জানেন, তিনি তেজের সহিত বলিলেন, সে কি প্রভু! তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছ? ভক্তির ভাণ্ডারী হইয়া তুমি আমার মত জীবাধমের নিকট ভক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তোমার ললাটে তিলক, মস্তকে জটাভার ও গলদেশে মালা সন্দর্শন করিতেছি। পরে ভাবাবেশ কমিলে উপদেশ দিলেন, “যদি প্রেম ভক্তি লাভ করিতে চাও তবে দীন হীন অকিঞ্চন হও। অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকিলেও ভক্তিলাভ হইবে না। জলস্রোত যেমন ঊর্দ্ধগামী হয় না, ভক্তিও তদ্রূপ অহঙ্কৃত মনে উদিত হয় না।”

বিজয়কৃষ্ণের শান্তিপুর আগমন ব্যর্থ হইল না,—তিনি ঈশ্বরের কৃপাশ্রয়ী একান্ত নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তির সন্ধান পাইলেন।

এই ঘটনাগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম যৌবনেই বাংলাদেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় হিসাবে গণ্য হইলেও বিজয়কৃষ্ণ আপনার প্রস্তুতি সম্বন্ধে কখনই এতটুকু অবহেলা করেন নাই। সমসাময়িক ভারতের যাবতীয় ধর্মভাব-ধারার শ্রেষ্ঠাংশটুকু আহরণ করিয়া একটা বিরাট সমন্বয়ের চেষ্টা বিজয় জীবনের গোড়া হইতেই লক্ষিত হয়। মার্কিন মনীষী এমারসন লিখিয়াছিলেন যে এমন কোন দিক-নির্ণয় যন্ত্র যদি পাওয়া যায়, যার দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তানায়কদিগের নিকট উপস্থিত হওয়া সুকর হইবে, তবে তিনি স্পর্শমণি ফেলিয়া তাহাই আনন্দে বাছিয়া লইবেন। ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতেছেন এমন সকল ব্যক্তির সংসর্গ বিজয়কৃষ্ণের নিকটও পরম আকর্ষণের বস্তু ছিল এবং তাঁহা জীবনে তিনি অগণিত সাধু মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং একান্ত উদার সার্বভৌমিক ধর্মের উদ্গাতা যে বিজয়কৃষ্ণকে আমরা জানি তাঁহার সৃজনে কোন্ মহাত্মার কতখানি প্রভাব ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে সম্প্রতি বর্ণিত ঘটনাগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে এই সময় হইতেই বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তি আপনাকে জানান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ভক্তিবাদ কেশব সেন মহাশয়ের ভক্তিবাদের সগোত্র হইলেও বিভিন্ন; কেশবের ভক্তির মূল উৎস খৃষ্টীয় ধর্ম, সুতরাং এ দেশে সহজে গ্রাহ্য নহে। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের ভক্তির মূলে ছিল আমাদের একান্ত আপনার বস্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ। সে যাহা হৌক, বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি এবং নাম মাহাত্ম্য ব্রাহ্মধর্মে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন।* তাঁহার অগ্রজ ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয় এবং পরে বিখ্যাত কীর্তনীয়া মনোহর দাস বাবাজী দ্বারা কীর্তন গাওয়াইয়া তিনি কেশবচন্দ্র প্রমুখ সকল ব্রাহ্মবন্ধুকে মোহিত করেন, এবং সেই হইতেই ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন প্রচলিত হইয়া গেল (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বা ২৭শে আশ্বিন ১২৭২)। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসে ইহার ইঙ্গিত মাত্র আছে। বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ এবং সংকীর্তন প্রবর্তন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "Keshab begin to reflect on the nature and

* তিনি ২০শে অক্টোবর ১৮৬৭ কলিকাতায় এক সভায় উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভারতব্যাপী বিস্তারের জন্য পথের ইঙ্গিত দিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার পূর্বে ২ই অক্টোবরও তিনি কলিকাতায় ছিলেন।—লেখক।

tendencies of vaisnav mode of spiritual exercise. The suggestion might have come from Bijay Gaswami that Sankirtan might form an effective means of propagating Bramhoism. There was Bijay Goswami near at hand to render aid in making that experiment. অর্থাৎ প্রস্তাবও বিজয়কৃষ্ণের, রূপদানও বিজয়কৃষ্ণের। বিজয়কৃষ্ণ নিজেই 'পাপে মলিন মোরা চল ভাই, পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়া লুটাইবে' এবং 'পতিত পাবন ভকত জীবন অখিল তারণ বলরে সবাই' এই দুইটি বিখ্যাত ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়া সংকীর্তনের সূচনা করেন। কেশব চরিত রচয়িতা গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবতঃ বৈষ্ণব ভাব, তিনি তৎকালীন সংকীর্ত্তনের প্রধান সহায় হইলেন এবং দুইটী সংকীর্ত্তন গীত প্রস্তুত করিয়া গান করিলেন।" উহারই দেড় মাস পরে ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় মহাউৎসাহে কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে রচিত এক সঙ্গীতে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মে এই ভক্তিবাদের প্রবর্তনাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী।"

নয়

ব্রাহ্মসমাজের কীর্তন প্রচলন যে সকলেই প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহা নহে। এ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" পুস্তিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মোৎসবের পর সংকীর্ত্তনে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। কলিকাতায় যেমন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তদ্রূপ অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পরিশেষে পূর্ববাঙ্গলায় ঢাকা নগরে বিশেষরূপে কীর্ত্তনের উন্নতি হইল। সঙ্গতের ব্রাহ্মভ্রাতাগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পূর্ব বাঙ্গলার, বিশেষতঃ বরিশালের ও ঢাকার সভ্যতাভিমানী কৃতবিদ্যম্মন্য ব্রাহ্মগণ কীর্ত্তনকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক কীর্ত্তন অনুমোদন করেন না, অতএব কীর্ত্তন ভাল নহে, অনেকের মুখে এইরূপ যুক্তি শ্রবণ করিয়াছি। ঢাকার দু' একজন প্রাচীন ব্রাহ্ম কীর্ত্তনে দেবেন্দ্রবাবুর মত নাই বলিয়া কীর্তনে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন।" সে যাহা হোক, মুখ্যতঃ বিজয়কৃষ্ণেরই চেষ্টায় কীর্তন চলিয়া গেল এবং চৈতন্যের ভক্তিভাবও যেন কিছুটা প্রবেশ করিল। মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন প্রচলিত করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ যে অদ্ভূত চেষ্টা করেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে আমরা শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের "ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর" গ্রন্থে কিছুটা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাই। তিনি লিখিতেছেন,

১৮৬৯ সালের শীতঋতুতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পুনরায় এখানে আগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দূরে থাকিয়া ধর্মতত্ত্বে সে বিবরণ পাঠ করিতাম। আমাদেরও সংকীর্তন করিতে সাধ হইত। গোস্বামী মহাশয়ের মুখে সংকীর্তন শুনিয়া আমাদের অনেকের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। আমরা তাঁহার নিকট সংকীর্তন শিক্ষা করিলাম। × × × শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে এই গানের সুরে 'অখিল তারণ বলে একবার ডাক তাঁরে'—এই কীর্তন রচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয় গাইলেন। আমরা আমাদের চিরপরিচিত সুরে ব্রহ্মসংকীর্তন করিয়া বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিতাম। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বৈষ্ণবদের ন্যায় খোল করতাল বাজাইয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিয়াছে, এ সংবাদে সহরে খুব আন্দোলন উপস্থিত হইল, লোকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ প্রশংসাও করিল। সমাজ ঘরে আর লোক ধরিত না। বস্তুতঃ তখন বিজয়কৃষ্ণের অগ্নিময়ী বক্তৃতা, সুমধুর উপাসনা ও ভক্তিরসপূর্ণ সংকীর্তনে এই নগর যেন টলমল করিতেছিল।"

"কিশোরীমোহন বক্সী নামে একজন মোক্তার ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলী এবং সংকীর্ত্তন প্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তিনি খোল বাজাইতেন। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গগুণে ইঁহার চিত্তে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইয়াছিল, ভাবোচ্ছ্বাসে ক্রন্দন করিতেন। ইঁহার মুখে একটি প্রাচীন সংকীর্তন শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় একটী ব্যাকুলভাবের নূতন সংকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন। আমরা বহু বৎসর সেই কীর্তনটি গাহিয়াছিলাম। এই কীর্তনটি সঙ্গীত পুস্তকে উঠে নাই বলিয়া অন্যত্র প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু উহা তৎকালের বিশেষ ভাব প্রকাশক বলিয়া এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম,—

কীর্তন

সকল শূন্যময় হেরি, না হেরিয়ে বিভু নয়নে।
আমার হৃদয় শুখায়ে গেল হে (এ)
শুনেছি সাধু সদনে, চায় যে তাঁরে
তাঁহারে দেখিতে পায় নিজ অন্তরে;
আমি ডাকিতে পারি না মোহে, পাইব কেমনে॥
পড়েছি অগাধ কূপে না দেখি উপায়
বিনা সেই করুণা সিন্ধু প্রভু দয়াময়;
তাঁর নামের গুণে পাপী তরে শুনেছি শ্রবণে॥"

পূর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত ঘটনা অবশ্য পরের, তবে বিষয়ের ঐক্য বোধে এইখানে উহা সংস্থাপিত করিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন যে বিজয়কৃষ্ণের অকপট ঐকান্তিক ব্যাকুলতা এবং ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য আকর্ষণী শক্তি জনসাধারণকে তাঁহার দিকে স্বত টানিয়া লইত ও তাঁহার কার্য সাফল্যমণ্ডিত করিত। ঢাকায় কীর্তন প্রচার সম্বন্ধে বঙ্ক কর মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোস্বামী মহাশয় পূর্ব হইতেই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া তথাকার উপাসকদের মধ্যে কীর্তনের খুব উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। যদিও প্রাচীন ব্রাহ্মদল এই সময় কীর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু তাঁহারা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে কীর্তনে সহজে হৃদয় দ্রব হয়। তাঁহারা প্রকাশ্যে কীর্তনের পক্ষ সমর্থন না করিলেও কীর্তনের প্রতি তাঁহাদেরও যে অনুরাগ আছে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। "তোরা আয়রে ভাই এতদিনে দুখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম" এই উন্মাদকারী সংকীর্তনে সহর মাতাইয়া যখন গায়কদল সমাজপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়াছিলেন (১২৭৬ অগ্রহায়ণ, ১৮৬৯ ডিসেম্বর) তখন সেই মহোৎসব দর্শনার্থ ধনী, দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ ও গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।"

ব্রাহ্মধর্মে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করান, এবং সংকীর্তন প্রবর্তনে বিজয়কৃষ্ণ যে মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্বেচ্ছায় কেহ কেহ বিস্মৃত হইতে চাহেন বলিয়া এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। চিরঞ্জীব শর্মা অর্থাৎ ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল মহাশয় যিনি মূলতঃ বিজয়কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াই ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার 'কেশব চরিতে' ভক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের নামোল্লেখও করেন নাই। অবশ্য প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তাঁর ইংরাজি কেশব চরিত্রে ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত বিজয়কৃষ্ণের নামটাও লইয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে মন্তব্য এইরূপ—"Troilokya Nath Sanyal our beloved apostle of song joined the missionary body in 1867. His musical genius became the source of wonderful attraction to the public. He was an invaluable acquistion by the side of Bijay Krisna Goswami, our first enlisted missionary, the lineal descendent of one of the greatest leaders of vaisnavism. Bijay Krisna next to Keshab played the most important part in introducing the vaisnab element into the Bramho Samaj. He (Sanyal) and Bijay Krisna along with the other disciples added continued fuel to the fire of Keshab's devotions."

দশ

১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাঘোৎসব উপলক্ষেও কীর্তন কলিকাতায় বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। ঐ বারের মাঘোৎসব একটি বিশেষ কারণে ব্রাহ্মধর্ম তথা বাংলার ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে, কারণ ঐ মাঘোৎসব দিবসেই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। শিবনাথ দুহিতা হেমলতা দেবীর উক্তি হইতে জানিতে পারি যে ১৮৬৮ সালের ১১ই মাঘ শিবনাথ প্রথম আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন। এদিকে কেশব সেন মহাশয় সহর মাতাইয়া কীর্তন বাহির করিয়াছেন এবং গান শুনিয়া শিবনাথের প্রাণে অদ্ভুত সাড়া জাগে। তিনি উৎসবে যোগ দিবার মানসে কেশব সেন মহাশয়ের বাড়ি গিয়া বিজয়কৃষ্ণকে দেখেন। বিজয়কৃষ্ণ 'শিবনাথকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া গলা জড়াইয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন, যেন প্রাণের ভিতর পুরিয়া লইলেন'। শিবনাথ নিজেও লিখিয়াছেন, "গোসাইজী আমাকে দেখিয়াই 'কি ভাই' বলিয়া আসিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীলদলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিল।" ভক্তিবাদের নবোত্থিত জোয়ারে, এবং কেশব বিজয়কৃষ্ণের মিলিত আকর্ষণে কলিকাতা তথা সারা বাংলা যেন আনন্দ ও উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হইল, কারণ অচিরেই কুসুমে কীট প্রবেশ করিল, এই ভক্তিবাদের সূত্র ধরিয়া ব্রাহ্মধর্মে নরপূজার সূচনা দেখা দিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যদুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম যাত্রা করেন এবং মুঙ্গেরে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। মুঙ্গেরে অবস্থিতিকালে দলের কেহ কেহ কেশববাবুকে অবতার এবং পরিত্রাতা মনে করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ, পাদ-প্রক্ষালন দ্বারা ভক্তির বাড়াবাড়ি দেখাইতে আরম্ভ করেন। এই সকল কার্য ব্রাহ্মোচিত নহে বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে ঘরোয়া-ভাবে প্রতিবাদ করেন এবং পরে কলিকাতা খবরের কাগজে (ডেলি নিউজ এবং সোমপ্রকাশ) নরপূজা নাম দিয়া প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারে কলিকাতায় তথা সারা বাংলায় একটা তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয় এবং বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়কে নানা বাদ প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, যে চিঠিখানি লইয়া এতবড় গোলযোগের সৃষ্টি হয়, তাহার না বাংলা না ইংরাজি রূপটি বিজয়কৃষ্ণ বা কেশবচন্দ্র কাহারও জীবনী গ্রন্থে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। "ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থ যাহাতে এই আন্দোলন বিষয়ে অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা আছে, তাহাতেও মূল চিঠির উদ্ধৃতি নাই।

সোমপ্রকাশের সকল কপি আজ আর সর্বত্র পাওয়া যায় না—সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরীতে দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি নাই। অনুসন্ধান করিয়া জানি যে চাংড়িপোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে সোমপ্রকাশের বিশেষ কপিখানি আছে এবং আমিই প্রথম সেই চিঠিখানির নকল আনাইয়া দরবেশজীর 'মন্দির' কাগজ মারফৎ সাধারণ্যে প্রকাশ করি। প্রয়োজন বোধে নিম্নে চিঠিখানির পুনরায় নকল দিলাম।

[সোমপ্রকাশ ১০ম ভাগ, ৫০ সংখ্যা] সন ১২৭৫, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৮৬৮ ২রা নভেম্বর।]

আমরা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে কতিপয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা জ্ঞান করিয়া তাঁহাব চরণে পতিত হইয়া তাঁহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা এবং কেহ কেহ তাঁহার চরণধূলি লেহন করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে এক্ষণে এই ভারতবর্ষে তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও মুক্তি হইবে না, তিনি একজন ঈশ্বরাবতার। ঐ সকল ব্রাহ্মের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পত্রে কেশববাবুকে 'দয়াল প্রভু', 'পাপীর গতি' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কখনও কখনও তাঁহারা কেশববাবুকে লইয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মোপাসনাকেও তাঁহারা এমনি সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহাতে আদ্যোপান্ত যোগদান করা সুকঠিন হইয়াছে। কেশববাবুকে মধ্যবর্তী করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ব্রহ্মোপাসনার এক রূপঅঙ্গ করা হইয়াছে। আমবা একদিবস একজন ব্রাহ্মকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে শ্রবণ করিলাম, "প্রভু! আমি অত্যন্ত পাপী, ঈশ্বর আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন না, অতএব আপনি আমার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন"। পত্রে কেহ কেহ এইভাবে তাঁহাকে লিখিয়া থাকেন, "আপনার দয়াল পিতাকে এই কথা বলিবেন।"

কেশববাবুকে এইরূপ অযথা অধিকার প্রদান করা, তাঁহার চরণ লেহন করা, তাহার নামে বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া পথে পথে অথবা সমাজে প্রচার করা ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য। যে সকল ব্রাহ্ম এইরূপ আচরণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে সত্যের ও ভ্রাতৃভাবের অনুরোধে সানুনয় বাক্যে কহিতেছি যে তাঁহারা তদ্রূপ আচরণ করিয়া আপনাদেব ও কেশববাবুর মঙ্গলের পথে কণ্টকারোপ না করেন। যাঁহার নিকট আমরা উপকার লাভ করিতেছি, তাঁহাকে মনুষ্যোচিত শ্রদ্ধাভক্তি করা অবশ্যই কর্তব্য কিন্তু তাঁহাকে 'পরিত্রাতা', 'ঈশ্বরাবতার' বলা বা নীচভাবে তাঁহার চরণ লেহন করা ঈশ্বর ও সত্যের অবমাননা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র পরমেশ্বরকে মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন। মনুষ্যের উপসনা করা ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ অননুমোদিত কার্য। যে ব্যক্তি অনন্যগতি হইয়া ভক্তির সহিত সেই সত্যস্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ পবিত্র করুণাময়, পাপীর গতি ও আশ্রয় পরমেশ্বরের স্মরণাপন্ন হইবেন এবং তাঁহার নিকট ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মানুষ্য বা পুস্তককে তিনি ঈশ্বর ও মুক্তিলাভের জন্য নিয়োগ করেন নাই।

উপসংহার কালে কেশববাবু নিকট আমাদের নিবেদন যে উক্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করিতেছেন তাহা যদি তাঁহার গর্হিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ স্রোত বন্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন; নতুবা সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবে যে তিনি উক্ত কার্য অনুমোদন করেন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীনীলকমল দেব।

শান্তিপুর
১৭৯০ শক, ৬ই কার্ত্তিক

প্রথমেই লক্ষ্য করিবার কথা যে উদ্ধৃত পত্রের স্বাক্ষরকারী বিজয়কৃষ্ণ এবং যদুনাথ মাত্র নহেন, নীলকমল দেব মহাশয়ও ছিলেন অথচ স্বাক্ষরকারী হিসাবে তাঁহার উল্লেখ, পত্রটি আমার দ্বারা পুনঃ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কোথাও দেখি নাই। অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত বলিয়া হয়ত ইঁহাকে লইয়া আর বিশেষ বাকবিতণ্ডা হয় নাই।

চিঠি দুইখানি যে কিরূপ আলোড়ন তুলে তাহা "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে। ইতিবৃত্তের ভাষায়, "যেই ডেলি নিউসে প্রচারকদ্বয়ের স্বাক্ষরিত পত্র বাহির হইল অমনি সপ্তাহ কাল মধ্যে অগ্নির ন্যায় পত্রিকা হইতে পত্রিকান্তরে তাহা প্রকাশিত হইয়া চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইল; শেষে মহাসমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ড এমেরিকা পর্যন্ত গমন করিয়াছিল। এমনি হইল যে সংবাদপত্রে কেশববাবুর নিন্দাগ্লানি আর ধরে না।" সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় মন্তব্যও কম জ্বালাময়ী ছিল না। সোমপ্রকাশ মন্তব্য করিয়াছিল, "কেশববাবু যেদিন ব্রাহ্ম সংকীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন সেইদিনই তাঁহা হইতে আমাদিগের দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া যে কিছু আশা জন্মিয়াছিল, তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমরা সেই সময় স্ফুটাক্ষরে কহিয়াছিলাম কেশববাবু চৈতন্য ও খৃষ্টাদির ন্যায় অবতার মধ্যে পরিগণিত হইবার বাসনায় ব্যগ্র হইয়াছেন।...... এক্ষণে ফল দ্বারা তাহার পরিচয় হইল। কেশবের অনুচর ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে

পরিত্রাণকর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার চরণে পতিত হইয়া প্রণিপা ও চরণরেণু লেহন করিতেছেন, তিনিও কুসংস্কার ও দুর্ব্যবহার অপনয়নে চে পাইতেছেন না, শুনিলাম বরং উহা অনুমোদন করিতেছেন। এখন খালি দু'চার উৎকট পীড়া আরোগ্য করা কার্যটি বাকী আছে, তাহা হইলেই পূর্ণ অবতার হন এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কোন অবতার বলি গণনা কবিবেন? তিনি চৈতন্যের মৃদঙ্গ, সংকীর্তন লইয়াছেন, এবং খৃষ্টের ত্রা কর্তৃত্ব লইলেন,......উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া ঈশ্বর কি তাঁহাকে অদ্ভুত অবতা বলিয়া ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন?"

সম্পাদক মহাশয়েব কীর্তনের উপর তীব্র শ্লেষ লক্ষ্য করিবাব বিষয়। কীর্ত সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিকূলতা বিজয়কৃষ্ণের যে জানা ছিল তাহা আমবা দেখিয়াছি কাজেই এই শ্লেষ বিজয়কৃষ্ণের নিকট অবাঞ্ছিত হইলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না।

ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন প্রণীত Biography of a New Faith Vol II হইতে জানিতে পারি যে বিজয়কৃষ্ণ নরপূজা ব্যাপারে কেশবচন্দ্রকে যে পত্র দেন তাহা প্রয়াগ হইতে ২৭শে আশ্বিন লেখা হয়। কেশবচন্দ্রের উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি শান্তিপুবে ফিরিয়া আসেন সম্ভবতঃ কার্তিকেব গোড়াতেই কারণ সোমপ্রকাশে মুদ্রিত পত্র ৬ই কার্তিক শান্তিপুর হইতে লেখা। পতিবাদের প্রতিকার না হইলে ব্রাহ্মসমাজে আর যোগ দিবেন না এই স্থিব কবিয়া তিনি শান্তিপুরে আসিয়া এই সময়ে পুনরায় ডাক্তারি করিতে শুরু করেন। সকল কাজেই তাঁহার অসাধারণত্বের ছাপ, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দরিদ্রের নিকট কোন রূপ ভিজিট না লইয়া এবং অন্যের নিকট নামমাত্র ভিজিট লইয়া, তিনি আপন প্রশস্ত হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়া আতুরের সেবায় মাতিয়া উঠিলেন দেখিতে দেখিতে তাঁহাব পসার অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল। হাতের রোগীদের সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় তিনি স্বপ্নে সেকালেব বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথেব পিতা) মহাশয়ের নিকট ঔষধের ইঙ্গিত পাইতেন। রোগীদের প্রতি তাঁহার এমনই সহৃদয়তা ছিল যে 'তিনি একদিন রোগীব বিপজ্জনক অবস্থায় জল-ঝড় অতিক্রম করিয়া, নৌকাব অভাবে গঙ্গানদী সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া তাহার চিকিৎসা করিয়া ছিলেন।' (বঙ্ক কর) চিকিৎসা ব্যবসায়ের ইতিহাসে ইহার তুল্য ঘটনা নিশ্চয় বেশী নাই, কিন্তু কয়জন বাঙালী এই আত্মভোলা আতুর সেবার কাহিনী শুনিয়াছে।

এদিকে সংবাদপত্রে প্রতিবাদ পত্রখানি ছাপা হইলে কেশবচন্দ্রের নিন্দাপবাদের যে সোর উঠে তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া কেশবচন্দ্রের অনুচরগণ পত্র প্রেরকদিগকে

নির্মমভাবে আঘাত করিতে এবং ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল। বিজয়কৃষ্ণের সরলতা ও সত্যানুরাগের প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণের নিজের কথায়, "কোন কোন ব্রাহ্মভ্রাতা এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়া ছিলেন যে আমাকে প্রহার পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন।* বোধ হয় আমি যে এখনও কোন কোন ভ্রাতার নিকট ঘৃণিত ও অবিশ্বাসের পাত্র রহিয়াছি, এই ঘটনাই তাহার মূল কারণ।" কিন্তু তাঁহাকে গালি দিলে কি হইবে, তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না, এবং স্বয়ং কেশব সেন মহাশয়ও জানিতেন যে বিজয়ই তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। তাই বিজয়ের অসহযোগিতায় সন্ত্রাসিত হইয়া তিনি বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য স্বয়ং শান্তিপুরে গিয়া বিজয়কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। এই ব্যপদেশে শিবনাথ শাস্ত্রীও শান্তিপুরে গিয়াছিলেন; তাঁহার ভাষায়, তিনি আমার সহাধ্যায়ী, তাঁহার মুখে সমুদয় শ্রবণ করা উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রের প্রতি বিজয়কৃষ্ণের মনে কোনরূপ ব্যক্তিগত বিরূপতার উদয় হয় নাই, এবং কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য বন্ধুর অনুরোধে তিনি ১৮৬৯ সালের জুনের শেষে ধর্মতত্ত্বে এক পত্রপ্রকাশ করিয়া বিক্ষোভের অবসান ঘটান। পত্রখানি দীর্ঘ এবং অধিকাংশ জীবনীতেই উদ্ধৃত, তাই বাহুল্য ভয়ে এখানে আর সমগ্র উদ্ধৃত করিলাম না।

মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে নরপূজা ব্যাপারে আন্দোলন তুলায় দোষ কাহার, যাঁহাদের ব্যবহারের বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের, না যাঁহারা প্রতিবাদ করিলেন তাঁহাদের। গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় তাঁহার কেশব চরিত্রে সমস্ত দোষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যদুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়ের উপর চাপাইয়াছেন এবং বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে শান্তি আনিবার জন্য যে পত্র ছাপান, উহাকে তাঁহার দোষ স্বীকৃতির প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত লেখক ব্যাপারটিকে তাহারই মধ্যে কতকটা অপক্ষপাতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "বস্তুতঃ ইহাতে দুই পক্ষেরই কিছু কিছু ত্রুটি দুর্বলতা আমরা দেখিতে পাই।······ঐ দুইজন (অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ) অতি পবিত্র-

* বিজয়কৃষ্ণের পরবর্তী কোন বক্তৃতা হইতে জানিতে পারি যে মুঙ্গেরে প্রথম মৌখিক প্রতিবাদের ফলে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাকে কটুকাটব্য করিতে থাকিলে তিনি আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া বারাণসী গমনপূর্বক দণ্ডীদিগের নিকটে কিছুদিন বাস করেন। পরে শিমলা হইতে কেশবচন্দ্র এলাহাবাদে ফিরিলে সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করেন ও প্রতিবাদ করেন। —লেখক।

চরিত্র ব্রাহ্ম, তাঁহারাও ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার ও যন্ত্রণ ভোগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মে কোন প্রকার কলঙ্ক দেখিলে যথার্থই তাঁহাদের ব্যথিত হইতে পারে। নরপূজা এবং পৌত্তলিকতার কোন সুস্পষ্ট কারণ তাঁহার ব্যক্তি বিশেষে সন্দর্শন করিয়াই তাঁহারা তদ্রূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন।...প্রচারকদ্ব ব্যতীত আরও কতকগুলি নিরপেক্ষ সরল হৃদয় ব্রাহ্ম বিদেশে থাকিয়াও সমস্ত খব পরস্পরের মুখে শ্রবণ করতঃ অনিষ্ট গণনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ বাহ্যলক্ষণ যেরূ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা দর্শনে কতকটা সন্দেহ অসম্ভব বোধ হয় না।...তাঁহাদে উদ্দেশ্য সাধুতার সহিত যুক্ত থাকিলেও উপস্থিত দোষ সংশোধন বিষয়ে যে উপা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা অতি নিকৃষ্ট।" অর্থাৎ অভিযোগ করিবার যথেষ্ট কার ছিল, কিন্তু সংবাদপত্র মারফত অভিযোগ প্রচার করা উচিত হয় নাই। অভিযোগে ভিত্তি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কেশব জীবনী লেখক প্রতাপচন্দ্র ম মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কথায়, They [ie the Keshab followers] professed uncommon reverence for him. They prostrated and abased themselves before him most utterly they began to talk of him in extravagant phraseology such as Lord, Master, Saviour, so that all this provoked comment It was just like the advent of one of the great ancien prophets like Sakya Muni or Chaitanya and Keshab wa openly alluded as such. Some professed to have seen supernatural sights concerning him. Some connected him with Jesus, as the elder and the younger Son of the Fathe and others composed and sang hymns about him." ইহার সহি সোমপ্রকাশে মুদ্রিত পত্রখানি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে অভিযোগের মধ্যে অতিরঞ্জন এতটুকু নাই। এখন প্রশ্ন অভিযোগ কোথায় করা উচিত ছিল কেশব সেন মহাশয়কেও অভিযোগ করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি অভিযোগে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই এবং স্পষ্টই পরের ভাবে আঘাত করিতে তি অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় যাঁহারা আচরণটিকে দূষণীয় বলিয়া মনে করিলেন তাঁহারা যান কোথায়? প্রয়াগ হইতে বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সকাশে পত্রে এই মর্মে প্রশ্ন তুলেন, "শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু গত রজনীতে উৎসবের প বলিয়াছেন, যে আপনার চরণ আশ্রয় না করিলে পরিত্রাণ নাই। ইহা ব্রাহ্মধর্মে বিরুদ্ধ কথা। প্রতাপবাবু প্রকারান্তরে মনুষ্য পূজা প্রচার করিয়াছেন। আমি

ব্রাহ্মধর্মে শিক্ষা করিয়াছি, অনন্ত করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ মানুষের পরিত্রাতা নাই। ঈশ্বর করুণা করিতে অক্ষম হইয়া, মনুষ্যের প্রতি পরিত্রাণের ভার দেন নাই। মনুষ্যকে পরিত্রাতা বলা যদি এখানকার মত হয় তবে আমি বাধ্য হইয়া আপনাদিগের সমাজে যোগ দিতে অক্ষম হইব।" আচার্য কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় দলের একজন অতি প্রধানের নিকট ঐরূপ চরম পত্র পাইয়াও বিশেষ কিছু করিলেন না, তিনি মাত্র লিখিলেন, "আমি যদি আমাকে কখনও পরিত্রাতা বলিয়া থাকি তবে আমাকে উৎপীড়ন কর, পরের কথার জন্য আমি দায়ী নহি।" অর্থাৎ তিনি ভক্ত অনুচরদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে নিজে কিছুই করিতে চাহিলেন না। এ অবস্থায় আপনাদের কাগজ অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বে প্রতিবাদ পাঠানর কথাই উঠে না, সুতরাং অন্য পন্থা না দেখিয়াই বিজয়কৃষ্ণকে সাধারণ সংবাদপত্রের আশ্রয় নিতে হয়। বিজয়কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি কিছুই করেন নাই—পূর্বে যথেষ্ট সতর্ক করিয়া, ফল না পাইয়া তবে সংবাদপত্রের স্বারস্থ হইয়াছেন। পরে মিটমাটের জন্য তিনি ধর্মতত্ত্বে যে পত্র প্রকাশ করেন, ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে তাহা মোটেই দোষ স্বীকৃতি নহে। তিনি বলিতেছেন, যে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে কেশব ভক্তদিগের কেবল বাহ্যিক কার্য ও বাক্যে আতিশয্য দোষ আছে, তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাহারা এইরূপ ব্যবহার করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্য উপাসনা করেন না, এবং ঈশ্বরের অবতার অথবা মুক্তিদাতা অথবা পাপীও ঈশ্বরের মধ্যবর্তীজ্ঞানে কোন মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করেন না।" ইহার অর্থ এই যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হইবার পর তাঁহাদের মত যে কার্য হইতে ভিন্ন তাহা বিঘোসিত করিয়াছেন। এই বিঘোষণ, পত্র প্রকাশের পরের ঘটনা এবং বিজয়কৃষ্ণ সত্যের খাতিরে, সেই ঘটনাকেও সাধারণ্যে উপস্থিত করিয়াছেন ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত পত্রে। বিজয়কৃষ্ণের ভাষায়, "তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না, তখন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়।" তবে ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে "এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যতই অল্প হয় ততই ভাল। কেননা তদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীত অনুরোধ করি যে তাঁহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহারা দুর্বল ভ্রাতাদিগের মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল বাহ্য লক্ষণ রহিত করেন যদ্দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অপকার হইতে পারে।" বাহ্য লক্ষণের অনুরূপ যে ভক্তদিগের মত নহে এই ঘোষণা স্বতই প্রতিবাদ প্রকাশের পূর্বে হয় নাই, সুতরাং প্রতিবাদ প্রকাশে ফল একপ্রকারে ভালই হইয়াছিল এবং বিজয়কৃষ্ণও সেইরূপ

বিশ্বাস করিতেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে তাঁহার "ব্রাহ্মধর্মের বর্ত্তমান অবস্থা" প্রথম প্রকাশিত হয়; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "কেশববাবুর উপদেশ এবং চেষ্টায় যে অসত্য লইয়া বিবাদ হইতেছিল, তাহা তিরোহিত হইল। বিশেষতঃ যে দুইজন কেশববাবুকে অবতার মনে করিতেন, তাঁহারা কেশববাবুকে ভণ্ড বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন। এই কারণে সকলে বিশেষ সাবধান হইলেন। যাঁহারা অসত্য ব্যবহার করিতেন তাঁহারা আর করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।" ব্রাহ্মধর্ম হইতে যে এতটা গ্লানি দূর হইল তাহা কম লাভ নয়। যাহা হৌক তাঁহার ধর্মতত্ত্বে এই পত্র প্রকাশ করায় অবাঞ্ছিত কোলাহলে শান্তিবারি নিক্ষিপ্ত হইল এবং সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন সাধিত হইল। এই পুনর্মিলনকে celebr.te করিবার জন্য কেশব সেন মহাশয় সদলবলে রাণাঘাটের সন্নিকটে বিজয়কৃষ্ণের আবাসে গিয়া তাঁহার পুত্র যোগজীবনের নামকরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায়, As an act of formal reconciliation with him, a party of Bramhos headed by Mr Sen visited in July next (ie July 1869) a place Called Kaliaghata Kuthi near Ranaghat where Bijay Goswami was then residng, to conduct the Namkaran ceremony of his son and to hold a festival there. The festival was very refreshing to the spirits of those who attended it"*

এগারো

কেশব বিজয়ের পুনর্মিলনের কিছু পরেই বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় যান কারণ বঙ্ক কর মহাশয়ের 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্তে' আছে যে "১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের

* যোগ জীবনের জন্ম যদি বাংলা ১২৭৬ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৮৬৯ নভেম্বর ডিসেম্বরে বলিয়া মূল জন্মপত্রিকা ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তবে এই উৎসবের উপলক্ষ্য যোগজীবনের নামকরণ নহে বলিতে হইবে এবং ইহা যোগজীবনের জন্মের পূর্বে বলিয়া গণনা করিতে হইবে। সেই চূড়ান্ত প্রমাণ না পাওয়া অবধি আমরা শিবনাথের উক্তিই নির্ভুল ভাবিয়া যোগজীবনের জন্ম ১৮৬৮ নভেম্বর অর্থাৎ ১২৭৫ অগ্রহায়ণই সম্ভব মনে করি। পরে প্রকাশ পাইবে যে ১২৭৬ সালের ভাদ্র হইতে বিজয়কৃষ্ণের কর্ম ব্যস্ততা এবং ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন ১২৭৬ সালের অগ্রহায়ণে যোগজীবনের জন্মকে সন্দেহযুক্ত করে। লেখক।

[ু]লাই মাসে বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় ঢাকায় আসিয়া আরমানিটোলা ব্রাহ্মসমাজের [ব]াড়ীতে বাস করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার আগমনে সঙ্গতের [স]ভ্যগণের উৎসাহ নবীভূত হয়।" ঐ বৎসরেরই আগষ্ট মাসে (৭ই ভাদ্র) [ভ]ারতবর্ষীয়, ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে সামাজিক উপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্মসমাজের [ব]র্তমান অবস্থা পাঠে মনে হয় বিজয়কৃষ্ণ ঐ সময় কলিকাতায় ছিলেন; কর [ম]হাশয়ের ইতিবৃত্ততেও দেখি "বাংলা ১০৭৬ সালের ভাদ্র অর্থাৎ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের [সে]প্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের গৃহে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ও [পূ]র্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজকে একীভূত করিবার জন্য একটি বিশেষ সভা হয়। এই [স]ভায় স্থির হয়, যে পর্যন্ত না সমাজের গৃহ প্রস্তুত হয়, সে পর্যন্ত সর্বসম্মতি ক্রমে [শ্র]ীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাচার্যের পদে নিযুক্ত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণের [অ]নুপস্থিতিকালে দুইমাসের জন্য বঙ্গচন্দ্র রায় উপাচার্য মনোনীত হন।" অর্থাৎ [ঐ] সময়ে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, কলিকাতার উৎসবে যোগ দিবার জন্য। [ক]লিকাতার উৎসবে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, [ত]াঁদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের [না]ম উল্লেখযোগ্য। আশ্বিন মাসের শেষের দিকে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় ফিরিয়া [বঙ্গ]চন্দ্র রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া কালিকচ্ছ প্রভৃতি গ্রামে [ব্রা]হ্মধর্ম প্রচারে গমন করেন। তথাকার নন্দী পরিবারে বিজয়কৃষ্ণ সদলবলে [কী]র্তন আরম্ভ করিলে, বিরুদ্ধবাদীরা শতাধিক লোক লইয়া তাঁহাদের উপর [অ]ত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হন। বিজয়কৃষ্ণের দল ইঁহাদের বিরুদ্ধতার [দি]কে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এমন তন্ময়ভাবে এবং ভক্তিভরে ঈশ্বরের নামকীর্তন [ক]রিতেছিলেন যে বিপক্ষদল বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আবিষ্ট হইয়া নাম গান [ক]রিতে থাকে। অহিংসা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা শত্রুপক্ষের হৃদয় জয়ের [দৃষ্ট]ান্ত বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এইরূপ বহু দেখা যায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র ঢাকায় যান এবং নবনির্মিত [সমা]জগৃহে প্রবেশের দিন যে কীর্তন সমারোহ হয় তাঁহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। [ঐ] দিন বঙ্গচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র নন্দী, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত ঘোষ [প্রমু]খ বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। বিজয়কৃষ্ণের আবেগময় উপদেশে [এব]ং আদর্শ জীবন যাপনে আকৃষ্ট হইয়াই যে ইঁহাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ [কর]েন তাহা অবিসংবাদিত। মূলতঃ বিজয়কৃষ্ণের চেষ্টাতেই পূর্ববাংলায় ব্রাহ্মধর্ম [ক্রম]শঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ইতিবৃত্তে [লি]খিয়াছেন, Wherever Bijay Goswami went new converts were

made and his preaching caused a widespread ferment
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার ময়মনসিংহ গমনের কথা আগেই বলিয়াছি
পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া মাঘোৎসবে যোগ দেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই
ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র বিলাত রওনা হন, খুব সম্ভব তখনও বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায়
তৎপরে তিনি মুঙ্গের, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া
প্রচার করেন। মুঙ্গেরে তিনি 'ব্রাহ্মধর্মের উদারতা' নামে একটি বক্তৃতা দেন
সংবাদটি ১৭৯১ শকের ১লা চৈত্রের ধর্মতত্ত্বে এইরূপভাবে বাহির হয়, "আমাদে
শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম
পাঞ্জাবে গমন করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তিনি মুঙ্গেরে ব্রাহ্মধর্মের উদারতা বিষ
একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।" এই বক্তৃতা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমা
বাহির হইয়া থাকিবে এবং ইহাতে বিলাত প্রবাসী বন্ধু কেশবচন্দ্রের মতের কি
সমর্থন আছে। তিনি বলিতেছেন, "ব্রাহ্মধর্ম বঙ্গদেশ, ক্রমে ভারতবর্ষ, এক্ষ
ইংলণ্ড মধ্যে আপনার কিরণ বিকীরণ করিতে চলিল।" আবার, কেশবচন্দ্রে
বাইবেল প্রশংসার সমর্থন করিয়া তিনি বলিতেছেন, "বিলাতস্থিত ব্রাহ্মভ্রাতা কি
প্রকারে এপ্রকার বলিতে সাহসী হইলেন যে······ভারতবর্ষ কখনও বাইবেল ভি
চলিতে পারে না। ব্রাহ্মভ্রাতাগণ দ্বারা এ বাক্য ব্রাহ্মধর্মের উদারতার অনুবর্ত
হইয়াই বিনির্গত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মধর্ম ভিন্ন সরলভাবে আর কেহ
বলিতে পারে না।" প্রবন্ধের শেষে বিজয়কৃষ্ণ বলিতেছেন, "করুণা করিয়া
ধর্মে পিতা আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন আমরা যেন চিরদিন তাহার বিশ্ব
ভৃত্য হইতে পারি। আমরা যেন জাতি, বর্ণ, অবস্থা-জ্ঞান বিরহিত হইয়া সর্বস্থ
সত্যের সমাদর করিতে পারি। যেন আমাদের বাক্য চিরদিন সরল হয়; যেম
পরস্পরের সহিত তেমনি যেন পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভ্রাতাদিগের সহিত হৃদয়ে
যোগ সংস্থাপনে আমরা দৃঢ়ব্রত হই। যেন কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া আম
একজাতীয় সত্যকেই সর্বস্ব মনে না করি, যেন মান যশ প্রতিষ্ঠার অভিলাষ ম
হইতে দুর করিয়া দিয়া কেবল পিতার ভৃত্য হইবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হই
দয়াময় এই কর যেন তোমার সন্তান সকল কখনও নিজ গৌরব প্রচার করি
পৃথিবীর অন্তর্দাহ আর বৃদ্ধি না করে; যেন পিতা, সকলেরই এই কামনা হয়, যেম
স্বর্গেতে, তেমনি পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" বিজয়কৃষ্ণের এই প্রার্থ
সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় মামুলি বাক্য-বিন্যাস ছিল না, তিনি যেমন সারা জগতের ম
ঈশ্বরের নিকট ঐকান্তিকভাবে ঐ প্রার্থনা করিতেন, তেমনি আকুলভাবে ব্রা
আদর্শের অনুযায়ী আপনাকে প্রস্তুত করিবার জন্য যে বিপুল প্রয়াস করিতেন তা

ভাবিলে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। সকল বিষয়েই তাঁহার আদর্শ ছিল গগনচুম্বী। তাঁহার কর্তব্যবোধের আদর্শ কিরূপ ছিল তা তিনি ১২৭১ সনের আশ্বিনের ঝড়ের দুর্দিনে সাঁতরাইয়া মন্দিরে গিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া জগৎবাসীকে দেখাইয়াছেন, আতুর সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন নৌকার অভাবে মাথায় ওষুধ বাধিয়া গঙ্গা সাঁতরাইয়া। পবিত্রতার, তথা নিষ্পাপতার আদর্শ তাঁহার কত উন্নত ছিল তাহার হদিস পাওয়া যায় তাঁহারই বর্ণিত এই সময়ের একটি ঘটনা হইতে। এইবার লাহোরে গিয়া কোন এক রজনীতে যুবতী নারী দর্শনে তাঁহার মনে সামান্য পাপের উদয় হয়, অমনি তাঁর সদা জাগ্রত আত্মবিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তাঁহার অন্তর-আত্মা ধিক্কার দিয়া উঠিল, "হায় আমি প্রচারক, উপদেষ্টা, আর আমার মন পাপ চিন্তার অধীন! তবে ত আমার কিছুই হয় নাই।" দারুণ আত্মগ্লানিতে তিনি আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রাভী নদীতে যান। ঠিক সেই সময়ে এক ফকির আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলেন, "বাচ্ছা, শরীর ছোড়নেসে পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হোগা নেহি। তু ধৈরয ধর, তেরা ভালা হোগা। যব পাপ ছুটেগা, তু কুছ নেহি জানেগা। আভি বহুত রোজ দেরী হ্যায়। খোদা সব কামকা সময় ঠিক কর রাখা। বাতাস সে ধুর উড়তা, ওভি খোদাকা ইচ্ছাসে হোতা। ঘাবরাও মত। দুনিয়ামে খোদাকা খেল দেখ, তেরা ভালা হোগা।" যে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার পূত জীবনের অমোঘ প্রভাবে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিতেছিলেন, তিনিও আপনার পবিত্রতায় সন্তুষ্ট নন্। বিশ্লেষণ শক্তি কত সূক্ষ্ম হইলে, পবিত্রতার আদর্শ কিরূপ সুমহান হইলে এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকার বা বিচ্যুতি ধরা পড়ে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। আমি আপনি যে অবস্থায় আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম, বিজয়কৃষ্ণ তাহাতে সন্তুষ্ট ত ননই, বরং অনুতপ্ত। ভূমায় যিনি বদ্ধদৃষ্টি, অল্পে তাঁহার সন্তুষ্টি কোথায়! অতৃপ্তিই উন্নতির জনক, বিজয়কৃষ্ণ আপন অবস্থায় চিরকালই অতৃপ্ত ছিলেন বলিয়াই অবিশ্রান্ত উচ্চতায় উঠিতে পারিয়াছিলেন। লাহোরের এই ঘটনাটিকে এইভাবে না দেখিলে ইহার সম্যক অর্থ প্রতিভাত হইবে না।

বাংলা ফিরিবার পথে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন সপরিবারে মুঙ্গেরে বাস করেন। মুঙ্গেরেই তাঁহার কন্যা সন্তোষিনী গতায়ু হন। তিনি সেই উদ্দেশ্যে শোকোপহার নামক ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা অপ্রাপ্য; পাওয়া গেলে বিজয়কৃষ্ণের ঐ সময়ের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিবার অধিকতর সুযোগ মিলিত। মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া তিনি কুষ্টিয়া কুমারখালি হইয়া

পুনরায় ঢাকায় গমন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। বলা বাহুল্য বিজয়কৃষ্ণ এই বিরোধে নবীন দলের পক্ষে ছিলেন এবং প্রাচীনগণ খোল করতাল সহ সমাজগৃহে কীর্তন রহিত করিলে, মূলতঃ বিজয়কৃষ্ণের ঘোরতর আপত্তির জন্য নবীন দল ২০শে ভাদ্র হইতে স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। এ ব্যাপারেও বিজয়-কৃষ্ণ তাঁহার সম্মানিত বন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের অনুরোধেও আপনার মত বিসর্জন দিতে পারেন নাই! বিজয়কৃষ্ণ নবীন দলের পক্ষ সমর্থন করায় প্রাচীন দল এমনই ক্ষীণবল হইয়া পড়ে যে তাঁহাদের মন্দির প্রায় উপাসক শূন্য হইয়া উঠে এবং প্রাচীন দলেরই আগ্রহাতিশয্যে বাৎসরিক কাল পরে উভয় দল আবার মিলিত হয়।

কেশব সেন মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষার্ধে। ইহার কিছু পরেই সেন মহাশয়ের আহ্বানে বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি লইয়া আন্দোলন হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। অন্যান্য প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণের সহিত বিজয়কৃষ্ণ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে বৎসরের গোড়ার দিকে অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের অতি অনুরাগীভক্ত শ্রীধর ঘোষ মহাশয় এই সময়েই কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং গোস্বামীজায়া যোগমায়া ও পুত্র যোগজীবনকে প্রথম দর্শন করেন। গোস্বামী জীবনের শেষার্ধে এই অপরূপ ভক্ত অনেকখানি স্থান জুড়িয়াছিল বলিয়া এই ঘটনাটি আপাত-দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর হইলেও এইখানে বলিয়া রাখিলাম। এই আন্দোলন ব্যপদেশে আদি সমাজ এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের মধ্যে বিবাদ তীব্র হইয়া উঠে। আদি সমাজের মতে ব্রাহ্ম বিবাহ হিন্দু বিবাহই এবং তাহাকে সিদ্ধ করিবার জন্য রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ অনাবশ্যক। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মত জ্ঞাপন করিয়া সরকারকে এক পত্র দেন। গোড়ায় তিনি Civil Marriage Law এর কোন আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়া পরে বলিয়াছেন, Should the legislature however, consider it proper to pass an enactment like the one under consideration, I would respectfully urge that in framing a civil marriage law for India the legislature should not go further than the actual necessity the case requires, nor should it yield to the temptation of introducing social changes and reforms by the fiat of the law……in giving a

civil form of marriage to a section of the Indian community. I do not see the necessity of bringing them or their children under an entirely new law of succession. It would I think be sufficient to enact that the law of succession applicable to all persons marrying under the Act shall be the law which would have governed the husband if he had not so married.

এই ব্যাপার সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের একটি নিজস্ব মত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক অধিবেশনে রাজ নিয়ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় অবধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আচার্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থে গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় এ বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহা উদ্ধার করিলাম। "শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন আইন না হইলে ব্রাহ্মধর্ম বিস্তার হইতে পারে না একথা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের উপর কলঙ্ক আসে। এই অভিপ্রায়ে যদি এ প্রস্তাব হইয়া থাকে, তবে আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম অনুমাত্র রাজার সাহায্য চান না। রাজা যদি আমাদের ধর্মকে স্বীকার করিয়া না লন, আমাদের তাহাতে আধ্যাত্মিক ক্ষতি হইতেছে না। পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না; যদি পৃথিবীর আইন অধর্ম অনীতির প্রবর্তক হয়, তবে আমরা উহাকে পদদ্বারা দলন করি। রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্মবিবাহে যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে তৎপ্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লঙ্ঘন না করেন। পার্থিব বিধি অপেক্ষা ঈশ্বরের নৈতিক বিধি শ্রেষ্ঠ।" যদিও সভায় সভাপতি কেশব সেন মহাশয়ের নির্দেশে স্থির হয় যে দেশীয় ব্যবহারে যদি ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে রাজবিধি দ্বারা উহা সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত তথাপি বিজয়কৃষ্ণের-মতের বৈশিষ্ট্য এবং উহার তেজিয়ান প্রকাশ লক্ষ্যের বিষয়। বৈষয়িক লাভালাভ গণনা অপেক্ষা আদর্শের আকর্ষণই তাঁহার সকল কর্মের নিয়ন্তা ছিল।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধি লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতা সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহের জন্য স্বয়ং কাশীগমন করেন এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ গোপন করিয়া কাশীর কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট একটি অবান্তর ব্যবস্থা আনিয়া প্রচার করেন যে কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মত অনুসারে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে ধর্মতত্ত্বে ও মিরারে উহার প্রতিবাদ হইলে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সোমপ্রকাশে

এক পত্র লিখেন। ১৭৯৩ শকের ১লা কার্তিক অর্থাৎ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিজয়কৃষ্ণ বন্ধু অঘোরনাথ ও কান্তি মিত্র সহযোগে যে পত্র প্রকাশ করেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া এই প্রসঙ্গে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে বিবাদ উত্থিত হয়—তাহার ইঙ্গিত দিব।

মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

অদ্য সোমপ্রকাশে আপনার প্রেরিত পত্রখানি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং ব্যথিত হইলাম। আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া এতদূর অস্থির হইতে পারেন তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহা হৌক, অদ্য আপনি আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছেন এবং অবাক করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর এরূপভাব হইতে রক্ষা করুন। আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, অনুগ্রহ-পূর্বক উহাদের উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন,

১। বারাণসীর চান্দ্রমাস গণনায় ২রা ভাদ্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস গণনায় ১১ই আশ্বিন, ইংরাজী ২৮শে সেপ্টেম্বর দিবসে বারাণসী নগরে হরিশচন্দ্র বাবুর বাটীতে পণ্ডিতদিগের যে একটী সভা হইয়াছিল তাহা আপনি অস্বীকার করেন কিনা এবং সে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না?

২। বারাণসী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, মৃত রাজা দেবনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত বস্তীরাম দ্বিবেদী, কাশীর রাজার সভাপণ্ডিত তারাচরণ বর্ত্তমান সময় কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত কি না? কাশীতে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কি না? ঐ সকল পণ্ডিত কুশণ্ডিকাদিশূন্য ব্রাহ্মবিবাহকে এবং অসবর্ণ বিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না?

৩। উক্ত সভাতে আপন মত প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না?

৪। বাপুদেব শাস্ত্রী রাজারাম শাস্ত্রী আপনার গুরুতুল্য কি না? তাঁহাদিগকে আপনার গুরুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপকদিগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন?

৫। উক্ত সভাতে ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া কতজন পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছেন?

৬। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন?

৭। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ মিথ্যাবাদী এবং তাঁহারা কেবলই অসত্য প্রচার করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বরের সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন ?

৮। "কৈশব" এই শব্দের অর্থ কি ? এই শব্দ দ্বারা কাহাদিগকে গণ্য করিতেছেন ? এই শব্দটি কি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই ?

৯। পরমেশ্বরকে সর্বসাক্ষী জানিয়া তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া এই আটটি প্রশ্নের প্রকৃত সত্য সরল উত্তর অকপটভাবে প্রদান করিবেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই বিজয়কৃষ্ণের 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা' প্রকাশিত হয় (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল)। এই ব্যাপার সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বিবাহবিধির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অত্যন্ত অসত্য ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। সেই অসত্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করাতে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মগণ স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ত্যাগ না করিলে মধ্যে মধ্যে কলহ হইবেই হইবে, ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন হইবে না। আপনার ক্ষুদ্রতাকে, দুর্বলতাকে, অসত্যমনকে ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া প্রচার না করিয়া যাহা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।" উল্লিখিত পত্রটি পড়িয়া মনে হয় বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ে কাশীগমন করিয়া কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন, কারণ ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বিজয়কৃষ্ণ ঐ প্রতিবাদ পত্র লিখিয়াছিলেন ভাবা শক্ত। এই সময়েই কাশীতে তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হইয়া থাকিবে। বিজয়কৃষ্ণ পরে শিষ্যদের এইরূপ বলিয়াছিলেন, যে তিনি যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, তখন একবার কাশীধামের বিখ্যাত তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন স্বামীজী ও তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় স্বামীজী বিজয়কৃষ্ণের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আস্নান কর' এবং ধরিয়া স্নান করাইলেন। পরে বলিলেন—'তোকে দীক্ষা দিব'। বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী, গুরুবাদ মানেন না বলিয়া প্রতিবাদ করিলে স্বামীজী একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান করিয়া বলেন উহা রীতিমত দীক্ষা নয়—তাঁহার উপর ভগবানের যে আদেশ ছিল তাহাই তিনি পালন করিলেন। তাঁহার সত্যকার গুরুর সাক্ষাৎ পরে মিলিবে। এক মহাযোগী বিজয়কৃষ্ণে কি দেখিয়াছিলেন তিনিই জানেন, তবে বিজয়কৃষ্ণের পরবর্তী জীবনের পটভূমিতে এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে।

বারো

কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া ব্রাহ্মবিবাহ বিধি-বদ্ধ করিবার মানসে আন্দোলন চালাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি ভারত সংস্কার সভার বিবিধ শাখায় পূর্ণমাত্রায় কার্য আরম্ভ করেন। সাধারণ্যে অল্প মূল্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা প্রচার, নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং দরিদ্র অক্ষম ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য দাতব্য বিভাগ খোলা হইল। এই সভার হইয়া বিজয়কৃষ্ণ বেহালায় যে জনসেবার কাজ করেন তাহা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। এই সম্বন্ধে আচার্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থে আছে, "এই সময়ে বেহালা এবং পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। গবর্ণমেন্ট জ্বররোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তা বিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভারতসংস্কার সভা এ সময় উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। এই সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার শ্রীমান গোপালচন্দ্র বসু এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুকড়ি ঘোষ সপ্তাহে দুদিন বেহালায় গমন করিতেন। তিনদিনের উপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যাইতেন। এই দুইদিন তাঁহাদিগকে প্রায় সমুদায় দিন উপবাসী থাকিয়া রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিতে হইত। তাঁহারা প্রাতে সাতটার সময়ে গিয়া অপরাহ্ণ তিনিটা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ইহাঁরা দেড় মাসের মধ্যে এক হাজার পাচশত আটাত্তর জন রোগীকে ঔষধাদি বিতরণ করেন।" এ ছাড়া বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য নির্বাহ করিতেন, বস্তুতঃ এই স্ত্রী বিদ্যালয় বা বয়স্থা বিদ্যালয় ছিল বিজয়কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে। বাৎসরিক রিপোর্টে এইরূপ পাওয়া যায়, "The Bengali department has been managed by Bijay Goswami throughout the season (1871). In eonsequence of increased duties Pandit Aghorenath Gupta was appointed to assist him. The manner in which the two gentlemen specially the former, discharged their duties, is beyond praise and therefore this Committee herewith thanks them for their invaluable services. (Dr. P. K. Sen কৃত Biography of a Faith হইতে উদ্ধৃত ৷ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে বিজয়কৃষ্ণের এই সময়ের অমানুষিক পরিশ্রমের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন, ১৭৭১।৭২ সালে ভারত সংস্কার সভা ও তদধীনে দাতব্য বিভাগ ও বয়স্থা বিদ্যালয় ও ভারত আশ্রম স্থাপিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্যজ্ঞান না করিয়া

বয়স্থা বিত্যালয় ও বেহালা নামক গ্রামের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দাতব্য ঔষধ বিতরণ কার্যে প্রধানরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও উপাসনান্তে ঔষধাদি লইয়া ছয় সাত মাইল উত্তীর্ণ হইয়া বেহালা গ্রামে ঔষধাদি বিতরণ করিতে যাইতেন। সেখান হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা কি ১টার সময় আসিয়া আহার করিতেন, আহারান্তে দুইটার পর বয়স্থা বিত্যালয়ের পাঠনা কার্যে রত হইতেন। তৎপরে অনেকদিন দেখিতাম রাত্রে মেয়েদের জন্য পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আমি বার বার সতর্ক করিতাম, তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এইরূপ শ্রম আর কতদিন সয় ? একদিন বুকে একপ্রকার বেদনা লইয়া গোঁসাইজী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বুকের ব্যথা থাকিয়া গেল। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন, Bijay figured prominently for rendering medical aid. Bijay Goswami worked so hard in this connection that he permanently undermined his health and remained almost an invalid ever since. শেষের মন্তব্যটুকু বেশ একটু অতিরঞ্জন কারণ বিজয়কৃষ্ণ ইহার পরও প্রায় ২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ভগবৎ প্রাপ্তি ও ভগবৎ প্রচারের জন্য যে কর্মশক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা একজন invalid বা চলচ্ছক্তি রহিতের পক্ষে ত সম্ভব নয়ই, একজন নিটুট-স্বাস্থ্য যুবককেও তাহা লজ্জা দেয়। তবে ইহা সত্য যে এই অপরিমিত পরিশ্রমে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র সেই সময় হইতে দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং তখন হইতে মধ্যে মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন যাবৎ মূর্ছা যাইতে থাকেন এবং দু একবার জীবন সংশয়াপন্ন হয়। তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার চিবার্স সাহেবের উপদেশ অনুসারে সেই হইতে বিজয়কৃষ্ণকে এই মারাত্মক ব্যাধির সাময়িক উপশমার্থে মরফিয়া সেবন করিতে হয়। পরে এক সাধুর দেওয়া ঔষধে তাঁহার রোগের অনেকখানি উপশম হয়।

কেশবচন্দ্রের প্রবর্তিত সুলভ সমাচারের সহিতও বিজয়কৃষ্ণ যুক্ত ছিলেন। তবে উহাতে বিজয়কৃষ্ণের কত লেখা এবং কি কি লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার খোঁজ এখনও কেহই করেন নাই। বিজয়কৃষ্ণ নীতির ব্যতিক্রম সহ্য করিতে পারিতেন না, অথচ ব্রাহ্মধর্মে অনেক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নীতির বাঁধন মানিতে অরাজী ছিলেন এবং মদ্যপান করা অব্রাহ্মোচিত ব্যবহার মনে করিতেন না। বঙ্ক কর মহাশয় তাঁর বিজয়কৃষ্ণ জীবনীতে লিখিয়াছেন, "গোস্বামী মহাশয় সুলভ সমাচারে তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ বাহির করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের সহিত ইহাঁর এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয়। তাঁহারা

এজন্য কেশবচন্দ্রের নিকট অভিযোগ করেন। ইহার পর গোস্বামী মহাশয় সুলভ সমাচারের সংস্রব পরিত্যাগ করেন।" বিজয়কৃষ্ণ সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিরূপ অভিযান চালাইতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রেরিত পত্রখানি হইতে কিছু বুঝা যাইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন হইল রঙ্গপুর আগমন করিয়াছেন। তিনি বিগত ২৪শে শ্রাবণ জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতার সামঞ্জস্য বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতে সুরাপান, ব্যভিচার, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি কুৎসিত কার্যের বিরুদ্ধে এবং ধর্মশিক্ষার অনুকূলে অনেক কথা জীবন্তভাবে বর্ণনা করেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া অত্রস্থ মুনসিফ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বিতীয় একটি সভা ২৭শে শ্রাবণ আহ্বান করেন, এবং তাহাতে তিনি সুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি সভ্য সমাজে প্রচলিত আছে, সুতরাং তাহাতে লোকের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না, অতএব তাহাতে হস্তক্ষেপ করা আমাদের অনাবশ্যক এবং ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না, কেন না ধর্ম পৃথিবীতে অশান্তি অসদ্ভাব আনয়ন করে ও ধর্মেতে বাস্তবিক কিছুই নাই, ধর্ম কেবল তোমার কথা সত্য নহে —আমার কথা সত্য ইত্যাদি মনুষ্যের মনের কল্পিত বিধান মাত্র ইত্যাদি নাস্তিকতা পোষক নানা কথা ব্যক্ত করেন।

৩১শে শ্রাবণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্মের সহিত অন্যান্য ধর্মের সম্বন্ধ বিষয়ক আর একটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তবাবু গোপালচন্দ্র বসু মুনসেফ মহাশয় ও শ্রীযুক্তবাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার উকীল মহাশয় ইঁহারা উভয়ে এই বক্তৃতারও প্রতিবাদ করেন। ইঁহাদের সহযোগী আরও কতকগুলি লোক কেহ হাসি কেহ বিদ্রূপ ও মুখভঙ্গি প্রভৃতি কুচেষ্টা দ্বারা উপস্থিত কার্যে নানাপ্রকার বিঘ্ন আনয়ন করিতেছিলেন। × × নাস্তিকতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি কুৎসিত বিষয়কে যাঁহারা স্পষ্টরূপে সমর্থন করেন ও উপদেশ দেন তাঁহাদের উপর কোন সামাজিক শাসন স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। (ধর্মতত্ত্ব, সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)

নীতির শৈথিল্যের সহিত কোনরূপ আপস করিতে না পারায় বিজয়কৃষ্ণ তথা প্রচারকগণ কলিকাতার কোন কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। বিবাদের প্রধান কারণ স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে মতামত। এ বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণ নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য। কতকগুলি ব্রাহ্ম এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিলেন যে, "ব্রাহ্মিকাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরের যবনিকার অভ্যন্তরে বসিতে দেওয়া উচিৎ নহে। তাঁহারা বাহিরে পুরুষদিগের সঙ্গে বসিবেন। যদি ভ্রাতা-

ভগ্নী একসঙ্গে উপাসনা করিতে না পারি, তবে আমরাও মন্দিরে উপাসনা করিতে গমন করিব না।” আচার্য মহাশয় (কেশবচন্দ্র) এ প্রস্তাবে আপত্য করিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য প্রকাশ্য স্থান নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এই অবকাশে প্রস্তাবকারীগণ স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইয়া পৃথক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন।… ……দেবেন্দ্রবাবু রাজনারায়ণ বাবুকে ঐ সমাজের উপাচার্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মেরা পৃথক হইয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রচারকদিগের দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্ম পূর্ব হইতে প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগে মন্দির ত্যাগী ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচারকদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রচারকগণ ধর্মের অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সাধারণের দুর্বলতা উল্লেখ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য অনেকেই মনে মনে বিরক্ত থাকেন, সময় পাইলেই মনের ভাব প্রকাশ করেন।……অনেকে মনে করিতে পারেন যে প্রচারকগণ স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী নহেন, তবে তাঁহাদিগের সহিত স্ত্রী স্বাধীনতা-প্রিয় ব্রাহ্মদিগের বিবাদ হইল কেন ? প্রচারকগণ স্ত্রী স্বাধীনতা বিরোধী নহেন। তাঁহারা বলেন স্বাধীনতা অন্তরে, স্বাধীনতা বাহিরে নহে। মন জ্ঞান-ধর্মে-সমুন্নত না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতিকে প্রথমে জ্ঞানধর্মে উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞান-ধর্মের উন্নতিদ্বারা কর্তব্যবুদ্ধি বলবতী হইলে, বিবেক প্রস্ফুটিত হইলেই স্ত্রীজাতি স্বাধীনভাবে সকলকার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। জ্ঞান ধর্মের উন্নতি না হইলে মন নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বাধীনভাবে, ধর্মভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। বিলাসিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতার নাম লইয়া স্ত্রীজাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী করা উচিত নহে। স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর গালি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।” (ব্রাহ্মধর্মের বর্তমান অবস্থা) বিজয়কৃষ্ণের কথাগুলির যাথার্থ্য অনুধাবনযোগ্য এবং প্রায় শত বৎসর পর ইহাদের মূল্য আজিও এতটুকু কমে নাই। উভয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে তৈরী না হইয়া স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিশ্রণ সমাজকে কলুষিতই করিয়া থাকে ইহা বিজয়কৃষ্ণ শেষ জীবন পর্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক আমরা এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রতিপক্ষীয় দলের কথা হিসাবে ইহার মূল্য আছে। শিবনাথ লিখিতেছেন, “এই সময়ে স্ত্রীস্বাধীনতা

আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস রজনীনাথ রায় প্রভৃতি তাহার মুখপাত্ররূপ হইলেন। অন্নদাচরণ খাস্তগির, দুর্গামোহন দাস ইহাঁরা উভয়ে হঠাৎ এই মন্দিরে পরদার বাহিরে সস্ত্রীক বসিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা লইয়া উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণের মধ্যে আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। তখন ইঁহারা মন্দির ত্যাগ করিয়া প্রথমে বহুবাজার ষ্ট্রীটে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে, তৎপরে অপর স্থানে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তদ্ভিন্ন অবলাবান্ধব পত্রিকাতে মহা তর্কবিতর্ক চলিল। কেশববাবু বিপদে পড়িলেন। কোন দলের মুখ রক্ষা করেন। আমিও বিপদে পড়িলাম। কারণ স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষীয়েরা তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে আমাকে উপাসনা করিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ এবং তাঁহারা সকলেই আমার আত্মীয় বন্ধু ·····কি করিয়া অনুরোধ অগ্রাহ্য করি। আমি তাঁহাদের সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে কেশববাবু বিরক্ত হইলেন কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু প্রচারক মহাশয়রা আমাকে ঠাট্টা তামাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।" শেষ বেলা স্থির হয় যে সঙ্গীত জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পূর্ব দিকে মহিলাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকিবে। পুরুষ ও নারীগণের ব্যবধান জন্য মধ্যে একটি কাষ্ঠ নির্মিত রেলিং থাকিবে। এই আন্দোলন ব্যপদেশে বিজয়কৃষ্ণ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে ধর্মতত্ত্বে এক পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের আরম্ভ এইরূপ, "সবিনয় নিবেদন. ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকগণ লইয়া আপনি ও মিরার সম্পাদক যেরূপ আন্দোলন করিতেছেন তাহা আমার নিকট ভাল বোধ না হওয়াতে আমার মনের ভাব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি। অনুগ্রহপূর্বক পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। মিরার সম্পাদক প্রচারকদিগের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ না করিয়া সহ্য করাই ভাল ছিল।" বিজয়কৃষ্ণের মনে প্রচারকের আদর্শ বস্তুতঃ কি ছিল এই পত্র হইতে তাহা বুঝা যায়। গালির উত্তরে গালি, এমন কি তাহার প্রতিবাদও তিনি তখন হইতেই অন্যায় বোধ করিতেন। "সাধারণ লোকে প্রচারকদিগকে মূর্খ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করাতে প্রচারকের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে। প্রচারকদিগকে গালি দিউক কিম্বা প্রহার করুক, তাঁহারা অম্লান বদনে সহ্য করিবেন। যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য দয়াময় পিতার নিকট সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে।" ইহার অপেক্ষা মহান আদর্শ আর কি হইতে পারে!

পূর্বে উল্লিখিত ভারত সংস্কার সভার আর একটি কার্য্য ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা। বঙ্ক কর মহাশয়ের মতে ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোস্বামী মহাশয়

কেশবচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী জয়গোপাল সেন মহাশয়ের বেলঘরিয়া উদ্যানে ভারত আশ্রম সংস্থাপিত হয়। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করা, সকল ব্রাহ্ম পরিবারকে এক পরিবারে গ্রথিত করা এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল। কেশবচন্দ্রের মতে, "পরিবার এক, একজনের সঙ্গে যদি প্রকৃত স্বর্গীয়ভাবে মিলন হয়, তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে। বাস্তবিক দুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না—দুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ?···আমি, তুমি তিনি এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলে এক হইয়া যাইবে, ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা।" এই মহৎ উদ্দেশ্য যে বিজয়কৃষ্ণের সম্পূর্ণ মনোগত ছিল তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে—"একাকী ধর্মসাধনা করিলে মুক্তি হয় না। সকলে এক পরিবারবদ্ধ হইয়া পরিত্রাণার্থী হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে হইবে। একাকী ধর্মপথে গমন করা স্বার্থপরতা।" এই এক পরিবার স্থাপনের উদ্দেশ্যে আশ্রমবাসীগণ যেরূপভাবে জীবনযাপন করিতেন তাহার আভাস নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে।

"প্রতিদিন প্রাতে একজন বন্ধু আশ্রমবাসীগণের দ্বারে নাম কীর্ত্তন করিতেন, সেই নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। উদ্যানে বাহির ও অন্দর মহল দুইই ছিল। প্রাতে অন্তঃপুর সংলগ্ন পুষ্করিণীতে মহিলাগণ, বহিঃস্থিত পুষ্করিণীতে পুরুষগণ একত্র মিলিত হইয়া স্নান করিতেন। স্নানান্তে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণপূর্বক উপাসনাগৃহে সকলে সমবেত হইতেন। একদিকে নারীগণের জন্য অপর দিকে পুরুষগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি উপবেশন করিলে, কেশবচন্দ্র আচার্য্যের কার্য্য নির্বাহ করিতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া যখন ভগবানের চরণতলে গমন করিতেন, তখন সমুদয় গৃহ স্বর্গের শোভায় পূর্ণ হইত। আশ্রমে একবার যাঁহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সে স্বর্গের ভাব কোন দিন জীবনে বিস্মৃত হইবেন না। উপাসনান্তে নারীগণের নির্দ্দিষ্টস্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের নির্দ্দিষ্টস্থানে পুরুষগণ একত্র ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে যাঁহার যাহা দিবসের কর্ত্তব্য, তাহাতে নিযুক্ত হইতেন। অপরাহ্নে সকলে সমবেত হইয়া সৎপ্রসঙ্গে সুখে সময়ক্ষেপ করিতেন। সে সময়ে নরনারীর মুখে যে কি এক উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ স্বর্গীয় নবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।" (আচার্য্য কেশবচরিত)

এই ভারত আশ্রম পরে কিছুদিনের জন্য কাঁকুড়গাছিতে উঠিয়া যায় এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে উহা গোলদিঘির দক্ষিণে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসে। উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও আশ্রমবাসিগণ সকলে এই আদর্শের সমকক্ষ হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে নানারূপ বিরোধ ও কলহ দেখা দিতে লাগিল। গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের কথায় "অপরের কথা দূরে থাকুক, প্রচারকবর্গ পরস্পর হইতে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সংবৎসর কাল প্রচার সভায় একটি নির্দ্ধারণ নিবদ্ধ হইতে পারে নাই।" ঐ সময়ে কেশবচন্দ্র এক পত্রে লেখেন, "বিশেষতঃ অমৃত, কান্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়জনের মধ্যে যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। যাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার ঐ দণ্ড। আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব।" পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধের দরুন ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল মহাশয়কে আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতে হয় এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অধিকাংশ প্রচারক মহাশয়ের মনের মিল ছিল না। আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে বিরোধ কত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ হরনাথ বসু সংক্রান্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "ঐ সময়ে আমার স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মভ্রাতা হরনাথ বসু মহাশয় সপরিবারে ভারত আশ্রমে থাকিতেন। হরনাথবাবু মনখোলা, মহোৎসাহী মানুষ ছিলেন। আয় অল্প ও ব্যয় বহু হওয়াতে তাঁহার আয় ব্যয়ের সমতা কখনই ছিল না। তিনি সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু দেনদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আশ্রম হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে নিজের শ্বশুরবাড়ী প্রেরণ করা স্থির করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় আশ্রমে দেখা দিয়া যাইতে পারিলেন না। একদিন তাঁহার পত্নী বিনোদিনী পুত্র কন্যাসহ গাড়ী করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশক্রমে ভৃত্যেরা আসিয়া গাড়ী অবরোধ করিল। দেনা শোধ না করিলে গাড়ী যাইতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; এবং আপনার গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হরনাথবাবু উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনীর নাম দিয়া এই ঘটনার বিবরণ ব্রাহ্মবিরোধী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেন। × × উন্নতিশীল দলের এক ব্রাহ্মযুবক আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক ঘোর কুৎসাপূর্ণ পত্র ঐ কাগজে প্রকাশ করিলেন। তখন কেশববাবু

বাধ্য হইয়া ঐ কাগজের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন।" এই ঘটনা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে ঘটিয়া থাকিবে। এই মানহানির মামলা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল নিষ্পত্তি হয়। সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ বিচারকের উপদেশমত অনুতাপপূর্বক অপবাদ প্রত্যাহার করেন। এই সকল হইতে প্রমাণিত হইবে যে সুখী পরিবার বা এক পরিবার স্থাপনের চেষ্টা প্রায়শঃ ব্যর্থ হইল। ভারত আশ্রমের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের উচ্চ আশা থাকিলেও, বাধা বিপত্তির সম্বন্ধে আশঙ্কাও ছিল তাঁর যথেষ্ট। তিনি লিখিয়াছেন, "ভারত আশ্রমকে দয়াময়ের বিধান বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহার মহত্ত্ব অনুভব করা যায় না। স্বর্গের মহৎ সত্যও মনুষ্যের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়া যায়। আমরা যদি চেষ্টা না করি, তবে ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। সুতরাং ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" (ব্রাঃ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা) আশ্রমবাসিগণের দোষেই ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য সমূহরূপে সফল হয় নাই তাহা দেখিলাম।

উল্লিখিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইতে কিছুটা আরোগ্যলাভ করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ দিনাজপুর, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। রঙ্গপুর ভ্রমণের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। কুচবিহারে পুনরায় পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া শান্তিপুরে কিছুদিন বাস করেন। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বিজয়কৃষ্ণ কেশব সেন মহাশয়ের সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে যাত্রা করেন। গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আচার্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, দীননাথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন।" কেশবচন্দ্রের সহিত এই বারের ভ্রমণ কালেই হয়ত কয়েকটি খৃষ্টান পাদ্রীগণের সহিত এলাহাবাদে তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধীয় বাক্ বিনিময় হয়। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে খৃষ্টীয় ধর্মের ক্রমিক বিস্তার এদেশে বাধাপ্রাপ্ত দেখিয়া এই পাদ্রীগণ এই খ্যাতনামা ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের নিকট খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে অভিলাষী হন। ধ্যানমগ্ন বিজয়কৃষ্ণের নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ধর্ম কি, তাহার উৎপত্তি কোথায়, আত্মা কি, সত্য কি এবং পাপ ও মায়াই বা কি? পাদ্রীগণ বুঝিল যে জাতি অধ্যাত্মজগতের এই সকল দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের আলোচনা করে, সে জাতি বহিরাগত ধর্মশিক্ষকের অপেক্ষা রাখে না। পরে কেশবচন্দ্র অনবদ্য ইংরাজিতে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্মের মর্মকথা বুঝাইয়া দিয়া সসম্মানে বিদায় দেন। এ

বৎসরও কঠিন পীড়ায় বিজয়কৃষ্ণের জীবন সংশয়াপন্ন হয় কিন্তু চিকিৎসা সেবা ও ভগবৎকৃপায় কোনক্রমে জীবন রক্ষা হয়। বারংবার এইরূপ মারাত্মক পীড়ার আক্রমণও বিজয়কৃষ্ণের ধর্মান্বেষণকে এবং ধর্মপ্রচারকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। এ দফায় তাঁহারা ২৮শে নভেম্বর কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।

তেরো

পশ্চিম হইতে ফিরিবার পর বিজয়কৃষ্ণের কলিকাতা বাস একটানা ছিল না বলিয়া মনে হয়, তবে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে কলিকাতা আসিতেন তাহা স্থির। নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়" পুস্তিকার পরিশিষ্টে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বিজয়কৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটির শিরোনাম ও তারিখ এইরূপ,—উপাসনার প্রয়োজনীয়তা ১৬ই আগস্ট ১৮৭৪, তিনি কোথায় ২৩শে আগস্ট ১৮৭৪, আত্মার দীনতা ঐ, ধর্মসাধনের আবশ্যকতা ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪, ভক্তির ধর্ম ১৪ই নভেম্বরই ১৮৭৫, নাম সংকীর্তন ও প্রকৃত ভক্তি ২৩শে জানুয়ারী ১৮৭৬। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি কোন স্তরে গিয়া পৌঁছাইয়াছিল তাহা জানিবার পক্ষে এই উপদেশগুলি বিশেষ মূল্যবান। 'উপাসনার প্রয়োজনীয়তায়' তিনি বলিতেছেন, "উপাসনায় যাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা, তাঁহার নিকট কেবল দয়াময় নামটি উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার মন প্রেমরসে গলিয়া যাইবে। উপাসনা আত্মার অন্নপান হইবে, ক্রমে ক্রমে উপাসনা এতদূর আয়ত্ত হইবে যে প্রতি নিঃশ্বাসে উপাসনা হইবে।" পরবর্তী যুগের শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপের ইহাকে অঙ্কুর বলিতে হয়। "তিনি কোথায়" বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন, "আমাদের উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া তিনি আসিয়াছেন, এখন কি আমরা নির্দয় হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব? যদি পিতাকে ডাকিয়া আমরা তাঁহার অপমান করিতে পারি, তবে এখনই আমরা বিনষ্ট হইয়া যাইব। (এ সমুদয় কথা বলিতে বলিতে ভক্তের হৃদয় গূঢ়রূপে স্বর্গীয় গাঢ় প্রেমে দ্রবীভূত হইতেছিল, বারংবার বাক্যরুদ্ধ হইতে লাগিল, এবং সেই সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্মিকা ভগ্নী এবং ব্রাহ্মভ্রাতাও স্বর্গীয় প্রেমের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।)" বন্ধনীর মধ্যে পরিবেশিত এই খবরটুকু বিশেষ মূল্যবান। যে ভাবতরঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ পরবর্তী জীবনে তাঁহার শ্রোতা ও ভক্তদিগকে ভাসাইয়া দিতেন, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেই তাহার সূচনা দেখি। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিলে এই গাঢ়ভাব আসে না।

আত্মার দীনতা শীর্ষক উপদেশে তিনি ঈশ্বর দর্শনের কথাই স্বীকার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন, "এই পাপ হৃদয়ে দয়াময় আজ আশাতীত সুখ দিলেন। প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখিলাম।" বিজয়কৃষ্ণ ফাঁকা কথা বলিবার লোক ছিলেন না, সুতরাং তিনি যখন বলিলেন, প্রাণেশ্বরকে দেখিলাম, তখন বুঝিতে হইবে যে তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ঈশ্বর দর্শন করিলেন। তবে বিজয়কৃষ্ণ অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নন, তিনি চান, "এই যিনি প্রাণকে অধিকার করিলেন তাঁহাকে কি প্রকারে চিরকাল হৃদয়ে রাখিব?" এই প্রশ্নের উত্তর তিনি এক মলিন-বেশধারী প্রাচীন সাধকের নিকট যাহা পাইলেন তাহা এই যে "তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিবার জন্য যদি কোন উপায় থাকে তবে তাহা আত্মার দীনতা।" তৃণের ন্যায় নীচু হইবার সাধনাও এখন হইতে বা ইহার পূর্ব হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছে। ধর্ম যে অর্জনের বস্তু, ইহার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হয়, "ধর্ম সাধনার আবশ্যকতায়" বিজয়কৃষ্ণ তাহা অত্যন্ত জোর গলায় বলিতেছেন। "ধর্ম আন্তরিক বিষয়, তাহা অর্জন করিতে আয়াস আবশ্যক। সাধন ভিন্ন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, জীবন পবিত্র করা যায় না। × × × ধ্রুব চরিত্র পাঠ করিলে সাধনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্রাহ্মদিগের কোন লিখিত ধর্মশাস্ত্র নাই, অতএব তাঁহাদের আরও অধিক সাধনের প্রয়োজন। পুস্তক নাই বলিয়া অধিক সাধু সংসর্গ এবং অধিক আলোচনা আবশ্যক। সাধন না করিলে অন্তর প্রস্ফুটিত হয় না।" ইহা হইতে অনুমান করা যায়, কি গভীর সাধন তিনি করিয়াছেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আরও কত গভীর সাধনের জন্য তিনি প্রস্তুত। তিনি বলিতেছেন, সাধন দ্বারা তাঁহাকে উজ্জ্বল রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা কল্পনা কিম্বা অলঙ্কারের কথা নহে। জ্ঞানময়, প্রেমময় পবিত্র ঈশ্বর অন্তরে বর্তমান, দর্শন করিলে আর অবিশ্বাসী হইতে পারি না। বরং জগতের আর সকল বস্তু অসৎ হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দেখিলাম, এই সত্য ঘটনাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না।" বিজয়কৃষ্ণের জীবনীগুলিতে এই উক্তিগুলির যথোচিত মূল্য দেওয়া হয় নাই। যাবৎ। 'আত্মার দীনতায়' তিনি বলিলেন, তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়—অর্থাৎ তিনি উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন, কারণ তিনি পরেই বলিতেছেন দর্শন করিলে আর অবিশ্বাসী হইতে পারি না। বিজয়কৃষ্ণের অভিব্যক্তির বর্তমান স্তরটুকু স্মরণ রাখিয়া তাঁহার পরবর্তী জীবন আলোচনা করিতে হইবে। তিনি সর্বত্র সকলের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে যেন আমরা তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোনরূপ ভুল না করি। এই বক্তৃতায় আর একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে,—বিজয়কৃষ্ণ বলিতেছেন, "তাঁহার নামের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। দয়াময়, প্রেমসিন্ধু

অধমতারণ ইত্যাদি নাম সাধন, কিম্বা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রেমে মন বিগলিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য, তিনি এবং তাঁহার নাম একই পদার্থ।" বৈষ্ণবীয় নাম সাধন হইতে ইহার পার্থক্য বুঝিয়া উঠা দুরূহ। ভক্তির ধর্ম এবং নাম সংকীর্ত্তন ও প্রকৃত ভক্তি এই দুই উপদেশে তিনি চৈতন্যের ভক্তি এবং নামারাধনাকেই আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। নাম ও নামীর অভেদত্ব বিজয়কৃষ্ণ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন। অনেকে বলেন বিজয়কৃষ্ণ কখনই ব্রাহ্মধর্ম হইতে বেশীদূরে যান নাই, এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগের পর একেবারেই আমূল পরিবর্তিত হইয়া সনাতন হিন্দধর্মে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিকাশশীল জীবনকে পরস্পর-বিরুদ্ধ দুইভাগে ভাগ করিতে যাওয়ায় মুশকিল আছে। তাঁহার বিবর্তন একান্তই ক্রমিক, তিনি বৈজ্ঞানিকের মত খোলা মন লইয়া ঈশ্বর সন্ধান করিয়াছেন, এবং সেই বিচিত্র সন্ধান-পথে যখন যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সত্যতায় গত-সন্দেহ হইলে তাহাকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কল্পিত কোন মত বা বিশ্বাসকে সত্যের প্রবেশ-পথকে আটক করিতে দিতেন না বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহার জীবনের সব স্তরেই সকল কালের এবং সকল ধর্মের বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালেও যেমন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মের নাগালের বাহিরে সম্পূর্ণ উদার অসাম্প্রদায়িক এক ধর্মের খোজ এবং সাধন করিতে ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পরও মূলত তিনি আপনার অমানুষী সাধনলব্ধ উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মেরই সাধন করিয়া ছিলেন। উভয় অবস্থার মধ্যে যে সামান্য প্রভেদটুকু ছিল, তাহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এইখানে এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই প্রভেদটুকুও অতি-ধীর পদক্ষেপে আসিয়াছে।

পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের প্রথম দেখা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ। ইহার কিছু পূর্ব হইতেই কেশবচন্দ্রের মনে বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় এবং বেলঘরিয়ার উদ্যানের নাম তপোবন রাখা হয়। তবে এই মিলনের ফলে যে কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য সাধনের ইচ্ছা বলবত্তর হয় তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। এই মিলনের দিন বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ছিলেন না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট সাধনের নিয়ম সকল নির্ধারিত হয়—প্রচারকগণ স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনাদি সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবেন, কে কি করিবেন, সকল বিষয়েই ঐ দিন নিয়ম হয়। গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় যে কার্য বিভাগের তালিকা দিয়াছেন তাহাতে বিজয়কৃষ্ণের নাম নাই, সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে তখনও বিজয়কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হন নাই।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র সাধকগণের শ্রেণীবন্ধন সম্বন্ধে বক্তৃতা

দন এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী (বিজয়কৃষ্ণের শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী) পরিচারিকা ব্রতের সংযম বিধি গ্রহণ করেন। ইহার ছয়দিন পরে বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষার্থ সংযমব্রত গ্রহণ করেন। ঐ দিনই অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ও যোগ-শিক্ষার্থ ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত গ্রহণকে খুব বড় একটা ঘটনা বলিয়া আমি মনে করি না, কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ঐ সময়ে ভক্তিসাধনের পথে বিজয়কৃষ্ণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পক্ষে ভক্তিসাধনের প্রথম পাঠ হইতে শুরু করার প্রশ্নই আসে না। তবে সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে সাধনের প্রয়োজন ছিল, এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রধান প্রচারক হিসাবে বিজয়কৃষ্ণ যে সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন তাহা তাঁহার পূর্বোল্লেখিত 'ধর্মসাধনের আবশ্যকতা' উপদেশটিই প্রমাণ করিতেছে। অথচ এ বিষয়ে বিরুদ্ধ মতেরও অভাব ছিল না, বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজের বর্তমান অবস্থা পুস্তিকায় ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, "কতিপয় ব্রাহ্ম বৈরাগ্যের ঘোর বিরোধী হইয়া কেশববাবুর নিন্দা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে বৈরাগ্য কেন? বৈরাগ্য কথাও যেন ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ না করে। খাও দাও আমোদ কর, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম কর, অত বাড়াবাড়ি কেন ?" এই অবস্থার প্রতিরোধ করিবার জন্যই সাধনভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়া থাকিবে এবং বিজয়কৃষ্ণও লোকশিক্ষার্থে এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, উদ্দেশ্য, তাঁহার ব্রত গ্রহণে প্রেরণা পাইয়া যাহাতে অন্যেও অনুরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হন। যাহা হউক, বিজয় জীবনে ঘটনাটি যখন ঘটিয়াছে তখন উহার বিশদ বিবরণ গ্রন্থজাত করা উচিত মনে করি। গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় তাঁহার আচার্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এই ব্যাপারে মূলতঃ তাঁহারই অনুসরণ করিব। অতি স্পষ্ট কারণের জন্য রায় মহাশয় অবশ্য বিজয়কৃষ্ণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে এই গ্রন্থে লেখক অনেক অন্যায় কটূক্তি করিয়াছেন। সেই সকলের কিছু কিছুকে আমাদের খণ্ডন করিতে হইবে। রায় মহাশয় লিখিয়েছেন, "কিছুদিন পূর্বে যখন ভক্তি ও যোগধর্ম শিক্ষার্থ দুইজন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয়, তখন গোস্বামী মহাশয় ভক্তি শিক্ষাভিলাষী হইয়া আচার্য্যের নিকট আবেদন করেন।" এই উক্তিটি স্পষ্টই পরস্পর বিরোধী। শিক্ষার্থীর যখন প্রয়োজন তখন গোস্বামী মহাশয়ের আবেদনের প্রশ্ন উঠে না, গোস্বামী মহাশয়ের প্রয়োজনেই গোস্বামী মহাশয়ের আবেদনের কথা উঠে। ভক্তি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হইলে যে কেশবচন্দ্রের বিজয়কৃষ্ণের কথা মনে পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ? বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু নিজে লিখিয়াছেন, কেশববাবু বৈরাগ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে পত্র লিখেন। ব্রাহ্মধর্মে

সেই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের স্থান সম্বন্ধে যিনিই সজ্ঞান, তিনি ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন। বন্ধু কেশবচন্দ্রের পরিকল্পনার প্রয়োজন সাধনেই বিজয়কৃষ্ণের এই ব্রত গ্রহণ ইহা স্বীকার করায় দোষ কোথায়? কেশবচন্দ্রের আহ্বানকে বিজয়কৃষ্ণের আবেদনে রূপান্তরিত করিয়া লাভ কি?

চৌদ্দ

যোগ ভক্তির সংযম ব্রত গ্রহণ সময়ে উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় ভক্ত্যার্থীর জন্য নিম্নলিখিত সপ্তদশ সংযম বিধি সংস্কৃতে পাঠ করেন,

প্রাতঃস্মরণং স্নানং নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে।
উপাসনা চ গ্রন্থেভ্যো বিবিধেভ্যো ধৃতস্য চ॥
ভক্তি-সম্বন্ধিনঃ শ্লোকাখ্যানাদেঃ পাঠ এব চ।
রন্ধনঞ্চান্নদানঞ্চ দরিদ্রভরণার্থকম্॥
ভক্তানাং প্রাণিনাং সেবা-তরুগুল্মাদিকস্য চ।
আহারোঽন্যহিতার্থঞ্চ শ্লোকাদেঃ পঠিতস্য চ॥
আবৃত্তি সৎপ্রসঙ্গশ্চ রহসি স্তবকীর্ত্তনম্
প্রার্থনা-কীর্ত্তনং দেশে সজনে ভক্ত সন্নিধৌ।
আশীর্বাচসমেতানি সংযমো ভক্তি সিদ্ধয়ে॥

এই নিয়ম পাঠের পর বিজয়কৃষ্ণ সংযম ব্রত স্বীকার করিয়া তৎপালনে পরম দেবতার আলোক ও সহায়তা ভিক্ষা করেন। কেশবচন্দ্র এই বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথকে ব্রত দান করেন, "তোমরা দুইজন একসময়ে সংসার ছাড়িয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। থাক্, পড়িয়া থাক সংসার, এই কথা বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। সেবার বাহ্যিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনায় নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী পরম ভক্ত ভাসেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য সর্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সেইস্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গম্ভীর বিধানের পরম দেবতা স্বহস্তে কার্য্য করিতেছেন বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের আদিবর্ণ হইতে শেষবর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তের। ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায়? সেই ঈশ্বর কোথায়?

সম্মুখে তাকাইয়া দেখ। বহুদূরে। এই পথ অতিক্রম করিয়া তোমরা সেইস্থানে যাইবে, তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে।

বিজয় এবং অঘোর, তোমরা সেখানে গিয়াও দেখিবে তোমাদের ইচ্ছা হইবে, আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাসনা কেবল তীর্থ ভ্রমণ। কতক দূরে গিয়া দেখিবে, আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এইরূপে কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কতবার শেষ করিতে হইবে তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড়লোক বলিয়া সম্মান করিব না। তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীদের পদতলে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে রাজবেশ দিব না, ধার্মিকদের মধ্যেও গণ্য করিব না। ব্রতদান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের মস্তকের উপর নহে, কিন্তু সকলের পদতলে। যতবার তাঁহাদিগকে দেখিবে, ততবার তাঁহাদের চরণ প্রথমে দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে, সেবার জন্য তোমরা ভৃত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয় সংযম অতি কঠিন কার্য্য; কিন্তু যে ইন্দ্রিয় সংযম না করে, সে মরে। যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দূর হও কাম রিপু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অসূয়া দ্বেষ, দূর হও সংসার চক্র, দূর হও মানাকাঙ্ক্ষা, দূর হও স্বার্থপরতা। ব্রহ্ম বলে বলী হইয়া এই কয়টিকে প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তপস্যা-ভূমির নিকটে আসিতে দিবে না। ব্রহ্ম শিখাইবেন কিসে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। এইরূপে ইহাদিগকে যদি দমন করিতে না পার, তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদিগকে সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন না হয়। প্রবল রিপু জয় করা উপহাসের কথা নয়। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর—ইহাদের যোগে অধিকার নাই। সর্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, এই দুইজন সমুদায় রিপু বিনাশ করিবার জন্য দৃঢ়রূপে সঙ্কল্প করিল। পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তোমরা জান না, আমিও জানি না, ঈশ্বরই জানেন কিসে মন দমন হয়। পৃথিবীর মধ্যে সার কর্ম মন দমন করা। স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি আসিয়া হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেয়। একান্ত মনে নির্ভর করিয়া থাক, রিপুকুল বশীভূত হইবে। হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একজন যোগ, একজন ভক্তিসাধন করিবে। প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরা জান না, আমিও জানি না। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহা প্রকাশ করেন। আমি

জানাইব তোমাদিগকে যখন তিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মন্ত্র আমার কথা দ্বারা তোমাদের কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে। যেখানে কণ্টক, সেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা ; স্ত্রী হউন, সন্তান হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্মভ্রাতা হউন, আপনার ব্রাহ্মিকা ভগ্নি হউন, বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যে কার্য্য করিলে, যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে ভক্তি-প্রসঙ্গ ভঙ্গ হয়, সেই কার্য্য ও তাহাদের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। যদি দশদিন কি একমাস কালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে। প্রলোভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। অন্যে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রতপালন করিতেই হইবে। মন যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশা মহাপাপ। দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ-পোষণের ইচ্ছা। সর্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস! পরস্পরের কাছে এমনভাবে থাকিবে যে, অন্যে বাধা দিলে আমরা ব্রতপালন করিব না, এরূপ নির্বন্ধ কদাপি করিবে না। এই নিগূঢ় বিধি সর্বদা অপরাজিত চিত্তে পালন করিবে। যদি আদেশ পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে। অন্যপ্রকার যদি অসদাচরণ হয়, তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্য পাঁচ প্রকার দোষ আছে বলিয়া বিধি—যাহা বাঁচিবার উপায় এবং ঔষধ—তাহার প্রতি কখনও যেন কোন প্রকার অযত্ন এবং অবহেলা না হয়।

ভক্তির অনেক প্রণালী, এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচজন ভক্ত একত্র হইয়াছেন, ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদায় ভক্তের লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা মনে করিবে ; সামান্য নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উথলিত হইবে। দিবসে রাত্রিতে ভক্তি তোমার স্বর্গ হইবে। ভক্তিতে আহ্লাদিত হইবে চির প্রসন্নতা ভক্তের লক্ষণ।

যোগধর্ম শিক্ষার্থী অঘোর, তুমি চক্ষু নিমীলন করিয়া এমনভাবে যোগাভ্যাস করিবে, যে শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে। ঘোর অন্ধকার দ্বিপ্রহর রজনীতে যোগের নিগূঢ়তা এমনই অনুভব করিবে যে তোমার সমস্ত প্রাণের স্রোত ভিতরে যাইবে। তুমি এখনও সেই প্রকার যোগ কর নাই যাহাতে সকল অবস্থাতে যোগ থাকে। যোগের এমন অবস্থা আসিবে যখন ধ্যান না করিলেও যোগ থাকিবে। যোগেশ্বরের শান্ত প্রশান্ত সুগম্ভীর মুখ তুমি দেখিবে।

নিমীলিত নয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তখন অন্তরে বাহিরে সর্বক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরমহংসের ন্যায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাকিয়াও সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে। এই সংসার মধ্যে হংসের ন্যায় কেবল সার গ্রহণ করিবে।

তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যোতির বার্তা আসিবে তাঁহারা তাহাতেই শিক্ষা লাভ করিবেন।

আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্মজ্ঞান বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া এই ধর্ম ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাঁহারা তোমাদের নিকটে আছেন তাঁহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন। কে বলিতে পারে কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন ?"

উভয়ে পাঁচদিন সংযম ব্রত পালন করিলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ উহাঁরা ব্রত গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত নিত্যকৃত্য ও মাসিক কৃত্য নিদৃষ্ট হয় :—

নিত্যকৃত্য

প্রাতঃ সংস্মরণং নাম সাধনোপাসনা তথা,
পাঠঃ কার্য্যং সৎপ্রসঙ্গো ভক্তবৃন্দৈশ্চ কীর্ত্তনম্।
নিদিধ্যাসন সংযুক্তশ্চিত্তস্য সংযমস্তথা,
এতানি নিত্যকৃত্যানি সাধনে ভক্তিযোগয়োঃ।

মাসিক কৃত্য

পিতরৌ ভক্ত পত্নীচ বিরোধি ভ্রাতরৌ তথা,
সন্ততি দাস দীনাশ্চ তথা চ পশুপক্ষিণঃ,
এতে সংসেবনীয়াঃ স্যুর্মাসাদৌতু যথাক্রমম্।

১০ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত উঁহাদিগকে যে বিশেষ ব্রত দেওয়া হয় :—
তাহা এই দুই শ্লোকে বিবৃত আছে—

ঋত্বে কুটুম্বিনী বৃদ্ধা বালিকাশ্চান্য যোষিতাম্
পশ্যেতং পদয়োর্নিত্যং বিনীতৌ শ্রদ্ধয়ান্বিতৌ।
এবং ব্রতধরৌ স্যাতং মাসমেকং যথাবিধি
জনক্ষেম বিধানার্থং পবিত্র প্রেম সিদ্ধয়ে।

৩০শে মার্চ তারিখে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় ভক্তি শিক্ষার্থীর অনুগমন প্রার্থী হইয়া ব্রত গ্রহণ করেন ১৩ই এপ্রিল তারিখে নিয়ম হয় যে ব্রত গ্রহীতৃগণ

নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসন লইয়া উপাসনা করিবেন। ২০শে এপ্রিল কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে বরণপূর্বক বলেন আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহারস্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুন।

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্ত-বিহারীকে প্রণাম করি।

কেশবচন্দ্র ইহার কিছুদিন পূর্বে কানন ব্রত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আপনার গৃহে দ্বিতলের উপরে একটি কুটির নির্মাণ করিয়া তিনি তাহাতে রন্ধন ও ভোজন করিতেন। এই কুটিরে ভক্তি ও যোগ শিক্ষার্থীর উপদেশ গ্রহণের স্থান হইল। প্রতিদিন অপরাহ্ণ হইতে উপদেশ আরম্ভ হইত। উপদেশের পর প্রার্থনা সংকীর্তন হইত। এই উপদেশ শুরু হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং ঐ বৎসরের ২৮শে জুলাই পর্যন্ত চলে। এই উপদেশগুলি কেশবচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থ ব্রহ্মগীতোপনিষদে আছে। ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশগুলির শিরোনামা হইতে পাঠকগণ উপদেশের বিষয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন। শিরোনামাগুলি এইরূপ, ভক্তিযোগ, ভক্তির সাধারণ ভূমি, সংযম, স্থৈর্য্য সাধন, সমতা সাধন, রিপুবলাবল নির্ণয়, ভক্তির মূল, পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক, কৃপা ও সাধন, সাধন ও করুণার ঐক্য, স্মৃতি, দর্শন, অশ্রু, ভক্তির উচ্ছ্বাস, মঙ্গলময়ের দর্শনে ফল, সুন্দরোপাসনা, জীবনগত ভক্তি, নিরবলম্বন ভক্তি, সততা, ভক্তি দুর্লভ কেন, নাম মাহাত্ম্য, জীবে দয়া, সেবার উপযোগী দুইটি বল, ভক্তি-সমুচিত বৈরাগ্য, নাম গ্রহণ, দৃষ্টি সাধন, ভাবের প্রাধান্য। উপদেশগুলির প্রকৃতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণার জন্য আমি মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তির নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

"হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। ভক্তি বিশ্বাসমূলক। সত্য শিব ও সুন্দর তিনেতে যিনি এক, ভক্তি তাঁহাকেই দেখে তাঁহাকেই চায়। ভক্তির মূল মন্ত্র 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'।

'তুমি আছ' শ্রদ্ধার সহিত, বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলি।' 'তুমি সুন্দর' ভক্তির সহিত এই কথা বলিয়া মত্ত হই।

যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ হইল। শুদ্ধ নীতিপরায়ণ হইলেই মানুষ ভক্ত হয় না।

ভক্তি আপনার পাপ পুণ্যের একটি নূতন শাস্ত্র নির্মাণ করে। ভক্তিরাজ্যের পাপ কি? শুষ্কতা। ভক্তিরাজ্যের পুণ্য কি? প্রেমের উচ্ছ্বাস। ভক্তিরাজ্যের স্বর্গ কি? সর্বদা প্রেম সরোবরে বাস করা। নরক কি? শুষ্ক মরুভূমি, যাহাতে একফোঁটা জল পাওয়া যায় না।

সাধনের আরম্ভে ব্যাকুলতার জল, সাধনের শেষে শান্তির জল। ক্রন্দনে ভক্তির আরম্ভ, হাসি ভক্তির চির লক্ষণ।

ঈশ্বরের কৃপাবারি অনেক আসিল, কিন্তু সেই কৃপাবারি রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই। উপর হইতে দেবপ্রসাদ যত আসিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধন করিলে সেগুলি আরও সবল হয়।

তুমি দাঁড় ফেল, কিন্তু দাঁড় ফেলিতেছ বলিয়া যে বায়ু পাইতেছ, তাহা নহে। যে সাধনা না করিয়া শুইয়াছিল, তাঁহার পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কাজ করিয়া অহঙ্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনি দরজা বন্ধ।

ষোল আনা না দিলে পাবে না; কিন্তু দিলেই যে পাবে তাহা নহে।

এক ফোঁটা অশ্রুপাতকেও এক সহস্র মুক্তা অপেক্ষা মহামূল্য জ্ঞান করিবে। অশ্রুপাত ভক্তিশাস্ত্রে মহামূল্য বস্তু।

যখন অহং পরিত্যক্ত হইল, তখন ঈশ্বর আসিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জগদ্বাসী লোক সকলও আসিল। জলপ্লাবনে আমিত্বের রাজ্য-বিপ্লব হইল।

ভক্ত চটে না কিন্তু ভক্তি চটে। নানান কারণে ভক্তি চলিয়া যায়। ভক্তি সপত্নী সহ্য করে না। সমস্ত হৃদয় ভক্তির হাতে দিতে হইবে।

বস্তু ছাড়া নাম নহে, নাম ছাড়া বস্তু নহে। নামকে সমাদর করা আর বস্তুকে সমাদর করা এক। ভক্তের পক্ষে নাম সাধন ঈশ্বরদর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নহে, বরং উৎকৃষ্টতর ব্যাপার।

ঈশ্বরকে ভালবাসিলেই জীবে দয়া এবং পরসেবা করিতে হয়। মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মের গন্ধ আছে বলিয়া মনুষ্যের প্রতি প্রেম যায়।

ভক্তিশাস্ত্র মতে আগে জগৎকে দিয়া যাহা থাকিবে তাহার দ্বারা আপনাকে এবং পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইবে।

ভক্তের দর্শন প্রেমের জন্য, ভক্তি শান্তির জন্য। ভক্তি উথলিয়া উঠিবে, এই অভিপ্রায়ে দর্শন, অতএব ভক্তের দর্শন উপলক্ষ মাত্র।

বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি। ভাবপ্রধান সাধক ভক্ত, বস্তুপ্রধান সাধকযোগী।

বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইলেও, মনে রাখিতে হইবে—প্রদত্ত উপদেশের ইহা নগণ্য অংশমাত্র। অঘোরনাথের জন্য যোগ সম্বন্ধে অনুরূপ উপদেশ দেওয়া হয়। আমাদের গ্রন্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পবিধায় তাহার আর উদ্ধার করিলাম না। সেই কালের প্রখ্যাত বাগ্মীর বাকচাতুর্য এই স্বল্প উদ্ধৃতি হইতেও বুঝা যাইবে।

পনের

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তি শিক্ষার্থীর নাম গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। "অদ্য আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের আশা, সাধনে সিদ্ধ হইয়া আমরা গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলে, পুনরায় একত্রে, মিলিত হইব"—এই কথা বলিয়া উভয়ে উভয়কে প্রণামপূর্বক কয়েকপদ একত্র গমন করিয়া, পুনরায় একত্র কুটীরে প্রবেশপূর্বক বিজয়কৃষ্ণ নাম গ্রহণার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেন; অঘোরনাথ কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করিলেন। কেশবচন্দ্র 'হরিসুন্দর' এই নাম স্বয়ং প্রথমে তিনবার, পরে দশবার অনুচ্চস্বরে বিজয়কৃষ্ণের নিকট উচ্চারণ করিলেন এবং ঐ নাম বিজয়কৃষ্ণের দ্বারা উচ্চারণ করাইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে কিয়ৎকাল জপ করিতে বলিলেন। জপ সাধনান্তে এই ভাবে উপদেশ দিলেন, "এই নাম চক্ষে কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনায় রসাস্বাদ গ্রহণ করিবে, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে রাখিবে, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতরে রাখিবে। এই নামে আপনি বাঁচিবে, এই নামে পাপীকে বাঁচাইবে। নাম সর্বস্ব। ইহকাল পরকালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নামকে সার কর।

হে গতিনাথ, তোমার নাম কি জানিলাম না, তোমার নাম আস্বাদন করিতে দাও। নামই স্বর্গ, নামই বৈকুণ্ঠ, নাম পরাইয়া দাও। এস হে দয়াল পরমেশ্বর, নাম হার করিয়া দাও। তোমার শ্রীচরণ তলে আমরা প্রণাম করি।"

উপদেশ দান শেষ হইলে কেশবচন্দ্র কিছুদিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে যান। শ্রীযুক্ত কান্তি মিত্রকে লিখিত ৯ নভেম্বরের পত্রে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিজয় কেমন? বিজয়কৃষ্ণ তখনও কলিকাতায়।

ইত্যবসরে রিসড়া রেলস্টেশনের নিকটবর্তী মোড়পুকুর গ্রামে একটি উদ্যান ক্রয় করিয়া কেশবচন্দ্র ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সাধনকানন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্বে এইরূপ লিখিত হয়, "কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যস্থলে লৌহবর্ত্মের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটি অতি নিভৃত, বিবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষলতাদ্বারা পরিশোভিত। কতিপয় ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনা-স্থল, তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় স্থানে সাধনের স্থান মনোনীত করা হইয়াছে। চতুর্দিক তরুরাজিতে বেষ্টিত, মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র সরোবর, নানাজাতীয় পক্ষীগণ এখানে মধুরস্বরে গান করে। বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনের নির্ঘোষ শব্দ ব্যতীত অন্য কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না।"

এই সাধনকাননে জীবন যাপন সম্বন্ধে 'মিরারে' এইরূপ ভাবে লিখিত হয়; "অল্পদিন হইল যে উদ্যান ক্রয় করা হইয়াছে তাহাতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামীগণ প্রাচীনকালের অথচ নূতন ধরণের জীবন যাপন করেন। তাঁহারা বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন এবং ব্যাঘ্রচর্মের উপরে বসিয়া প্রাতঃকালে একযোগে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই উপাসনা আড়াই ঘণ্টার কমে হয় না। উপাসনার পর তাঁহারা রন্ধন করেন এবং দু' প্রহরের মধ্যে তাঁহাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হয়। আহারের পর অর্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া একঘণ্টাকাল তাঁহারা সৎপ্রসঙ্গ করেন। অতঃপর কেহ কেহ লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজ করিয়া থাকেন। অপরাহ্নে জল তোলা, বাঁশ কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পোঁতা, গাছ সরাইয়া দেওয়া ও জল সেঁচা, তাঁহাদের কুটীর প্রস্তুত করা, নানাস্থান পরিষ্কার করা, এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। কেউ উন্মুক্ত মস্তকে কেউ মাথায় ভিজা গামছা বাঁধিয়া, রৌদ্রে খুব পরিশ্রম করেন। ছয়টা পর্য্যন্ত এইরূপ কার্য্য করিয়া অর্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর সকলে নির্জন সাধনে গমন করেন। সন্ধ্যা ঘনীভূত হইলে তাঁহারা সংকীর্তন আরম্ভ করেন। তারপর গ্রামকীর্তনে বাহির হইয়া গরীবদের কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কল্যাণার্থে কীর্তন ও প্রার্থনা করেন।" সাধন কাননস্থ সাধকগণ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন কাননব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রতে কতকগুলি বিধি নিষেধ ছিল। বিধি যথা—ফুল ফল গাছের সেবা, কানন পরিষ্কার রাখা, শাস্ত্র বচন কণ্ঠস্থ করা, বন্ধুদিগকে ধর্মের উপদেশ দিয়া পত্র প্রেরণ এবং কতকগুলি প্রতিজ্ঞা পালনে সাধ্যমত চেষ্টা। প্রতিজ্ঞা যথা—অহঙ্কার মনে আসিতে না দেওয়া, নারী সম্বন্ধে কুচিন্তা না করা, মিথ্যা না বলা ইত্যাদি। নিষেধ যথা—আলস্য, দিবানিদ্রা, পর নিন্দা ইত্যাদি। এখানে বিজয়কৃষ্ণের উপর ঘাট ও উপাসনাস্থান পরিষ্কারের বিশেষ ভার পড়ে। বর্ষার প্রাদুর্ভাবে সাধনকানন

ত্যাগ করা হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই ব্রাহ্মভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ এই কাননেই অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ এই শ্রাদ্ধে উপাসনা করেন। পূর্বে লিখিত যোগ ভক্তির কিছু উপদেশ এই সাধনকাননেই দেওয়া হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবের পূর্বেই কেশবচন্দ্র পশ্চিম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাঘোৎসব ব্যপদেশে এই সাধনকাননে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। 'আচার্য্য কেশবচন্দ্রে' এই উৎসব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৭৭, × × × তদনন্তর বৃক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সদালাপ হয়। পরে পুষ্করিণীতটে সকলে একত্রিত হইলে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যোগ ও ভক্তি সাধন বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।" বিজয়কৃষ্ণের এই ভক্তি সাধন উপদেশটি "ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা" পরিশিষ্ট হিসাবে নববিধান সমাজ হইতে ছাপা হইয়াছে। এই রচনাটি হইতে বুঝা যায় যে বিজয়কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যকেই ভক্তিপথের আদর্শ করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, প্রেমিক চূড়ামণি মহাত্মা চৈতন্য একজন জ্ঞানী হইয়াও প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষকে ভক্তিস্রোতে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। তারপর চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য চন্দ্রামৃত হইতে পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে যদিও কেশব সেন মহাশয়ের উপদেশে বাংলার নিজস্ব এই ভক্তিশাস্ত্রের কোনরূপ উল্লেখ নাই, তত্রাচ বিজয়কৃষ্ণ দেশীয় ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থাদি অজস্র পড়িতেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, গুরূপদেশ ও সাধন ভিন্ন নরনারীর অন্তরে ভক্তির উদয় হয় না। ব্রাহ্মসমাজে সাধনের অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ধর্ম-শিক্ষণীয় নহে, ইহা কিরূপে ব্রাহ্মগণ স্বীকার করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম-শিক্ষা প্রচলিত না থাকাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই সমান × × × উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট ধর্ম-শিক্ষা করিয়া মনুষ্য-জীবন সফল করিতে হইবে।" সাধারণকে ধর্ম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্য যে তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট ভক্তি শিক্ষার পাঠ লইয়াছিলেন, এই উক্তি হইতেও তাহার সমর্থন মিলে। বস্তুতঃ তিনি যখন ভক্তি শিক্ষা আরম্ভ করেন তাহার পূর্বেই তিনি যে ভক্তিপথে সাধারণের অনধিগম্য শিখরে পৌছাইয়া ছিলেন তাহার আভাষ আমরা পূর্বে দিয়াছি। এখন দেখিলাম সাধনের সময় তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যকেই আপনার আদর্শ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া প্রেরণা লাভ করিতেছেন। সুতরাং ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ যে আচার্য কেশবচন্দ্র হইতে উচ্চতর ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সেইজন্যই কেশবচন্দ্র ব্রত সমাপনান্তে যখন তাঁহাকে বলেন, যে তাঁহার ভক্তিলাভ হইয়াছে, তখন তিনি বিনীতভাবে অস্বীকার করেন।

উৎসবের মাসখানেক পর অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী রসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্বদা শুদ্ধ রাখিয়া পুণ্য সঞ্চয়, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঈশ্বরানুরক্ত হইয়া অল্পে সন্তুষ্ট, ভোগ বাসনা ত্যাগ, ১লা মার্চ ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি কর্তব্যসাধন এই তিনটি ব্রত প্রদত্ত হয়। ৮ই মার্চ ব্রতের উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদিগকে কেশবচন্দ্র তাঁহাদের কর্তব্য বুঝাইয়া দেন। বিজয়কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কেশবচন্দ্র বলেন, "ভক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখনও অনেক বাকী আছে, অপার জলে ডুবিয়া বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরের মুখ দর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে অন্যদিকে আর মুখ ফিরিবে না।"

ব্রতোদ্‌যাপনের পর আর বিজয়কৃষ্ণ বেশিদিন সাধন আশ্রমে থাকেন নাই। 'ব্রাহ্মধর্মের বর্তমান অবস্থা' পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "এইরূপ সাধন ভজন চলিতেছে, এ সময়ে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হওয়াতে একদিন কতিপয় প্রচারকের সহিত আমার বাদানুবাদ হয়। এ সকল কারণে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাগআঁচড়া গ্রামে গিয়া অবস্থান করিলাম।" বিজয়কৃষ্ণ বাদানুবাদের কারণ উল্লেখ করেন নাই। আচার্য কেশবচন্দ্রের রচয়িতা গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় মুঙ্গের আন্দোলন এবং পরে কুচবিহার আন্দোলন ব্যপদেশে বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না, তাহা আমরা বলিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "মাদক সেবন ত্যাগ শেষ সময়ে তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। লুকাইয়া লুকাইয়া অন্যায় রূপে গৃহীত অর্থের দ্বারা মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপার প্রকাশ পাওয়াতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাগআঁচড়া গিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হন।" এই অভিযোগ যে নিছক অসূয়া প্রসূত তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিজয়কৃষ্ণ হৃদরোগের উপশমের জন্য সেকালের প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ব্যবস্থা মত মরফিয়া সেবন করিতেন, এই সত্যকে বিকৃত করিয়া এইরূপ জঘন্য দোষারোপ যিনি করিতে পারেন তিনি সব পারেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনিও লিখিয়াছেন, "তাহা (বুকের ব্যথা) নিবারণের জন্য বহুমাত্রাতে মরফিয়া সেবন ভিন্ন উপায় রহিল না।" বস্তুতঃ স্বাস্থ্যের খাতিরে সুচিকিৎসকের পরামর্শ মত তাঁহাকে মরফিয়া সেবন করিতে হইত। কোন্ নীতির বলে যে তাহা দুষণীয় মাদক সেবন হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। কুচবিহারের রাজ-কুমারের সহিত কন্যার বিবাহের পর কেশবচন্দ্র জ্বরাক্রান্ত হইয়া ভাইনামগ্যালিসিয়া লইয়া, নৌকা ভ্রমণে যান এ সংবাদ রায় মহাশয় কোনরূপ প্রতিকূল মন্তব্য না করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। আমি বলি না যে কোন প্রতিকূল মন্তব্য ইহার

পাওনা ছিল, আমি বলিতেছি যে ঔষধ রূপে মরফিয়া ভাইনামগ্যালিসিয়া দুই এর কোনটি সেবনই অন্যায় নয়। আসল কথা রায় মহাশয়ের বিজয়কৃষ্ণের উপর দুর্দমনীয় ক্রোধ তাঁহাকে ঐ সকল কটু-কাটব্য লিখাইয়াছে, তিনি কি করিবেন? তার পর লুকাইয়া খাওয়া। লোকে কি ভাবিবে বিজয়কৃষ্ণ যদি তাহাতে এতটুকু পরোয়া করিতেন তবে তিনি অন্য কেহ হইতেন, বিজয়কৃষ্ণ হইতেন না। রায় মহাশয় যে বিজয়কৃষ্ণের উপর এতটা ক্রুদ্ধ তাহাও ঐ মান রক্ষা করিয়া চলিতে না পারার জন্যই ত! বিজয়কৃষ্ণ পরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন, তখন তাঁহার সমক্ষেই তিনি তাঁহার ঔষধ গ্রহণ করিতেন, কথামৃতে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাহা তিনি লুকান প্রয়োজন বোধ করেন নাই, রায় মহাশয়ের নিকট তিনি তাহা লুকাইবেন কোন যুক্তিতে? এই ত গেল অভিযোগের ন্যায্যতা সম্বন্ধে। তবে এই মরফিয়া সেবন লইয়া বিজয়কৃষ্ণের সহিত গৌরগোবিন্দ রায় প্রমুখ কেশব ভক্তগণের যে বাদানুবাদ হইত তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণ যে তাঁহাদের এই অন্যায় আপত্তির বলীয়ান প্রতিবাদ করিয়া থাকিবেন তাহাও স্বাভাবিক এবং এই বিরক্তিকর অবান্তর বাদানুবাদে অতিষ্ঠ হইয়া বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা ত্যাগ করেন ইহা সম্ভব। তবে এই বিষয়ে গত-সন্দেহ হইবার মত প্রমাণ নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভার জন্য যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তাহাতে বিজয়কৃষ্ণের নাম নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় ঐ তারিখের পূর্বেই তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া থাকিবেন।

ষোল

বাগআঁচড়ায় আসিয়া বিজয়কৃষ্ণ কিরূপভাবে জীবন কাটাইতে ছিলেন তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়, নব্যভারতে প্রকাশিত "বিজয়ের বিজয় স্তম্ভ" নামীয় প্রবন্ধে। কর মহাশয়ের গ্রন্থে এই সময়ের কথা বিশেষ নাই বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি প্রয়োজন মনে করি। প্রবন্ধ লেখক লিখিতেছেন, "সেই সময়ে তিনি আমাদের চারি গ্রামে চারি দিন যাহাতে উপাসনা হইতে পারে ও প্রত্যেক গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মঙ্গলবার বাগুড়ি, বুধবার ফুলবাড়িয়া, শুক্রবার শঙ্করপুর এবং রবিবার বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা এবং শনিবার সঙ্গত সভা। সঙ্গত সভা ও সাপ্তাহিক উপাসনা সমাজ গৃহেই হইত। শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ মল্লিক মহাশয় স্থানীয় উপাচার্য্য নিযুক্ত হন। রবিবারে প্রাতে সমাজ ঘরে উপাসনা,

বিকালে কিছু সময় কীর্তন হইয়া সন্ধ্যার পরে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইত। সেই সময় এক একদিন সংকীর্তনে যে রূপ জমাট হইত ও ভাবের তরঙ্গ উঠিত তাহা কখনও ভুলিবার নহে। সে রূপ কীর্তনের রোল এখন আর শোনা যায় না। বিজয়বাবুর ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় এই সংকীর্তনের উৎসাহদাতা ছিলেন; কীর্তনে মত্ততা, উপাসনাতেও সেই রূপ গভীরতা ও ভাবাবেশ হইত।*** একদিন এমন অবস্থা ঘটে যে বিজয়বাবুর ছেলের দুধ ফুরাইয়া যায়, তাঁহার শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিজয় দুধ যে নাই—ছেলে খাবে কি? সন্ধ্যা হল, এখনও দুধ আসিল না,—দুধ এ সময় কোথায় পাওয়া যাবে? শুনিয়া বিজয়বাবু উত্তর করিলেন, আজকের মত ছেলেকে ভাতের ফেন খাওয়াইয়া রাখ। ইহার কিছু সময় পরেই দুধ আসিয়া পৌছিল, ছেলেকে আর ফেন খাওয়াইতে হইল না। এই উত্তর দিয়াই বিজয়বাবু কিন্তু নিশ্চিন্ত। ভগবানের কৃপার উপর কি বিশ্বাস, কি নির্ভর! বিন্দুমাত্র টলিলেন না।

আর একদিন ফুলবাড়িয়া গ্রামের বিশু কারিগরের ঘরে আগুন লাগে। উহার বাড়ি হইতে অনেক দূরে গোসাই বসিয়া ছিলেন; আগুন লাগিয়াছে শুনিয়া অমনি কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে আরও প্রায় ৩০।৩৫ জন লোক চলিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে একখানা ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, অন্য ঘরগুলি গোসাই ও অন্যান্য লোকদিগের চেষ্টায় রক্ষা হইল। একে ফাল্গুন মাস, তাহাতে প্রবল দক্ষিণে বাতাস ও আগুনের উত্তাপে গোসাই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের শৌচক্রিয়ার জন্য বাহিরে যে জল ছিল তাহাতেই হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। কি পরোপকার স্পৃহা! তাঁহাদ্বারা এরূপ অনেক কাজ সাধিত হইত। আরও একবার এই নিয়ম করেন যে অন্য কাহারও হস্তের রন্ধন আহার করিবেন না, নিজের পরিশ্রম দ্বারা আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ অথবা ভিক্ষালব্ধ নিজের আবশ্যকমত জিনিস গ্রহণ ও নিজের হাতে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একজোড়া করতাল হাতে লইয়া কোন ব্রাহ্মের বাড়ি বসিয়া গান গাহিতেন,

সদাই হরি বোল, সদাই হরি বোল,
হরি নামের নাই তুলনা।
সদাই হরি বোল।
অজামিল পাপী ছিল, হরি নামে তরে গেল।
তাঁরে যমদূতে ছুঁতে পেল না।
যদি বিষয়ে সুখ হতোরে, তবে লালাজি ফকির হতো না।

প্রায় অর্ধ ঘন্টাকাল এই গান গাইতেন, পরে গৃহের কর্তা বা কর্ত্রী কিছু চাউল, আলু, বেগুন, কাঁচকলা, দুটি কি চারটি পয়সা যাহার যাহা থাকিত, তাহাই দিতেন। এই ভিক্ষা করিয়া, যেদিন যাহা পাইতেন, তাহাই বাসায় আনিয়া নিজ হাতে পাক করিয়া আহার করিতেন। একটি ছোট মাটির ঘট ছিল, তাহাতেই পানীয় জল পান করিতেন। এরূপভাবে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত করেন। অতি দীনভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন। সমাজঘরের সম্মুখে পুষ্পোদ্যানটি তাঁহার নির্জনে ধর্মসাধন ও যোগ শিক্ষার সুন্দর অনুকূল স্থান ছিল। এই উদ্যানে তিনি নির্জনে দিনের পর দিন গভীর ধ্যানে ও ভগবৎচিন্তাতে অতিবাহিত করিতেন।"

হিংসা দ্বেষ বাদ বিসম্বাদ পরিপূর্ণ কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের এই জনবিরল পরিবেশের মধ্যে গভীর ধ্যান ও ইষ্ট-চিন্তাতে দিন যাপন করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম আত্ম-বিশ্লেষণ ক্ষমতা আরও সূক্ষ্ম ও সজাগ হইয়া উঠিল। 'যোগ সাধন' পুস্তকে বিজয়কৃষ্ণ নিজে এই সময়ে আপনার মানসিক অবস্থার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন, "শ্রদ্ধেয় কেশব সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্বে আমি যখন বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয় এবং তাহাতে দেখি যে জীবনের প্রকৃত ধর্মের অবস্থা অতি হীন; সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে অর্থাৎ তখনও পাপশক্তির মূল জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি এবং নানা দেশবিদেশে ধর্ম প্রচার করিয়া হায়, আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়। তবে ধর্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতই উদিত হইল। বুঝিলাম যে ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায় নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ঔষধ নাই।" এই আত্মধিক্কার পড়িয়া মনে হয় বুঝিবা বিজয়কৃষ্ণ তখনও পাপেভ্যোঽপি সর্বেভ্যঃ পাপ কৃত্তমঃ: এই অবিশ্বাস্য দীনতা, সশ্রদ্ধ এষণাই তাঁহাকে গরীয়ান করিয়াছে। একান্ত সহিষ্ণু সাধনার দ্বারা তিনি উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে উঠিয়াছেন এবং সম্মুখের ততোধিক উচ্চ শিখর দেখিয়া তিনি মনক্ষোভে হায় হায় করিয়াছেন। ব্রহ্মলাভ তিনি ইতিপূর্বেই করিয়াছেন, কিন্তু দিনযামিনী তাঁহার সহবাসের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার প্রাণ এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন ইহার জন্য

আরও অধিকতর প্রচেষ্টার প্রয়োজন, প্রচুরতর মূল্যদানের দরকার। অবশ্য ঈশ্বর লাভের জন্য এমন কোন মূল্য ছিল না যাহা দিতে বিজয়কৃষ্ণ কখনও অপ্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি আপনার মনস্কাম পূর্ণ করিবার জন্য চূড়ান্ত মূল্য দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যদিও সামাজিক ধর্ম মানুষকে সুখী করে, আনন্দ দেয়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নিরাপদ অবস্থা লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবনে এই ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নিমগ্ন হইতে হইবে, আরও প্রগাঢ়রূপে তাঁহার সাধনভজনে নিয়োজিত হইয়া দিনযামিনী তৎসহবাসে বাস করিতে হইবে।" ইহাকে বিজয়কৃষ্ণের স্বগতোক্তি মনে করিতে হইবে, কারণ কেবলমাত্র সংসারের মুখ তাকাইয়া কথা বলা বিজয়কৃষ্ণের ধাতে ছিল না। যে গভীর ব্যক্তিগত প্রস্তুতিতে তিনি এই সময় নিমগ্ন হইলেন তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ পাওয়ার কোন উপায় নাই, তবে এই সময় হইতেই যে বিজয়কৃষ্ণ অধিকতর অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণ বেশ কিছুটা কমিয়া আসে তাহা বলা যায়। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা তিনি "বর্ত্তমান অবস্থায়" এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, "বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে একদিন নির্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি! হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটী জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং কে যেন বলিল, তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস না। গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না।"

মতবাদ যখন অন্বেষণকে ব্যাহত করে তখনই গণ্ডীর আবির্ভাব হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অন্বেষণকে যাহাই বাধা দেন তাহাই গণ্ডী; মত লইয়া বন্ধুগণের সহিত নানারূপ মনান্তরে ব্যথিত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ একান্ত আপন মনে সাধনভজন করিবার জন্য বাগআঁচড়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে ধীরে ধীরে গণ্ডীর দোষ সম্বন্ধে সচেতন হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

সতেরো

কলিকাতার কলকোলাহল ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জনে ঈশ্বরের সহিত সমস্ত প্রাণের যোগ স্থাপন করিবার সাধনা করিতে চাহিলে কি হইবে, ঘটনার সংস্থান ও সংযোগ তাঁহাকে আবার রাজধানীর কোলাহলের মধ্যেই টানিয়া আনিল। কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কুচবিহার রাজকুমারের বিবাহ লইয়া দলাদলির যে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজয়কৃষ্ণ সেই ঝড়ের একেবারে মধ্যস্থানে আসিয়া পড়িলেন। বিজয়কৃষ্ণের জীবনে তথা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে এই বিবাহ

ও তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলন একটি অতি প্রধান ঘটনা সুতরাং বিজয়কৃষ্ণের জীবনীতে ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ অনিবার্য।

কেশবচন্দ্রের বিপক্ষদলের মধ্যে আমার ধারণায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং এই বিবাহ ব্যাপারটি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার আত্মচরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ পক্ষপাত দুষ্ট নহে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। শিবনাথ লিখিতেছেন, "১৮৭৮ সালের জানুয়ারীর প্রারম্ভে কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহ বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ হোমিও প্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেছিলেন। বন্ধুতাসূত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভবনে যাইতাম, সেখানে যাদববাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। আমি তাঁহার মুখে শুনিলাম যে কেশববাবু কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্বে তাহার বিবাহ দিতে রাজী হইয়াছেন, কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল বিষয়ে কথা-বার্তা চলিতেছে। সে সকল কথাবার্ত্তার প্রকৃতি কি তাহা তিনি আমাকে বলেন নাই। ক্রমে শুনিলাম যে পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য কুচবিহার হইতে রাজপুরোহিত আসিতেছেন। ক্রমে কি কি বিষয় স্থির হইল তাহাও প্রকারান্তরে আমাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে কন্যার ও বরের বয়স প্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহ হইবে, তবে বয়স প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবেন; কেশববাবু জাতিচ্যুত বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাজপরিবারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্ত্তে, ঈশ্বরের নাম হইবে, রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন।"

এই সকল সংবাদ জানাজানি হইলে ব্রাহ্মগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং তাঁহারা সমাজের অবলম্বিত সত্য সকল যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহাদের প্রধান জিজ্ঞাসা হইল, "যে কেশববাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকন্যার বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা?" শিবনাথ প্রভৃতি কয়েকজন কেশবচন্দ্রের নিকট গিয়া তাঁহার মুখে সকল শুনিতে চাহিলেন কিন্তু কেশবচন্দ্র কোন ক্রমেই কিছু বলিলেন না। তখন শিবনাথ খাস্তগিরির কন্যার বিবাহের ব্যাপারে তাঁহার প্রতি নিগ্রহের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আপনার কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাহ্মেরা ছাড়িবে না। তারপর শিবনাথের ভাষায়, "যেই এই কথা বলা, অমনি কেশববাবু বিরক্ত

হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া টেবিলের উপর উঠিয়া বসিলেন। কাঁধে একখানা গামছা ছিল, তাহা মাথায় বাঁধিলেন এবং বলিতে লাগিলেন আমারও ঘাড়ের মাংস ছিঁড়ে খাবে, তার আর কি? আমি পূর্বে কখনও তাঁহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে একথা থাক এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।"

ইহার পর ইতি কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সর্বপ্রকার মতাবলম্বী ব্রাহ্মদের মধ্যে মিলিত মন্ত্রণা চলিল। এমন কি বৃদ্ধ শিবচন্দ্রদেব মহাশয় পর্যন্ত আপত্যকারীদের দলে যোগ দিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে ব্রাহ্মধর্মের এক বিষম সঙ্কটকাল উপস্থিত। কেশবচন্দ্রের নিকট বহুজন স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব উঠিল।

শিবনাথের ভাষায়, "দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বলিলেন যে এই প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের অনিবার্য্য ফল কেশববাবু তাহার সমুচিত ব্যবহার না করিলে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাহা করিতে তোমরা প্রস্তুত আছ কি না? আনন্দমোহনবাবু ও আমি বলিলাম, স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনও আমাদের মনে নাই, সে বিষয়ে কথা দিতে পারি না। ×× দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, যারা আমাদের সঙ্গে সমগ্র পথ যাইতে প্রস্তুত নন, তাঁদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিব না। ×× সকলের ভক্তিভাজন শিবচন্দ্রদেব মহাশয় স্বাক্ষরকারীদের অগ্রণী হইলেন। কি জানি কি ভাবিয়া দুর্গামোহনবাবু ও দ্বারকানাথবাবু দুইদিন পরে উক্তপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারী দিবসের ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকাতে কুচবিহার বিবাহ সুনিশ্চিত বলিয়া প্রকাশিত হইল। ২৬ জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত ঐ পত্র কেশববাবুকে দেওয়া হইলে কেশববাবু তাহা না পড়িয়া পা দিয়া দলাইয়া ছিলেন এবং ছেঁড়া কাগজের বাক্সে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ××× আমরা প্রতিবাদ পত্রখানি মুদ্রিত করিয়া মফঃস্বলের সকল সমাজে প্রেরণ করিলাম ও তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। চারিদিক হইতে কেশববাবুর হস্তে প্রতিবাদ পত্র আসিতে লাগিল।" ইহার পর সমালোচক, Bramho Public Opinion পত্রদ্বয়ের প্রকাশ, কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটী স্থাপন, টাউন হলে মিটিং, কেশবচন্দ্রকে আচার্য পদ হইতে অপসারণ ও অন্য কয়েকজন আচার্য্য নিয়োগ, সমাজ মন্দির দখল করিবার জন্য দুই দলের বাদ বিসম্বাদ, নূতন সমাজের সাধারণ সমাজ নাম গ্রহণ, তত্ত্ব কৌমুদীর প্রকাশ প্রভৃতির কথা শিবনাথ তাঁর আত্মচরিতে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন কিন্তু এই সকল ব্যাপারে বিজয়কৃষ্ণের একবারও নামোল্লেখ করেন নাই। ইহার দ্বারা সাধারণের এই ধারণা

হইবে যে এই আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণের বিশেষ কোন contribution (অবদান) ছিল না, এবং বিজয়কৃষ্ণ তৎকালীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে Persona grata বা অন্যতম প্রধান ব্যক্তিরূপে গণিত হইতেন না। এই ভ্রান্ত ধারণার প্রথম সূত্রপাত করিয়া শিবনাথ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে একটা পাকাপাকি অসত্যের আমদানি করিয়াছেন। যাঁহার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সেই কেশবচন্দ্রের দলভুক্তগণ কিন্তু এই আন্দোলনের প্রধানরূপে বিজয়কৃষ্ণকেই গণনা করিতেন। তাই গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে এই ব্যাপারে বিশেষরূপে বিজয়কৃষ্ণকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় যিনি এই গ্রন্থে কুচবিহার আন্দোলন সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কথায়, "গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে দলভুক্ত পাইয়া প্রতিবাদকারী দিগের বল ও সাহসবৃদ্ধি হয়, তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "এদিকে প্রতিবাদকারিগণ অকৃতকার্য্য ও পরাস্ত হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেই দলের নেতা হইয়া দাঁড়ান। প্রায় সকল প্রতিবাদকারীরই এরূপ ইচ্ছা ছিল যে স্বতন্ত্র দল না করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, কেশবচন্দ্রকে নানা উপায়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের দৃঢ় সংকল্প হইল যে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না, স্বতন্ত্র সমাজ করিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাহা না হইলে তিনি তাঁহাদের (প্রতিবাদকারীদের) দলভুক্ত থাকিবেন না।" এই মন্তব্যগুলি বিদ্বেষশূন্য না হইলেও বিজয়কৃষ্ণ যে সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে মোটেই Persona nongrata ছিলেন না এবং তাঁহার বিপক্ষ দলে যোগদান যে শিবনাথ যেরূপ দেখাইতে চাহিয়াছেন সেই প্রকার inconsequential বা নগণ্য ব্যাপার ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত করে। বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম চাহিতেন, বিসম্বাদ চাহিতেন না, তাই ক্রমাম্বয় বিসম্বাদের হাত হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তিনি কেশবচন্দ্রের দল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে জেদ করিয়া সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু এইখানে এইটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্যক্তিই (মায় শিবনাথ) অন্য মত হইলেও বিজয়কৃষ্ণের জিদই বলবৎ হইল। যে ব্যক্তির মত বা জিদের এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাঁহাকে Persona nongrata বা অপ্রধান ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাকে ঐতিহাসিক সত্যানুরাগ বলা যায় না।

দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার Behold the Man নামক পুস্তকে কেশবচন্দ্রের জীবন

আলোচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষজ্ঞান তাঁহার যথেষ্টই থাকিবার কথা এবং তাঁহার মতামতকে পক্ষপাত দুষ্ট মনে করিবার হেতু অল্প। তাঁহার মতে যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সত্যকার ধর্মোপলব্ধি দিয়া যাচাই করিতে হয়, তবে উহার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকেই ধরিতে হয়। ১৮৭৮ সালের ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে দেখা যায় যে দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ত্রয়ও ইহাই উচিত মনে করিয়াছিলেন এবং বিজয়কৃষ্ণকে সকল কমিটীর প্রথম ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করাই সমীচীন বোধ করিয়াছিলেন। দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যদি আত্মশোধন এবং ভগবৎ উপলব্ধির প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা যায়, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসু নন, দুর্গামোহন দাস নন, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও নন, তাহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। দত্ত মহাশয়কে সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট না কি একবার সাধারণ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি উপরোক্ত জবাবই দিয়াছিলেন।

আঠারো

শিবনাথ দুহিতা হেমলতা দেবী তাঁহার শিবনাথ জীবনীতে নূতন দলের প্রতিষ্ঠার জন্য টাউন হলে ১৫ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) তারিখে যে বিরাট সভা হয় তাহার বিবরণ দিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন. "শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে নূতন রচিত একটী সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া সভার সূচনা করিলেন। × × × প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী মতে কার্য নির্বাহ হইত না, সেখানে এক-নায়কত্বের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের জন্য এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। এখানে প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য এ সমাজের প্রত্যেক সভ্য দায়ী থাকিবেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব

সমর্থন করেন।" এই বিবরণ হইতেও বুঝা যায় যে আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। বঙ্ক কর মহাশয় লিখিয়াছেন, "উক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইলে তিনিই গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম দেশীয় বিদূষী মহিলা মিস্ কলেটও (Bramho Year Book এর রচয়িতা) এই ভক্ত প্রচারককেই অগ্রণী করিয়া সাধারণ সমাজের প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছিলেন। হয়ত মিস্ কলেটের উপদেশ মতই প্রতিবাদীদিগের পক্ষ হইতে বিজয়কৃষ্ণকে বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতায় আনাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্বন্ধে "বিজয়ের বিজয়স্তম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, "আমাদের যতদূর মনে হয় মাঘোৎসবের পরে তাঁহাদের সকলের পরামর্শে গোস্বামী মহাশয়কে বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতায় আনা সিদ্ধান্ত হয়। তাহার পর মহলানবিশ (গুরুচরণ) মহাশয় একখানা পত্রসহ তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাকে বাগআঁচড়ায় পাঠাইলেন। আমি তথায় যাইয়া উক্ত পত্রখানা দেখাই ও গোস্বামী মহাশয়, কালীনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার কিছুদিন পরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন ব্রাহ্মমন্দির নির্মিত হইল।" *

সেই সময়ের ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট বিজয়কৃষ্ণের মতামত যে কতদূর মূল্যবান বিবেচিত হইত এবং তিনি আন্দোলনকারীদের পক্ষে আসায় তাহাদের পাল্লা যে কিরূপ ভারী হইয়া উঠিল, তাহার আভাষ পাওয়া যায় ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তিকা হইতে। এই পুস্তিকা প্রচারিত হয় ১৮ই ফাল্গুন অর্থাৎ ৩।৪ মার্চ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। নবকান্তবাবু লিখিতেছেন, "উপরি উক্ত ব্রাহ্ম সমাজসমূহ ব্যতীত পূর্ব বাংলার বিশেষ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রচারক বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়

* বিজয়কৃষ্ণ ঠিক কোন তারিখে বাগআঁচড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় আসেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ২৬জন ব্যক্তির যে প্রতিবাদ পত্র ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কেশবচন্দ্রের হাতে দেওয়া হয় তাহাতে বিজয়কৃষ্ণের স্বাক্ষর ছিল না, পরে দেখিব তিনি পৃথকভাবে প্রতিবাদ পত্র দিয়াছিলেন। তবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে ব্রাহ্মসমাজের যে কমিটি গঠিত হয় তাহাতে বিজয়কৃষ্ণের নাম রহিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয় বিজয়কৃষ্ণ ঐ দুই তারিখের মধ্যে কোন সময়ে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়া থাকিবেন। —লেখক।

কেশববাবুর কন্যার বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকাসমূহে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল। মিরার, সুলভ এবং কেশববাবুর গোঁড়া শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব বশতঃ কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মগণ বিবাহে প্রতিবাদ করিতেছেন, সত্য নিয়া তাঁহাদের সংগ্রাম নহে, বিজয়বাবুর পত্র দ্বারা উক্ত দোষারোপ কতদূর সত্য এবং ন্যায়সংগত তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধী হইয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহাকে কোন্ সজীব ব্রাহ্ম পোষাকতা করিতে পারে? সম্পূর্ণ আপত্তি করিয়া কেশববাবুকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আপনারা তাঁহাদের সংগ্রাম নহে, বিজয়বাবুর পত্র দ্বারা উক্ত দোষারোপ কতদূর সত্য এবং ন্যায়সংগত তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধী হইয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহাতে কোন্ সজীব ব্রাহ্ম পোষাকতা করিতে পারে? সম্পূর্ণ আপত্তি করিয়া কেশববাবুকে পত্র লিখিলাম। আপনারা তাঁহার অন্যায় কার্য্যের আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। চিরকাল তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকিব। কোন মনুষ্যের অন্যায় মতের অনুমোদন করিব না। অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়া মরি তাহাও সুখের বিষয়, তথাপি সত্যের অবমাননা দেখিয়া নীরব থাকিতে পারিব না। আপনারা বিবিধ উপায়ে প্রতিবাদ করুন, আমাকে আপনাদের সঙ্গী বলিয়া গণ্য করিবেন। সত্যস্বরূপ ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবেন।

স্বাঃ—"শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"

নবকান্তবাবুর লেখার তাৎপর্য এই যে বিজয়কৃষ্ণ যখন এই বিবাহে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন সত্য তাঁহাদের পক্ষে কারণ বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতবিদ্বেষের কথা উঠিতেই পারে না।

আমরা এখন সামান্য পিছন ফিরিয়া এই বিবাহ আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণের অংশ গ্রহণের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। প্রসঙ্গতঃ "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থে প্রকাশিত কোন কোন অন্যায় মন্তব্যের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দিব।

১৮৭৮ সালের মাঘোৎসব ব্যপদেশে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা আসিয়া ছিলেন তাহার প্রমাণ ৮ই মাঘ অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারী তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে চিত্তের

প্রসন্নতা বিষয়ে এক উপদেশ পাঠ করেন। আচার্য কেশবচন্দ্রে বলা হইয়াছে যে, 'কিয়দ্দিন পূর্বে একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল, তাহাতে তিনি পৌরোহিত্য করিবেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।' মাঘোৎসব ব্যাপারে কলিকাতায় আসিলে বিজয়কৃষ্ণকে পৌরোহিত্য করিবার জন্য অনুরোধ করা কেশবচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে বিবাহের প্রকৃতি সম্বন্ধে তখনও কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা হয় নাই, সুতরাং এই বিবাহের অন্যায্যতা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ তখনও অজ্ঞ থাকিবেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ৩০শে জানুয়ারীর ডায়েরিতে দেখি, "কমিশনার সাহেব নাকি আগামী ৬ই মার্চ বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কেশববাবু এখনও শেষ উত্তর দেন নাই।" ২রা ফেব্রুয়ারীর ডায়েরিতে আছে, "শুনিলাম কেশববাবু আগামী মার্চ মাসে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী আছেন তবে কতকগুলি condition দিয়াছেন।" স্পষ্টতঃ বিজয়কৃষ্ণকে যখন পৌরোহিত্য করিতে অনুরোধ করা হয় তখনও স্থির কিছুই হয় নাই, হয়ত বাগ্‌দানের প্রস্তাব চলিতেছিল মাত্র। সম্মতি দিয়া থাকিলেও ঠিক কি সংবাদের উপর বিজয়কৃষ্ণ কিরূপ সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক না জানিয়া কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য করা উচিত হয় না। বিবাহের স্থির সিদ্ধান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বিজয়কৃষ্ণকে প্রতিবাদ করিতে দেখি। বিজয়কৃষ্ণের মত ব্যক্তি যে কেশবচন্দ্রের এই স্পষ্টতঃ অযুক্তিকর কার্য্যকে অনুমোদন করিবেন তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "বাগআঁচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তাদের সহিত তাঁহার যোগ হয়।" অর্থাৎ তিনি কাহারও প্রভাবে পড়িয়া এই বিবাহের প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহার নিজস্ব ধারণাতেই ইহা অন্যায় বোধ হইয়াছিল। "আচার্য্য কেশবচন্দ্রের" ভাষায়, "বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হইলে গোস্বামী মহাশয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগদান করিয়া এক প্রতিবাদ পত্র লিখিয়া ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন।" ইহা অবশ্য ধর্মতত্ত্বে প্রকাশ করা হয় নাই, এই পত্রই পরে মুদ্রিত হইয়া বন্ধুদিগের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকিবে। দুঃখের বিষয় এই পত্র পাঠকের নিকট না উপস্থিত করিয়াই আচার্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থে মন্তব্য করা হইয়াছে, এই পত্র অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। তাহা পড়িয়া সাধু অঘোরনাথ তাঁহাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান, "বিজয় সুস্থির হও, চঞ্চল হইও না, দেখ বিবাহ কি রূপ হয়, প্রতীক্ষা কর। তোমার সঙ্গে আচার্যের কিরূপ সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া দেখ, সহজে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিওনা। তোমার নিজের দায়িত্ব একবার ভাবিয়া

দেখ।" বিজয়কৃষ্ণের পত্রটিকে উপস্থাপিত করিয়া পাঠকগণকে সেই সম্বন্ধে মতামত গঠন করিবার অবকাশ দিলে আমরা বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পরিতাম। তাহা না করিয়া, প্রমাণকে অন্তরালে রাখিয়া নিজ মন্তব্য জাহির করায় পক্ষপাতিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। এইখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিজয়কৃষ্ণ মুঙ্গেরের নরপূজা সম্বন্ধীয় পত্র বিপক্ষদলীয় কাগজে প্রকাশ করায় কেশবচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই হয়ত তাঁহাদের সৎসাহস এবং ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষা করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ আপনার প্রতিবাদ পত্র প্রকাশের জন্য ধর্মতত্বে পাঠান। ধর্মতত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার প্রতিবাদ অন্য পত্রিকাদিতে প্রকাশিত করিয়া থাকিবেন। নবকান্তবাবু যে পত্র উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে কোনরূপ অন্যায় উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায় না—বঙ্ক কর মহাশয় বিজয়কৃষ্ণের লেখা নানান পত্র হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ব্যক্তিগত অশিষ্ট আক্রমণ কোথাও এতটুকু প্রকাশ পায় নাই। বঙ্ক কর মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে উহা

সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে তিনি সত্যবুদ্ধিতে প্রতিবাদ ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়াছিলেন। আচার্য কেশবচন্দ্রে আরও লেখা হইতেছে যে "সাধু অঘোরনাথের এই পত্রে কোন ফলোদয় হইল না। অন্য কোন প্রচারকও শান্ত থাকিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি শান্ত থাকিবেন দূরে থাকুক, অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠিলেন। এরূপ প্রচার করিলেন যে আমার পরিবারের অন্ন বন্ধ হইতে চলিল, আমাকে ভয়ানক ক্লেশে পড়িতে হইবে।" যাঁহারা বিজয়কৃষ্ণকে এতটুকুও জানেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে এই অশালীন অপপ্রচার একেবারেই দ্বেষপ্রসূত। যিনি গঙ্গা মৃত্তিকা মাত্র সেবন করিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার করিয়াছেন, তিনি ঐ রূপ লিখিবেন তাহা বিশ্বাসের একেবারেই অযোগ্য; এই অপপ্রচারের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি রহিয়াছে তাহাও ক্রোধে অন্ধ হইয়া অপপ্রচারীগণ দেখিতে পান নাই। অঘোরনাথ লিখিলেন, তোমার নিজের জীবনের দায়িত্ব চিন্তা করিয়া দেখ অর্থাৎ কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলে তোমাকে সাংসারিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে; কেশবের দল ধরিয়া থাকিলে যদি আর্থিক নিশ্চিন্ততা assured হয় তবে 'আমার পরিবারের অন্নবন্ধ হইতে চলিল' প্রভৃতি লেখার কথাই উঠে না। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটি ঠিক ইহার উল্টা। বিজয়কৃষ্ণকে দলে রাখিবার জন্য কেশবভক্তগণ বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাঁহাকে এই বিবাহের প্রতিবাদী হইতে দেখিয়া তাঁহার একজন ব্রাহ্মভ্রাতা কলিকাতা হইতে বাগ-আঁচড়ায় তাঁহার সহধর্মিণী যোগমায়া দেবীকে লিখেন, আপনি গোস্বামী

মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিবেন তিনি যেন কেশববাবুর বিরুদ্ধে কিছু না লেখেন অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষাবলম্বন না করেন। এরূপ করিলে আপনারা নিরুপায় হইয়া পড়িবেন। গোস্বামী মহাশয় এই চিঠি পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলেন, ইহারা কি পাগল*** হইয়াছেন? কেশববাবু কি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা না পালন কর্ত্তা? আমি কি তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? সত্যের অবমাননা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না। বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে এই উক্তিই স্বাভাবিক, তাঁহার সমগ্র জীবনধারার সহিত ইহারই সঙ্গতি রহিয়াছে, সুতরাং ইহাই বিশ্বাসযোগ্য। বিজয়কৃষ্ণ বিপক্ষ দলে যাওয়ায় কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগতগণ কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন তাহা 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে প্রকাশিত একটি ছোট্ট ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। গিরীশ সেন মহাশয় লিখিতেছেন 'ভক্তি শিক্ষার্থী গোস্বামী মহাশয় ভক্তির বিপরীত পথ অবলম্বন করাতে ভক্তিসাধনের সময় তাঁহাকে যে আসন প্রদত্ত হইয়াছিল, আচার্য্যের ইঙ্গিত ক্রমে উপাধ্যায় সেই আসন তাঁহার নিকট হইতে ফেরত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে গোস্বামী মহাশয় আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, আসন প্রত্যর্পণ করেন নাই।' ইহা আমাদিগকে শৈশবের হাস্যকর কলহের কথা মনে পড়াইয়া দেয়; যখন ক্রুদ্ধ বন্ধু আর কোন রূপে বন্ধুকে জব্দ করিতে না পারিয়া দাবী করে, "অমুক দিন তোমাকে যে দুটো মিষ্টি খাওয়াইয়াছিলাম তাহা ফেরত দাও।" আশ্চর্যের কথা যে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় তাঁহাদের এই হাস্যকর ব্যবহারের কথা আপনাদের সপক্ষে যাইবে ভাবিতে পারিলেন। কেশবচন্দ্র যেমনই আচরণ করুন, বিজয়কৃষ্ণকে তাহার সমর্থন করিতে হইবে অন্যথায় তিনি ভক্তিপথচ্যুত হইবেন, ভক্তিশিক্ষার পাঠ লইবার সময় বিজয়কৃষ্ণ নিশ্চয় সে অঙ্গীকার করেন নাই, এবং ফেরত চাহিবার শর্তে আসন প্রদান করিলে বিজয়কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিতেন না, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। প্রদান অর্থাৎ সম্যক্ দানের সর্ববাদী গ্রাহ্য অর্থ বিস্মৃত হইয়া আসন ফেরত চাওয়া শিষ্টাচার বহির্ভূত কার্য হইয়াছিল, এবং বিজয়কৃষ্ণের তাহাতে ক্রুদ্ধ হইবারই কথা।

বিজয়কৃষ্ণ কেন কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ সমর্থন করিতে পারেন নাই তাহার কারণ বিজয়কৃষ্ণ এইরূপ দিয়াছেন। "কেশববাবুর সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্ম-সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। আমাকে লোকে অস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য

জানিয়াও স্থায়িভাবে তাহার অনুসরণকে কপটতা, মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি।" যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার বীরচরিত গ্রন্থে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত। তাঁহার মতে, "বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে কেশববাবুকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন। কোন স্বার্থসাধন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে তিনি নিষ্কাম যোগী ছিলেন। সাংসারিকতা বা আত্মোন্নতি তাঁহার কার্য্যকলাপের নিয়ন্ত্রী ছিল না।"

উনিশ

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে বিজয়কৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন, "তিনি আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন" অর্থাৎ তিনি কর্তৃস্থানীয় কেহ নন, কর্তৃপক্ষের সহায়ক মাত্র। শিবনাথের আত্মচরিত প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩২৫ সালে অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণের সহিত পৃথক হওয়ার, বহুপরে; প্রকৃত পক্ষে বিজয়কৃষ্ণের দেহাবসানেরও প্রায় বিশ বৎসর পরে। বিজয়কৃষ্ণের সমসাময়িক প্রাধান্যকে অস্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ তাঁহার পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধুদিগের ততদিন আসিয়া গিয়াছে, সুতরাং আত্মচরিতে শিবনাথ যে বিজয়কৃষ্ণের প্রাধান্যের ন্যূনতম স্বীকৃতিই করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। দুহিতা হেমলতা দেবী তাঁর শিবনাথ জীবনীতে পিতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক উচ্ছ্বাস দেখাইয়া লিখিয়াছেন, "প্রসন্নময়ী (শিবনাথ জায়া) আশ্রমের ব্রাহ্মদিগকে দেবতা বলিয়া ভাবিতেন। বিশেষতঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি বার বার মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন যে অনেক মানুষ এ জীবনে দেখলাম, গোঁসাইজীর মত এমন নিরেট খাঁটি মানুষ আর দেখলাম না। গোস্বামী মহাশয় অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কাকেও ভয় করিয়া কথা বলিতেন না। × × × বাস্তবিক এমন নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ ভক্তসাধক এ সংসারে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।"

১৮০০ শকের ১৬ই আষাঢ় (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই এর গোড়ার দিকে) তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় আমরা একটী হিসাবের তালিকায় নিম্নলিখিত খবরের উল্লেখ দেখি, "বাবু শিবচন্দ্র দেব ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র মফস্বলে পাঠাইবার ডাক ষ্ট্যাম্প সাড়ে তিন টাকা।" মফস্বল ব্রাহ্মসমাজগুলি বিজয়কৃষ্ণের মতামতে কিভাবে প্রভবান্বিত হইত ইহা তাহার সামান্য নিদর্শন। পয়লা শ্রাবণের তত্ত্ব

কৌমুদীতে এই সংবাদটুকু দেখি, "২রা জ্যৈষ্ঠ বা ১৫ই মে দিবসীয় টাউন হল সভার চতুর্থ নির্দ্ধারণে স্থির হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগঠন ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নির্দ্ধারণান্তর মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সমূহে তাহা প্রেরণপূর্বক দুই মাসের মধ্যে সমাজের সভ্যগণের সাধারণ অধিবেশনে তাহা উপস্থিত করিবার ভার সাধারণ কমিটির উপর দেওয়া হইল। কমিটি সেই অর্পিতভার গ্রহণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণার্থ একটি সাব কমিটি গঠন করেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কালিনাথ দত্ত এবং প্রসন্নকুমার রায় এই সাব কমিটির সভ্য হন।" ১৮০০ শকের ১৬ই মাঘ অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তত্ত্ব কৌমুদীতে দেখি, "নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্যরূপে মনোনীত হয়েন,

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
" দুর্গামোহন দাস
" হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।"

এই সকল ছোট ছোট প্রমাণ হইতে বুঝা যাইবে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পত্তনের গোড়ায় সর্ববাদী সম্মতিক্রমে বিজয়কৃষ্ণ ঐ সমাজের একজন অতি প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এককালে যে সত্য সর্বজন বিদিত ছিল, আজ তাহা গবেষণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করিলে পর ধীরে ধীরে তাঁহার অবদানকে পশ্চাৎভূমিতে ফেলিবার সমবেত চেষ্টা হইয়াছে এবং বর্তমানে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস হইতে একপ্রকার নির্বাসিত।

ব্রাহ্মধর্মে থাকাকালেও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার প্রাপ্য প্রাধান্য প্রতিপত্তি কিরূপ হেলায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব, নামের কাঙাল তিনি ছিলেন না, তাই তিনি ক্ষমতার সিংহাসনে আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়াও, তাহা সযত্নে আগলাইয়া রাখিবার কোন প্রয়াস পান নাই। প্রভুত্ব-প্রিয় যে কোন ব্যক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল কলিকাতা ঐ সময়ে শীঘ্র ত্যাগ করিতেন না। বিজয়কৃষ্ণের মনে কিন্তু সেই সকল সাংসারিক গণনা আসিল না,--তাই তিনি সাধারণ সমাজ স্থাপনের (১৫ই মে ১৮৭৮) কিছুদিন পরেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ঢাকায় চলিয়া যান। এ সম্বন্ধে বঙ্ক কর মহাশয়ের পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে আছে, "বঙ্গচন্দ্র রায়ের পদচ্যুতির পর ১২৮৪ সনের ১৩ই চৈত্র (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মার্চের শেষ) সাধারণ সভায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে আচার্য্য মনোনীত করার জন্য কার্য্য নির্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত সভা গোস্বামী মহাশয়কে আহ্বান করিলে ১২৮৫ সনের

আষাঢ় মাসে (১৮৭৮, জুন) তিনি ঢাকা আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আগমনে উপাসকগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়।"

বিজয়কৃষ্ণের কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়া শিবনাথ, আনন্দমোহন বসু এবং দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির ইপ্সিত ছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে কলিকাতা ত্যাগে বিজয়কৃষ্ণ যে সাধারণ সমাজকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ হারাইলেন তাহা স্বীকার্য্য। বিজয়কৃষ্ণের নিস্পৃহ মনই তাঁহাকে কলিকাতার কোলাহল ও দলাদলি হইতে দূরে থাকিতে উৎসাহিত করিয়া থাকিবে; তবে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে শিবনাথ প্রভৃতির বিশেষ মনোমত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের মতে "The Deistic school (শিবনাথ প্রমুখ) always took a secret grudge against the Goswami as giving too much prominence to devotion and spiritual discipline and too little to the Europeanisation of all manners and morals. Equally intolerable to some of our leaders was the fact that so long as the Goswami was in the field there was no chance of anv body else to be reckoned as the first man of the Sadharan samaj." অবশ্য শাস্ত্রী গোঁসাই এর মধ্যে আদর্শের এই বিরোধ আলোচ্য সময়ে প্রবলাকার ধারণ করে নাই, তথাপি বিরোধের বীজ তখনই ছিল এবং দুই পক্ষই সে বিষয়ে সজ্ঞান ছিলেন। সে যাহাই হোক, বিজয়কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় আপনাকে কলিকাতা হইতে অপসৃত করিলেন। তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার এই বিজয়োত্তর ত্যাগকে বীর সন্ন্যাসী গারিবল্ডির ত্যাগের সহিত তুলনা করিয়া একান্ত সমীচীন ভাবেই লিখিয়াছেন "আজ বিজয়ও সেইরূপ (বীর সন্ন্যাসী গ্যারিবল্ডির মতই) মিলিত সাধারণ-তান্ত্রিক ব্রাহ্মসমাজের শূন্য গদিতে প্রিয় সুহৃৎ শিবনাথ শাস্ত্রীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। সমাজ বিশেষের বা স্থান বিশেষের গণ্ডীর ভিতর থাকা তাঁহার আর ভাল লাগিল না। ব্রাহ্ম-সমাজের মহাসমরে সাধারণ ব্রাহ্মগণের পক্ষে তিনি সারথী ও শিবনাথ শাস্ত্রী রথী ছিলেন। একজন মহা কুরুক্ষেত্র রণের শ্রীকৃষ্ণ, অন্যজন অর্জ্জুন ছিলেন।" সমসাময়িক অপক্ষপাত ধারণায় বিজয়কৃষ্ণই ছিলেন দলের প্রধান নিয়ামক; পরিতাপের বিষয় যে পরবর্ত্তীকালে ইতিহাসকে যথাভিসন্ধি পাক (cook) করা হইয়াছে।

বিশ

১৮০০ শকের ১৫ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, "বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন এবং তত্রত্য সমাজের উপাচার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ রায় মহাশয় তাঁহার সপরিবারে বাসের জন্য আপাততঃ একটি উৎকৃষ্ট বাটী প্রদান করিয়াছেন।"

ঢাকা বিজয়কৃষ্ণের পুরাতন প্রতিপত্তির স্থান। পৌঁছিয়াই তিনি অবিশ্রান্ত উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেলেন এবং অতি সত্বর ঢাকা সমাজ ও শহর সজীবতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ১লা শ্রাবণের তত্ত্ব কৌমুদীতে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হইল,—"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা হইয়া পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিবেন কথা ছিল, কিন্তু ঢাকার ব্রাহ্মগণের আগ্রহে তিনি শীঘ্র সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। রবিবার উপসনায় তত্রত্য ব্রাহ্ম মন্দিরে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তিনি প্রতি শনিবার হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিতেছেন, তাহাতে অনেক লোক আকৃষ্ট হইতেছে। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার দেখিলে আমরা সমুদায় পূর্ববাংলার কল্যাণের আশা করি।"

'পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে' কর মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোস্বামী মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া যে সমস্ত উপদেশ দিতেন তাহাতে শ্রোতৃগণের বিশেষ চিত্তাকর্ষণ হইত। উপাসকগণের অনেকে নিয়মিত চাঁদার অতিরিক্ত অর্থ গোস্বামী মহাশয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ দিতে আরম্ভ করেন। উপাসক ও সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধিতে নানা দিকে সমাজের উন্নতি লক্ষিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ ঢাকা হইতে মাসিক ৩৫ টাকা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ২০ টাকা মঞ্জুর হয়।" মাসিক বৃত্তি সম্বন্ধে সেই সময়ের তত্ত্ব কৌমুদীতে এই মত লেখা হয়—"পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্বাহক সভা তথাকার আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ ৫০ টাকা করিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পীড়াদি বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে আরও অর্থ সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন" এ সম্বন্ধে কর মহাশয়ের সংবাদটি পরবর্তীকালের এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানভিত্তিক, সুতরাং অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

আমরা ১৮০০ শকের তত্ত্বকৌমুদীতে বিজয়কৃষ্ণের আটখানি বক্তৃতা মুদ্রিত দেখি, ১৮০১ শকের তত্ত্ব কৌমুদীতেও অনেকগুলি বক্তৃতা ছাপা হয়। বিজয়কৃষ্ণের এই সময়ের একখানি বক্তৃতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি করিয়া তাঁহার ধর্মোপদেশের

রীতির সহিত পাঠকগণকে পরিচিত করিব। এই উপদেশটি তত্ত্বকৌমুদী ১৮০০ শকের ১৬ই শ্রাবণ মুদ্রিত হয়। তলবকার (কেন) উপনিষদের সেই সুপরিচিত ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে হইতে আরম্ভ করিয়া বহু শোভমানা হৈমবতী উমার দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান দান পর্যন্ত পাঠ ও বাংলা অনুবাদ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিতেছিলেন, "তলবকার উপনিষদের এই অংশ হইতে আমরা গূঢ় তত্ত্বশিক্ষা করিলাম। হে মানব যদি তোমার অহঙ্কার হইয়া থাকে, তুমি নানা জ্ঞান লাভ করিয়াছ, কঠোর ধর্মসাধন করিয়াছ, মনুষ্য সমাজে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছ, তজ্জন্য কি মনে কর তুমি সহজেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পার? হে মানব, এই আকাশের মধ্যে যিনি সমস্ত আকাশের সার, যিনি জ্যোতির জ্যোতি, এবং প্রাণের প্রাণ, তুমি এই জ্যোতিস্বরূপকে অবগত হও। আমরা সমস্ত মানবজাতির পক্ষ হইতে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। অগ্নি, বায়ু যেরূপ পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেরূপ তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন, তোমার কি সেই দুর্দশা উপস্থিত হইবে না? দেখ বায়ু কেমন শক্তিমান, মুহূর্ত মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভগ্ন করে, পর্বতের চূড়াকে চূর্ণ করে, সাগরের জল আকাশে উত্তোলন করে। সেই প্রবল শক্তি বায়ু ইহার সমস্ত বল বিক্রম প্রকাশ কবিয়াও সেই সামান্য তৃণ, ব্রহ্ম নির্দিষ্ট তৃণকে স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম হইল না। অগ্নির দেখ কেমন দাহিকা শক্তি। তাহার প্রভাবে নগর ভস্মীভূত হয়, সে অগ্নিও সামান্য তৃণকে দগ্ধ করিতে পারিল না। পারিল না কেন? সমস্ত শক্তি ব্রহ্মের, তিনি শক্তি দিলে আর সকল বস্তু শক্তিপ্রাপ্ত হয়, আর তিনি শক্তি প্রত্যাহার করিলে সমস্ত বস্তু শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই কারণে বায়ু এবং অগ্নি এই ক্ষুদ্র তৃণের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে অক্ষম হইল। ব্রহ্ম পূর্ণ শক্তিমান, তাঁহার শক্তির কণামাত্র পাইয়া বায়ু বহে, অগ্নি দহন করে, মেঘ জল বর্ষণ করে। ব্রহ্ম আপনার শক্তি আপনি গ্রহণ করিলে কাহারও কিছু থাকে না। বায়ু, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র যে শক্তি লইয়া গিয়াছিলেন তদ্বারা তাঁহারা এই সামান্য তৃণের প্রতি আপনাপন প্রভাব প্রকাশ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না,—তৃণ যেমন তেমনই রহিল। আর হে মানব। তোমার বিদ্যা, তোমার শক্তি সামান্য। তদ্বারা তুমি কিছুই জানিতে পারিবে না। ধর্ম সাধনের প্রভাবে তাঁহাকে পাইবে এমত বিবেচনা করিও না, তোমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ দেবতারা উচ্চতম সাধন করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহারা অভিমান দ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের সকল আয়োজন, কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা নিষ্ফল হইয়াছিল। হে মানব, সাধনভজন করিয়াছ বলিয়া যদি অভিমান জন্মিয়া থাকে, তোমার সকল গুণগ্রাম বিনষ্ট হইয়াছে; হে মানব, তুমি তোমার অবলম্বিত প্রথাতে সাধনভজন করিতে

পার, কিন্তু আমিত্ববিহীন না হইলে, তোমার যদি অভিমান থাকে তাহা চূর্ণ না হইলে, তুমি উপাসনা করিতে সক্ষম হইবে না, ঈশ্বর দর্শন পাইবার অধিকারী হইবে না। এই আখ্যায়িকাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে কিছুমাত্র অভিমান থাকিলে তোমার ভাগ্যে ব্রহ্মদর্শন সম্ভবাতীত। × × × তুমি যে বিদ্যার এত গৌরব কর, যে বিদ্যাব ভাবে তোমার মস্তক সতত ঘূর্ণায়মান, সে বিদ্যা কি, তুমি কি জান? কি শিক্ষা করিয়াছ? অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার প্রকৃতিশাস্ত্রের কয় পঙ্‌ক্তি অধ্যয়ন করিয়াছ? তুমি জান মেঘ জল বর্ষণ করে, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে, বিদ্যুৎ দ্রুতগামী। এই সকল কার্য্যকারণ ভাব তুমি জান। ইহা যতই জানিবে, ততই জানিতে পারিবে তোমাব জানিবাব অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে। দেখ, প্রাচীন মুনিঋষিবা যাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সামান্য অভিমান দোষে ব্রহ্ম দর্শনলাভে বঞ্চিত হইলেন। ব্রহ্ম দর্শন পাইতে হইলে কি বিদ্যা চাই? এই যে আমরা শুনিলাম আকাশে উমানাম্নী দেবী প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, এই যে দেবতা যিনি অন্তব বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম। সেই আকাশে—সেই তোমাব নিকটস্থ অন্তর আকাশে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হইবে। স্ত্রীরূপা ব্রহ্মবিদ্যা, কেন না তাহার প্রকৃতি অতি কোমল, তাঁহার জন্য লালায়িত হইলে তিনি স্থির থাকিতে পাবেন না, ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হন। তাঁহার কৃপা ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন লাভ হইবে না। ব্রহ্ম উজ্জ্বল সত্তায় আকাশের সর্বত্র বিরাজমান, তাঁহাকে তুমি কেন দেখিতে পাইতেছ না? তোমার অভিমান—তোমার বিদ্যার অভিমান, তোমার ধর্মের অভিমান, লোকসমাজে তোমার প্রতিপত্তির অভিমান তোমার দৃষ্টিকে বোধ করিতেছ। × × যদি তোমাব মনে বিন্দুমাত্রও অভিমান থাকে তোমার সহস্র তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন নিষ্ফল হইবে। দেখ তোমার মনের কোথাও অহঙ্কার আছে কি না। যদি থাকে তদ্দারা ব্রহ্মজ্ঞান পাইবে না। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার শরণাপন্ন হও। স্ত্রী পুরুষ, অজ্ঞান, বিদ্বান সকলের হৃদয়েই ইনি বর্ত্তমান। যতদিন প্রকাশিত না হন, ততদিন সর্বত্র ব্রহ্মবিদ্যার অন্বেষণ কর। পুস্তক পাঠে, গুরুর নিকটে সবত্র ব্রহ্মবিদ্যার জন্য লালায়িত হও। ইন্দ্র যেমন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবিদ্যার দর্শন পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিলে তুমিও তাঁহার দর্শন পাইবে। তখন ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূতা হইবেন।"

ধর্ম সাধনায় আপনার গৌরব ঘোষণা করা, আপনার জ্ঞান গরিমার বড়াই করা বিজয়কৃষ্ণ কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। অহমিকার এই আন্তরিক নিন্দা এমনিই শ্রোতাদিগের মন স্পর্শ করিত। কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ ও নববিধানের পরিপ্রেক্ষায় এই বক্তৃতা সেই সময়ে আরও অর্থজ্ঞাপক ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকিবে।

কেশবচন্দ্রের নামোল্লেখ না করিয়াও কেশবচন্দ্রের মতবাদের ইহা অত্যন্ত জোরাল প্রতিবাদ। বিজয়কৃষ্ণের এই সময়ের বহু বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রের আচরণ বা মতবাদের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। দামোদর কর্তৃক শ্রীচৈতন্যকে সতর্কীকরণ কাহিনীটির উল্লেখ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ এক বক্তৃতায় বলিতেছেন, এইরূপ বন্ধু শ্রোতা ও বক্তা পাওয়া দুর্লভ। এখানে বন্ধুর দোষের কথা বলিলে তিনি রুষ্ট এবং বিরক্ত হন। যাহার সহিত বিশ বৎসর এক সঙ্গে রহিলাম, বন্ধুতা সম্ভোগ করিলাম, যাঁহার প্রণয়ে কত সুখী হইলাম, সেই বন্ধুর দোষ সরলভাবে বলিলাম, বলিলাম বন্ধু দোষ সংশোধন কর, তিনি উত্তর দিলেন, তুমি আমার দোষ বলিলে কেন? আমার দোষ আমিই সংশোধন করিব, আমার দোষ প্রদর্শন করিবার তুমি কে? এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। বর্তমান সময়ের বন্ধুতা কপটতা মাত্র। ইহাতে নরপূজা ও কুচবিহার-বিবাহ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের দ্বারা কেশবচন্দ্রের ক্রুটি প্রদর্শনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা শক্ত নয়। কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত আদেশবাদ যাহা মধ্যবর্তী বাদেরই নামান্তর, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আর এক বক্তৃতায় বিজয়কৃষ্ণ বলিতেছেন 'বিষ্ণুপদ অর্থে যেমন আকাশ, তেমনি বিষ্ণু শব্দে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকেও বুঝায়। ধর্ম সেই পরমেশ্বর হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতে যতক্ষণ ধর্ম থাকে ততক্ষণ নির্মল; সেই ধর্ম যখন মনুষ্য হৃদয়ে প্রবাহিত হয় তখন তাহার স্বাভাবিক নির্মলতা দূরীভূত হইয়া ক্রমে পঙ্কিলতা মিশ্রিত হইতে থাকে। আমরা সেই জটা হইতে যে জল পান করি তাহার এক গণ্ডুষ পানেও আমরা কৃতার্থ হই, কেন না সে জল অবিকৃত স্বাভাবিক। × × পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎ যে ধর্ম লাভ করা যায়, তাহাই নির্মল আর ধার্মিক মানুষ হইতে যে ধর্মলাভ করা যায় তাহাতে নানা ভ্রমপ্রমাদ অসত্য মলিনতা থাকে। অতএব আমাদিগকে সেই পরমেশ্বর হইতেই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা কোন মনুষ্য বিশেষ বা গ্রন্থ বিশেষের মধ্য দিয়া ধর্ম লাভ করিব না। × × ব্রাহ্মধর্ম পরমেশ্বর এবং জীবাত্মার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্তী স্বীকার করেন না।" বলা বাহুল্য বিজয়কৃষ্ণের নিকট গুরুতত্ত্ব সম্যক প্রকাশিত হইতে আরও কয়েক বৎসর বিলম্ব। বিজয়কৃষ্ণ উপলব্ধির বাহিরের কথা কখনও বলিতেন না, সুতরাং তিনি তৎকালীন উপলব্ধির কথাই এখানে বলিয়াছেন।

১৮০০ শকের ১৬ই কার্তিকের তত্ত্বকৌমুদীতে এই সংবাদটুকু আছে, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্থির করিয়াছেন কিছুদিন ঢাকা হইতে অবসর লইয়া সমস্ত পূর্ববাংলা পরিদর্শন ও তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন। তিনি সম্প্রতি ময়মনসিংহ গমন করিয়াছেন।" বিজয়কৃষ্ণের এই বারের ময়মনসিংহ

গমন এবং তথায় তাঁহার কার্যাবলী সম্বন্ধে শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের 'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর' গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে ময়মনসিংহবাসী অধিকাংশ ব্রাহ্ম কেশব বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কেশবপক্ষীয়দিগের হাতেই সমাজমন্দির রহিয়া যায়। গোপীমোহন সেন মহাশয় প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্ম; পুলিশের সাহায্যে তিনি সমাজমন্দির আপনাদের হাতে রাখিতে সক্ষম হন। ময়মনসিংহ সমাজের এই অন্তর্বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণের চেষ্টা সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় লিখিতেছেন, "এই সময়ে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নৌকাযোগে এথানে আগমন করিলেন। তিনি তাঁহার প্রচার বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন, ১৫ই কার্ত্তিক আমি ময়মনসিংহ উপস্থিত হইলে গোপীবাবু বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার বাসায় বাসস্থান প্রদান করিলেন। আমি গোপীবাবুকে অনেক প্রবোধ বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া ব্রহ্মমন্দিরের গোলমাল মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে উভয় পক্ষ হইতে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা হউক এবং পৃথক পৃথক দিনে উপাসনা করা হউক। মন্দির হইতে তাড়িত ব্রাহ্মগণ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু শেষে গোপীবাবুদের মত না হাওয়ায় কিছুই ফললাভ করিতে পারিলাম না।"

গোস্বামী মহাশয় ময়মনসিংহে কয়েকদিন থাকিয়া উপাসনা কীর্তন ও আলোচনাদি করিয়া সকলের উৎসাহ বর্ধন করেন। চন্দ মহাশয়ের ভাষায়, "তাঁহার এই আগমন সময়োচিত হইয়াছিল। আমাদের শুষ্ক ও ভগ্ন প্রাণে অনেকটা সরসতার সঞ্চার হইল, উত্তেজিত মন কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রশান্ত হইল। এ স্থানে একটি বিষয়ে উল্লেখ করা আবশ্যক। গোস্বামী মহাশয় একদিন এখানকার পুরাতন নর্মাল স্কুলগৃহে ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাতে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু মহা উত্তেজনার সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের সমাজ, মানুষ ইহার কি করিবে!" উত্তেজনা বশতঃ তাঁহার স্বরভঙ্গ হইল, তিনি আর বলিতে পারিলেন না। গোপীবাবু বাসায় চলিয়া গেলেন, গোস্বামী মহাশয় অন্য কোন ব্রাহ্ম বাসায় গিয়া বিশ্রাম করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, অতঃপর আর গোপীবাবুর বাসায় যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, কেন, গোপীবাবু পূর্বে যেমন এখনও আমার তেমনি বন্ধু আছেন আমি অবশ্য তথায় যাইব।" গোপীবাবু ভাবিয়াছিলেন গোস্বামী মহাশয় আর এখানে আসিবেন না। কিন্তু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

একুশ

বিজয়কৃষ্ণের এই সময়ের ময়মনসিংহ ভ্রমণের কথা লিখিবার কালে বঙ্কর মহাশয় তাঁহার গোঁসাই জীবনীর ফুটনোটে মন্তব্য করিয়াছেন যে চন্দ মহাশয়ের পুত্রের নামকরণের অনুষ্ঠানে বেদী হইতে নামিয়া বিজয়কৃষ্ণ নৃত্য করিয়াছিলেন এবং প্রবল উচ্ছ্বাসে ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় এই ঘটনাটি কর মহাশয় এস্থানে উল্লেখ করিয়া সময়ের ক্রমভঙ্গ করিয়াছেন। চন্দ মহাশয়ের যে পুত্রের নাম গোস্বামী মহাশয় সত্যানন্দ রাখেন তাহার নামকরণ অনুষ্ঠান হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এবং আমরা এখন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। চন্দ মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর গ্রন্থে তাঁহার পুত্র সত্যানন্দের নামকরণ অনুষ্ঠানে গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক ভাব বিহ্বলতার উল্লেখ আছে। আমরা উপযুক্ত সময়ে সে কথার অবতারণা করিব।

কুচবিহার-বিবাহের পর হইতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত বিজয়কৃষ্ণের বাদানুবাদ চলিতেই ছিল। একটি বিশেষ ব্যাপার লইয়া এই সময়ে বাদানুবাদ তীব্র হইয়া উঠিল। ২৩শে শ্রাবণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তদীয় সংস্রব বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, ঐ বক্তৃতায় তিনি আপন জীবনের নানা ঘটনার বিবৃত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে কেশববাবু প্রচারসভায় প্রচারকদিগের নিকট হইতে এই মর্মে এক খত লিখাইয়া লন যে তাঁহারা যেন কোন দিন কেশববাবুকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক পৃথক দলের সৃষ্টি না করেন। গোস্বামী মহাশয় এবং অন্যান্য প্রচারকগণ ঐ খতনামায় দস্তখত করিয়াছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পর বিজয়-কৃষ্ণকে বিপক্ষ দলে যোগ না দিতে অনুরোধ করিয়া গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রমুখ কেশব-অনুচরগণ যে পত্র লিখেন এবং যাহা রায় মহাশয়ের আচার্য কেশবচন্দ্রে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ একটি প্রতিশ্রুতির উল্লেখ আছে।

কেশবচন্দ্রের যে দুইটি মতকে ব্রাহ্মগণ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না তাহা হইতেছে, আদেশবাদ এবং মধ্যবর্তীবাদ। এই দুইটি মতবাদ স্বতন্ত্র না হইয়া প্রকৃতপক্ষে একটি অন্যটির সম্পূরক মাত্র, কারণ মধ্যবর্তীবাদ হইতেই আদেশবাদের উদ্ভব। বিজয়কৃষ্ণ এই মধ্যবর্তীবাদকে তেজের সহিত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ৭ই আশ্বিনের অর্থাৎ ময়মনসিংহ গমনের পূর্বের এক বক্তৃতায় তিনি এই মধ্যবর্তীবাদ সম্বন্ধে বলেন, "অতএব হে ব্রাহ্মগণ, সাবধান হউন, কোন পৌত্তলিকতা, কোন মধ্যবর্তী, কোন ব্যবধান ব্রাহ্মধর্মে আসিতে দিবেন না। কোন ব্যক্তি মধ্যবর্তী বলিলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বিদায় দিয়া বলুন, তুমি ব্রাহ্ম

নও। এইরূপ মধ্যবর্ত্তীয় ধর্ম কোন প্রকার উপধর্ম হইতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম কখনও নয়। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার আকাশ মাত্রও ব্যবধান নাই, অনন্তকালের উপজীবিকা ব্রহ্মকে সকলে আশ্রয় করে। সাধুকে সম্মান কর, কিন্তু কাহাকেও মধ্যবর্তী করিও না।"

ব্রাহ্মধর্মকে এই মধ্যবর্তীবাদ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা প্রকাশে কার্তিক মাসে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রায় দুই বৎসর হইল যখন আমাকে বিশেষরূপে ভক্তিশিক্ষা প্রদান করা হয়, সেই সময় গোপনে ধর্মশিক্ষার সময় কেশববাবু আমাকে বলিলেন যে আমি তোমাদের মাতা, আমার স্তন্য পান করিয়া তোমরা পুষ্টিলাভ করিবে। আমি বর্তমানে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পাইবে না। সত্য আমার মধ্য দিয়া আসিবে। আমি জীবিত থাকিতে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্যলাভ করিতে পার না। তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন থাকে না। কেশববাবু স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া প্রতিবাদ না করিলে আমি গ্রাহ্য করিব না। প্রচারক উমানাথবাবু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'কর্তার (কেশববাবুর) সঙ্গে উপাসনা না করিলে আমার উপাসনা শ্রবণ করা চালভাজা চিবান মাত্র।' ধর্মতত্ত্ব সম্পাদক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় গত আগষ্ট মাসে কলিকাতা হইতে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার একস্থলে স্পষ্টতঃ এইরূপ লিখিয়াছেন যে আমাদিগকে যাহা হয় বলুন কিন্তু গুরুত্যাগের ভয়ানক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতের অনিষ্ট করিবেন না।'

উল্লিখিত কয়েকটি কথা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ বুঝিতে পারিবেন যে কেশববাবুর প্রচারকগণ কেশববাবুকে গুরু এবং মধ্যবর্তী বলিয়া স্বীকার করেন কিনা। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।"

১লা অগ্রহায়ণের 'তত্ত্বকৌমুদীতে'তে এই ব্যাপার লইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য হয় যথা—"কিছুদিন পূর্বে এই পত্রিকাতে একটি আশ্চর্য সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি এই, 'কেশববাবু তাঁহার দলস্থ প্রচারকদিগের এই মর্মে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া লইয়াছেন যে তাঁহারা কখনও তাঁহার (কেশববাবুর) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন না।' এই সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। বিজয়বাবু মিথ্যা কথা বলিয়াছেন কে সাহস করিয়া এ কথা বলিবেন? যদি তাহা না হয়, এরূপ সংবাদ শুনিয়া কি উপেক্ষা করা উচিত? সেই প্রতিজ্ঞা মুদ্রিত

করিবার জন্য কি বাধ্য করা উচিত নয়? আবার শুনুন বিজয়বাবু কিছুদিন হইল ঢাকা প্রকাশে একটি অত্যাশ্চর্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। × × × এ স্থলে উচিত কি? হয় বলুন বিজয়বাবু মিথ্যাবাদী, না হয় বলুন কেশববাবু অব্রাহ্ম, না হয় বলুন যে বিজয়বাবুর স্মৃতির দোষ। × × প্রশ্ন এই কেশববাবু বিজয়বাবু প্রভৃতিকে ঐরূপ কোন কথা বলিয়াছিলেন কিনা? ব্রাহ্মসমাজ ইহার হাঁ কি না উত্তর চান, এবং সে উত্তর প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হউক। × × × উপসংহারে বিজয়বাবুকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করি, তিনি কিরূপে এইরূপ মত শুনিয়া এতদিন নিস্তব্ধ ছিলেন?"

১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে এই বিষয়েই বিজয়কৃষ্ণের আর একখানি পত্র প্রকাশিত হয়—"কেশববাবু সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তদ্বিষয়ে কেহ কেহ আমাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিতেছেন। সকলকে উত্তর দেওয়ার সুবিধা নাই বলিয়াই এই পত্রখানি পাঠাইতেছি। কেশববাবু সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। যাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করেন তাঁহারা অবশ্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। কেশববাবুর সহিত আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। × × × কেশববাবু স্বয়ং মুখে যে সকল কথা বলিয়াছেন এখন তাহা যদি অস্বীকার করেন, তবে সত্যেরই অবমাননা করিবেন। স্বয়ং ঈশ্বর তাহার সাক্ষী। আমাকে লোকে অস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাঁহার অনুসরণ করাকে কপটতা, মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি। যাঁহারা আমাকর্তৃক পত্রিকায় প্রকাশিত কথা কেশববাবুর মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ করেন নাই তাহাদিগের প্রতিবাদ করার অধিকার নাই। এজন্য কেশববাবুর নিকটই উত্তর চাহিয়াছি। বরং চন্দ্র সূর্যের প্রত্যক্ষতা বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু আমার উক্ত কথায় বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমি স্বয়ং স্বকর্ণে কেশববাবুর মুখে শ্রবণ করিয়াছি।

একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য দেবতা এবং পরিত্রাতা। এমন অবস্থায় একজন মনুষ্যের মানরক্ষার জন্য এত ব্যস্ততা কেন।

আমি আশা করি ব্রাহ্মসমাজকে মনুষ্যের আধিপত্য ও মধ্যবর্তীতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৫ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে বিজয়কৃষ্ণের স্বাক্ষরিত আর একখানি পত্র প্রকাশিত হয়—"কেশববাবু আমাকে যখন ভক্তি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন আমি সে সমস্ত উপদেশ তাঁহারই পরামর্শ মত খাতায় লিখিয়া রাখিতাম। সুতরাং আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ কেশববাবুর যে মধ্যবর্তীয় মত আমি প্রতিবাদ করিতেছি ১লা পৌষের ধর্মতত্ত্বে উক্ত মধ্যবর্তীয় মতকে বিশেষরূপে পোষণ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে কোনদিন মধ্যবর্তীয় মত প্রচলিত ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। এজন্য আমি ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত মধ্যবর্তীয় মত ব্রাহ্মসমাজের মত হইতে পারে কি না তাহার বিচার ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়দিগের প্রতি ভারার্পণ করুন। ধর্মতত্ত্ব যখন প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আর ব্রাহ্মদিগের নীরব থাকা উচিত নহে—

১৭ই পৌষ, ১২৮৫ নিবেদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

ধর্ম ও ঈশ্বর ব্যতিরেকে বিজয়কৃষ্ণের আর কোন কিছুই কাম্য ছিল না। এই সময়ের একটি বক্তৃতায় বিজয়কৃষ্ণ রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এই তিন ভ্রাতার কঠোর তপস্যার কথার অবতারণা করিয়া বলেন, বিভীষণ নিষ্কাম জিতরিপু, তিনি দেবতা উপস্থিত হওয়া মাত্র বলিলেন, আমায় দেবভক্ত কর, দেবতা প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; বিজয়কৃষ্ণও তাঁহার দেশবাসীকে, প্রাণপ্রিয় ব্রাহ্মধর্মকে এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণের ব্রাহ্মধর্মকে কেহ কোথাও শিথিল করিয়া দিতেছেন মনে করিলে তিনি তাঁহার প্রতিরোধ করিতেন। তাঁহার মতে অহংএর বিলুপ্তিসাধন, সর্বপ্রকার অভিমানশূন্যতা ধর্মলাভের, ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রথম সোপান। মনের এইরূপ কাঠামো লইয়া তিনি কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ এবং মধ্যবর্তীবাদকে সহ্য করিতে পারিলেন না। এইরূপ মতবাদকে তিনি অভিমানজ্ঞাপক মনে করিয়াছিলেন এবং গৃহীত হইলে ব্রাহ্মধর্মের প্রভূত অকল্যাণ হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। তাই তিনি একান্ত কর্তব্য বোধেই এই পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল, "বন্ধুগণ আমরা যেন সর্বপ্রকারের ইচ্ছা শাসন করিয়া একমাত্র ধর্মের জন্যই সাধনাতে প্রবৃত্ত হই। এজন্য অন্যে প্রশংসা করিবে কিনা, লোকের নিকট সম্মান পাইব কিনা, এ দিকে যেন আমাদের ভাবনা না থাকে।" এই সময়ের ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তিনি শঙ্কাযুক্ত ছিলেন। "বর্তমান ব্রাহ্ম-

সমাজের প্রতি সর্বসাধারণের ঘৃণা উপস্থিত হইয়াছে। × × প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি স্বীয় স্বীয় জীবনকে দৃষ্টান্তস্থল করিতে পারেন তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের দুর্নাম দূরীভূত হইবে। × × বিনয় ও মহত্ত্ব প্রচার জীবনের ভূষণ হইবে। আমরা অহঙ্কারী হইব না কিন্তু কল্পিত বিনয় দেখাইবার জন্য হৃদয়ের মহত্ত্বও নষ্ট করিব না। মধ্যবর্তীবাদ ও আদেশবাদে আত্মশ্লাঘার যে বীজ লুকাইয়া রহিয়াছে, বিনয় শিক্ষার পক্ষে তাহা অনুকূল নয়। বিজয়কৃষ্ণ তাই জাতীয় স্বার্থের জন্য কেশবচন্দ্রের ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তির মনেও ব্যথা দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার সারা জীবন তাঁহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে যে "কেবল ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যই তিনি কেশবচন্দ্রের সমালোচনা করিতেন।"

ঐ বৎসরের ৬ই পৌষ হইতে ১১ই পৌষ পর্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে ফরিদপুর গিয়া বক্তৃতাদি করেন।

ইহার কিছু পরেই তিনি ঢাকাপ্রকাশে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রখানি ১৮০১ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠ তত্ত্বকৌমুদীতে অংশতঃ উদ্ধৃত হয়। তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, "বিজয়বাবু লিখিয়াছেন, তিনি (কেশববাবু) স্পষ্টভাবে আমাদের কয়েকজন প্রচারকের নিকট একদিবস সন্ধ্যার পর তাঁহার কলুটোলাস্থ ভবনের তৃতীয়তল গৃহে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি কি তদ্বিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট মত থাকা উচিত। এই কথার পর তিনি বলিলেন, 'জীব তিন প্রকার—মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ। মুক্ত জীবেরা ঈশ্বরের পারিষদ, তাঁহারা চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে রহিয়াছেন, ঈশ্বর সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন যথা খৃষ্ট, চৈতন্য ইত্যাদি। আমি নিজেকে সেই খৃষ্ট, সেই চৈতন্য বলিয়া মনে করি, কারণ সেই আত্মাই আমি। এই মুক্ত জীবদিগের সহিত কতকগুলি পারিষদ থাকে যেমন খৃষ্টের জন, পিটার প্রভৃতি, চৈতন্যের অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি। ইঁহারা মুক্তজীবের, অবতারের সহায়,—তোমাতে (বিজয়কৃষ্ণে) সেই অদ্বৈতের স্পিরিট রহিয়াছে। এই পারিষদদিগকে মুমুক্ষু বলিয়া গণ্য করা যায়; সাংসারিক জীবদিগকে বদ্ধজীব বলা যায়। এই বদ্ধ জীবদিগকে উদ্ধারের জন্যই মুক্ত এবং মুমুক্ষু জীবের প্রয়োজন। ইহা পরমেশ্বরর বিধান। কালে কালে এই বিধান চলিয়া আসিতেছে। অন্যকালের বিধান অপূর্ণ ছিল, ব্রাহ্মসমাজে সেই বিধান পূর্ণ হইল। অতএব আমার সম্বন্ধে আর অন্যমত করিও না। আমার মৃত্যুর পর আমাকে লইয়া অথবা আমাকে ছাড়িয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইও না, আমাকে ছাড়িলে ব্রাহ্মসমাজের বিধান অস্বীকার করা হইবে। আমার এই কথা সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যেই ভয়ানক প্রতিবাদকারী রহিয়াছে। তিনি সে দিন মন্দিরে স্পষ্টই বলিলেন ব্রাহ্মসমাজ রথের গতি

একজন মনুষ্য কর্তৃক আবদ্ধ হইল। এই কথা বর্ত্তমান বিধানের প্রতিবাদ, অতএব তোমাদের একটি মাত্র আশঙ্কার স্থান রহিয়াছে। আমি এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম। আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রকাশিত হইবে, এই ভবিষ্যৎ বাক্য স্মরণ রাখিও।"

আচার্য কেশব সেন সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের রচনা ও উক্তিসমূহের একটু বিস্তৃত উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে এককালে যে দুই বিরাট পুরুষ একসঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতের মধ্যে কতদূর বিভিন্নতা আসিয়াছিল তাহা উভয়ের জীবনালোচনার পক্ষে, ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস রচনার পক্ষে, এমন কি বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিবৃত্ত সংকলনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ। নানান সংঘাতের ভিতর দিয়াই সত্যের আবিষ্কার। ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ভাবনা প্রকাশ লাভ করে। জাতিগত ভাবনার বিচিত্র গতিপথের সন্ধান করিতে গেলে, অবাঞ্ছিত হইলেও এইরূপ সংঘাতকে নির্বিকার মনে গ্রহণ করিতে হইবে, এড়াইয়া গেলে চলিবে না।

বাইশ

১৮৭৯ মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা আগমন করিয়া, "উৎসবের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।" তৎপর তিনি প্রায় একমাস কাল বাগআঁচড়া, নাড়াইল, যশোহর নগর ও যশোহর জেলার অন্য কয়েকটি স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। ১৬ই আষাঢ় পূর্ব বাংলা ব্রহ্মমন্দিরে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহা হইতে তাঁহার ধর্মমত যে কত দূর অসাম্প্রদায়িক ছিল তাহার আভাস পাই। ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা জ্ঞাপক বৃদ্ধ গৌতম হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্ম এক, ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ, ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মঃ। বৃদ্ধ গৌতম যেভাবে ব্রাহ্মণ নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা ব্রাহ্মনামকেও সেইভাবে গ্রহণ করিতে চাই। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ নাম এত আদরণীয় ছিল কেন? না, ব্রাহ্মণেরা সদ্গুণসম্পন্ন ছিলেন। যিনি যে দেশে এইরূপ গুণাক্রান্ত হইবেন, তাঁহাকেই আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া সম্মান করিব। অনেকের সংস্কার এই, যিনি ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন, তিনি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবেন, নানা প্রকার বাবুগিরি আয়ত্ত করিবেন। বাস্তবিকও ব্রাহ্মসমাজে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আর পূর্বকালে সেই সকল ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ

হইতেন যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়। আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বড়লোক হইব, বড়লোকের সহিত পরিচিত হইব, সভ্যতা শিক্ষা করিব, তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। আমরা তদ্বারা কেহ ব্রাহ্ম কিনা তাহার বিচার করিব না। আমরা গুণদ্বারা, গুণের তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মনাম দিব। আমরা কতদূর ব্রহ্মোপাসক, জিতেন্দ্রিয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রেমিক, সাধু, জ্ঞানবান, তাহা অন্যে বিচার করিয়া ব্রাহ্ম আখ্যা দিবে।"

শ্রাবণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে ব্রাহ্মণবেড়িয়া, পরে কুমিল্লা গমন করেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার এক সংবাদদাতা লিখিয়া পাঠান, "২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রিতে স্কুলগৃহে আর্য্যধর্ম বিষয়ে তিনি এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সময়েও বহুতর লোক সমাগম হইয়াছিল। ২২শে শ্রাবণ সমাজগৃহে উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। বিজয়বাবু এখানে আরও অনেকবার আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার ভক্তির ভাব, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, এবং বক্তৃতার মাধুর্য্য দেখিয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করেন।" তত্ত্বকৌমুদীতে মন্তব্য করা হয়, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে বিজয়বাবু সুস্থ শরীরে থাকিয়া সর্বত্র সত্য প্রচার করিয়া হতভাগ্য দেশের অশেষ কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য্য হউন।" এ যাত্রা তিনি ভাদ্রের প্রথম দিকে কুমিল্লা পরিত্যাগ করেন। কুমিল্লা গবর্নমেণ্ট স্কুলগৃহে নীতি ও ধর্মবিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহাতে প্রায় ৫০০ ছাত্র উপস্থিত হন। তাঁহার বক্তৃতা যে কত জনপ্রিয় ছিল ইহা তাহার সামান্য নিদর্শন। ২৭শে আশ্বিন ঢাকা ব্রহ্মমন্দিরে এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, "এই যে ব্রাহ্মধর্ম ইহা আধুনিক পঞ্চাশ বৎসরের নহে। ইহা মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম, ইহাকে আমরা ব্রাহ্মধর্ম বলি। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মধর্ম চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্মকে কেহ নূতন প্রকাশ করেন নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়কে এ ধর্মের প্রকাশক বলা যায় না। তিনি এ ধর্মের একজন প্রচারক মাত্র।" এই বক্তৃতায় তিনি ঈশ্বরের নিকট নূতন সত্যের জন্য আকুল মনে প্রার্থনা করিতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। "× × কারণ যতদিন আপনারা প্রত্যেকে সাক্ষাৎভাবে, প্রত্যক্ষভাবে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা পরমেশ্বরের নিকট নূতন সত্য লাভ না করিবেন, ততদিন আপনারা ব্রাহ্মধর্মের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন না।" বলা বাহুল্য ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত আন্তরিক আস্পৃহারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

১লা ফাল্গুনের অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, কুমিল্লা হইতে ফিরিয়া ঢাকায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি বরিশালে ব্রাহ্ম-

সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তিনি তথায় যাওয়াতে তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। বরিশাল হইতে তিনি ঢাকা গমন করেন। "কিয়দ্দিবস হইল তিনি কলিকাতা আগমন করেন। কলিকাতা হইতে সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি বাগআঁচড়া গমন করেন।" এইবার কলিকাতায় তিনি ৯ই মাঘের পূর্বেই উপস্থিত হন, কারণ ৯ই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় নয়জন ব্যক্তিকে ট্রাস্টি পদে নিযুক্ত করা হয়—বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ১১ই মাঘ তারিখে আচার্যের বেদী হইতে বিজয়কৃষ্ণের উপদেশের পর বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীকে প্রচারব্রতে প্রকাশ্যরূপে বরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়োচিত প্রার্থনাপূর্বক একটি বরণপত্র পাঠ করেন। বাহুল্য বোধে তাহা আর উদ্ধার করিলাম না; তবে ইহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ঈশ্বর বা মানবাত্মার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্তী স্বীকার না করিবার অনুরোধ আছে। কলিকাতা হইতে এই সময়েই তিনি নবদ্বীপের মহেশপুর গ্রামে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন। এখানে একদিন তিনি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হইতে ব্রহ্মপূজা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে অনেক বক্তৃতাতেই বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মপূজার উৎকর্ষ প্রকাশ করিতে থাকেন। পরে মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মপূজা নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিতরণ করেন।

এই সময় হইতেই তিনি উপলব্ধি করেন যে ব্রাহ্মধর্মের বাণী দেশের সকল স্তরের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইলে শহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে প্রচারে যাইতে হইবে। তিনি এই সময়ে এক প্রচার বিবরণীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "বর্তমান প্রচার প্রণালী উৎকৃষ্ট নহে। যেখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে সেই সকল স্থানে প্রচার করিলে ব্রাহ্মধর্ম বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইবে না। "আমি সম্প্রতি হুগলী জেলার অন্তর্গত কয়েকটি পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আকনা গ্রামটি অতি সুন্দর।" ৯ই চৈত্রের পূর্বে তিনি ঢাকা ফিরিয়া থাকিবেন কারণ ঐ তারিখে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশে তিনি থিওডোর পার্কারের গ্রন্থ হইতে সেন্ট-পলের জীবন আলোচনার অনুবাদ করিয়া বলেন যে ধর্মের জন্য সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে ঐশী শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। 'মহাত্মা পল প্রহ্লাদ, চৈতন্য, নানক, লুথর প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ এই ঐশী শক্তির প্রভাবেই জগৎকে বিকম্পিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই ঐশী শক্তি প্রবেশ না করিলে ব্রাহ্মসমাজ জাগিবে না। ব্রাহ্মসমাজে যে কয়েকদিন ঐশী শক্তি ছিল, তখন ইহার আকর্ষণ

ছিল। এখন আমাদের দোষে, সত্য সাধনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ শক্তিহীন। ব্রাহ্মদিগের সত্যের প্রতি এত অনাদর, যে অনেকের জীবনে লক্ষ্য স্থির নাই। আজ ব্রাহ্মসমাজে মধ্যবর্তীর মত আসিল, ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন। আজ ব্রাহ্মসমাজে গুরু-সত্যের মত আসিল ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন, আজ ব্রাহ্মসমাজে কর্তাপূজার মত আসিল, ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন। ধিক ব্রাহ্ম, তোমার শক্তিকে ধিক।" বলা বাহুল্য ব্রাহ্মধর্মের স্থির লক্ষ্য যে ব্রহ্মোপসনা তাহার হানিকর সকল মতই বিজয়কৃষ্ণের নিকট আলোচ্যকালে সমান নিন্দার্হ। বিজয়কৃষ্ণ যে তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু কেশবচন্দ্রের মত ও কার্যকলাপের ঐ সময়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিলেন তাহা ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য। এই সত্য ভুলিলে বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত অবিচার করা হইবে? বিজয়কৃষ্ণের উদ্দেশ্যের সাধুতার অকাট্য প্রমাণ তাঁহার গোটা জীবনটাই। ঈশ্বরের অন্বেষণ ছিল বিজয়কৃষ্ণের জীবনের একমাত্র অভিপ্রায়। অভিপ্রায়ের এই একাগ্রতাকে যিনিই তাঁহার বাক্যে বা কার্যে স্বল্প পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ করিতেন, তিনিই বিজয়কৃষ্ণের সমালোচনার পাত্র হইতেন। ধর্ম তাঁহার নিকট জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল না, একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি বুঝিতেন ধর্ম সহজ প্রাপ্য নয়, জীবনের সমগ্র অধ্যবসায় ধর্মার্জনে নিয়োজিত করিলেও তাহা অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, সুতরাং সেই প্রয়াসকে কি আবার বিভাগ করা চলে? সাধারণ জীবনের পক্ষে এই আদর্শ প্রযোজ্য নয়, এবং এই জন্যই আপন বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত বিজয়কৃষ্ণের মতবিরোধ হইত। তাঁহারা জীবনকে ধর্মের ভিত্তিতে গড়িতে পারিলেই প্রয়াস সার্থক মনে করিতেন, আর বিজয়কৃষ্ণ ধর্মের শিখরদেশে না উঠিলে কিছুই হইল না ভাবিতেন। আর সেই শিখর কি এখানে। বিজয়কৃষ্ণ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যাঁহারা পর্বতারোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সম্মুখে যখন একটি শৃঙ্গ দেখা যায় তখন মনে হয় এই একটি শৃঙ্গের উপর উঠিলেই কাজ শেষ করিলাম, কিন্তু সেটির উপর উঠিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পশ্চাতে অন্য এক শৃঙ্গ রহিয়াছে। এইরূপ কত শৃঙ্গ রহিয়াছে সংখ্যা করা যায় না। এইরূপ ধর্ম সম্বন্ধেও মনুষ্য যখন একটি অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পরপারে কতকগুলি অভাব রহিয়াছে, এগুলি আয়ত্ত করিলে আবার আরও কত নূতন অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য এইরূপ অনন্তকাল উন্নত হইবে। × × মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে, অভাবও উচ্চতর হইবে। তখন সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ না করা, সর্বত্র সকল সময়ে তাঁহাকে উপলব্ধি না করা, ভ্রাতার মুখ দর্শনে ঈশ্বরভক্তির উদ্রেক না হওয়া প্রভৃতি উচ্চতর অভাব সকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। মুক্তি কি? না, পরমেশ্বরের প্রদত্ত স্বাধীনতা বা সমঞ্জসীভূত জীবন। পরমেশ্বরের

দাসত্ব লাভেই মুক্তি। শরীরের রোগ প্রথম দূর হইলে যেমন কান্তি হয়, সবল হয়, সেইরূপ আত্মার মুক্তি হইলে তাঁহার ক্রমিক উন্নতি আরম্ভ হয়।" বিজয়কৃষ্ণ যেন আপনার সময়েব নচিকেতা, ধর্ম ব্যতিরেকে আর তাঁহার কোন কামনা নাই। এই ধর্ম ছাড়া আর কোন দিকেই মুখ ফিরাইতে চান না। তাঁহার এই কঠোর আদর্শের পথে সমানে পাল্লা দেওয়া তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগেব পক্ষেও দুরূহ ছিল, সাধাবণের পক্ষে ত বটেই। আপন বন্ধুগণের নিকটও তিনি অনেক সময় দুর্বোধ্য ও অস্থির বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া যাহা বুঝিতেন, তাহা সাধারণ ধাবণা হইতে বেশ একটু ভিন্ন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মধর্ম যে ভারতবর্ষে চিবকাল প্রচলিত তাহা আমরা একটু পূর্বে দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, পূর্বকালে মহর্ষিগণ বিবেকের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল সত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বামমোহন বায় পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। এই পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মধর্মে কোন নূতন সত্য আবিষ্কার হয় নাই। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরান জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি হইতে ব্রাহ্মধর্মকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু একটিও নূতন সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই।" মূলতঃ হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে লালিত বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মকে অন্ততঃ এইসময়ে হিন্দুধর্ম হইতে সম্বন্ধরহিত নূতন কোন ধর্ম মনে করিতে ছিলেন না, হিন্দুশাস্ত্রে নির্দেশিত একেশ্বব ব্রহ্মপূজাকেই ব্রাহ্মধর্ম মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মধর্ম যে তখন পর্যন্ত কেবলমাত্র একটা মত বা বিশ্বাসে পর্যবসিত ছিল, প্রত্যক্ষ অনুভূতির দিকে কেহ সে পর্যন্ত চরম চেষ্টা করেন নাই, সেই মাবাত্মক স্বীকৃতিও রহিয়াছে উপরেব উদ্ধৃত অংশে। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য যে মূল্যের প্রয়োজন সে মূল্য সে পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মে কেহই দিতে পারে নাই। সেই উত্তুঙ্গ পথে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার মত বন্ধুর অভাব বিজয়কৃষ্ণ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্মবন্ধুদিগের সহিত বহু উর্ধ্বে উঠিয়া বিজয়কৃষ্ণ দেখিলেন উর্ধ্বতম শিখরে উঠিতে এখনও অনেক বিলম্ব। বুঝিলেন ঐখানে উঠিতে হইলে আপনার পথ আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে সেই পথের পথিকৃৎ হইবার সংকল্পও হয়ত তিনি ঐ সময়েই করিলেন।

১৮৮০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক রিপোর্টে দেখি, "তিনি গত বৈশাখ মাসে সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের ৬ষ্ঠ সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করেন। তথায় দুই দিবস ধর্মজীবন ও ব্রহ্মপূজা বিষয়ে দুটি বক্তৃতা করেন। পরে ২১শে বৈশাখ সমস্ত দিবসব্যাপী উৎসবে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের অন্য কোন বিবরণ প্রাপ্ত না হওয়াতে এবার সবিশেষ লিখিতে পারিলাম না।"

পরের কয়েক মাসের ভ্রমণ বিবরণের সংবাদ তত্ত্বকৌমুদীতে এইরূপ লিখিত হয়,—"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গত আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাসে রঙ্গপুর গমন করিয়া মানবজীবন বিষয়ে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন এবং দুই দিবস তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন। রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রায় একপক্ষকাল অবস্থিতি করেন। কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীতে দুই দিবস উপাসনা ও ধর্মালোচনাদি দ্বারা অত্রত্য ব্রাহ্মগণের ধর্মভাব উদ্দীপনের সহায়তা করেন। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ঢাকাতে অবস্থিতি করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কাজ করেন—রবিবার পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, মঙ্গলবার বাসায় ব্রহ্মসংকীর্তন ও প্রার্থনা, বৃহস্পতিবার বাবু আনন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে আলোচনা, রবিবার প্রাতে গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা। ধর্মবল ও আর্য্যজাতির ব্রহ্মপূজা এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং ১০ই ও ১১ই আশ্বিন শারদীয় ব্রহ্মোৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।"

১৪ই আশ্বিন ঢাকা হইতে তত্ত্বকৌমুদীতে এক পত্র পেরণ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বিজয়কৃষ্ণ তখনও জাতিভেদ ও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। ঢাকার নববিধান সমাজে ইহাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। বিজয়কৃষ্ণের মানসিক ভাবধারার ক্রমবিবর্ধনের সম্পূর্ণ ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চাহিবেন তাঁহারা পত্রটি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। পত্রটি দীর্ঘ, তাই যথেষ্ট সংক্ষেপ করিয়া নিম্নে উদ্ধার করা গেল—

"ব্রাহ্মবন্ধুগণ, আজ আবার আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা আমার বিনীত আহ্বানে উত্তর দান করুন।

সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, নিরাকার নিরঞ্জন, মঙ্গলময়, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা করা এবং সেই ব্রহ্মপূজা প্রচার করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য।

এই ভারতবর্ষে আর্য্য মহর্ষিগণ বহুকাল পূর্বে ব্রহ্মপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজা ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ নাই, এই মত সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে আর্য্য স্বাধীনতা তিরোহিত হইল। মহর্ষিদিগের আশ্রম সকলও শূন্য হইয়া গেল। অজ্ঞান অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। এই সময়ে জ্ঞানহীন লোক ব্রহ্মপূজার মর্ম ধারণা করিতে সক্ষম হইল না। অমনি ধর্মশাস্ত্রের একস্থানে লিখিত হইল, যে "উপাসকানাং হিত্যার্থে ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা"—উপাসকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিবে। প্রথমে কোন প্রতিমার সৃষ্টি হয় নাই, ব্রহ্মের এক একটি স্বরূপকে এক এক দেবতা কল্পনা করিয়া ধ্যান ও পূজা

রচনা করা হইল। ক্রমে সেই ধ্যান প্রতিমায় পরিণত হইল। এখন সমস্ত আর্য্য সন্তান ব্রহ্মপূজা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রতিমাপূজায় নিযুক্ত হইয়াছেন। শাস্ত্র সকল পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ব্রহ্মপূজা ভিন্ন মুক্তি হয় না, প্রতিমাপূজা অজ্ঞানীদের জন্য। লোক আর শাস্ত্রের শাসন মানিতেছে না। কারণ ব্রহ্মপূজায় পরিশ্রম আছে, তপস্যা আছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রহ্মপূজা প্রচারের আর একটি প্রতিবন্ধক জাতিভেদ। সর্ববব্যাপী ব্রহ্মকে পূজা করিলে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং জাতিভেদ থাকিলে ব্রহ্মপূজায় বিঘ্ন হইবেই হইবে।

অর্ধশতাব্দী অতীত হইতে না হইতে ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রবেশ করিতেছে। এখন সাবধান না হইলে ব্রাহ্মধর্মও যে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ঢাকাতে কেশববাবুর শিষ্যগণ দুর্গা কালী প্রভৃতি পৌত্তলিক নামে নগর কীর্তন করিয়াছেন। × × × রঙ্গপুর সপ্ত-পুষ্করিণীস্থ একজন কেশববাবুর শিষ্য একজন সচ্চরিত্র মুসলমান ব্রাহ্মকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। কারণ তাহাতে কেশববাবুর মত নাই। মুসলমানের সহিত আহার বিহার করিলে হিন্দুরা বিরক্ত হয় এবং সাত্বিক ভাব থাকে না।

কেশববাবু নিজেও কালী লক্ষ্মী সরস্বতীর ব্যাখ্যা করিতেছেন। সম্প্রতি অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। কেশববাবু এবং তাঁহার শিষ্যগণ ব্রাহ্মধর্মকে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

কেশববাবু নূতন বিধান বলিয়া যাহা প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। যাহা কখনও কোন সম্প্রদায়ে প্রচারিত হয় নাই তাহাই নূতন। প্রাচীন মহর্ষিগণ এবং পূর্বাবধি ব্রাহ্মসমাজেও অনেকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ একত্র সাধন করিতেন, অথচ উহাকেই নূতন বিধান বলিয়া ভ্রম জন্মান হইতেছে।

ব্রাহ্মবন্ধুগণ, যাহাতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য আপনারা বিশেষ সতর্ক হউন। এখন নীর থাকিলে ইহার পর অনুতাপ করিতে হইবে।

মনুষ্য যতই বড় হউক না কেন, সে কখনই ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না ঈশ্বর অনন্ত অসীম, মনুষ্য পরিমিত ক্ষুদ্রকীট। বিশেষতঃ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বয় অক্ষম হইয়া মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ইহা অতি অদ্ভুত মত। ঈশ্বরের অবতা স্বীকার করা আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করা একই কথা।

মুসলমান প্রভৃতি হিন্দুদিগের অস্পৃশ্য জাতিকে ব্রাহ্ম করা হইবে না, ব্রাহ্ম হইলেও তাহার সহিত আহার করা যাইবে না, এইরূপ নিয়ম করিলে ব্রাহ্মধর্মকে সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট হইয়া যায়।

সর্বপ্রকার কুসংস্কার অসত্য দূর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম স্বীয় মহিমা বিস্তার করুক। আমরা যেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পথে সহায়তা করিতে পারি। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম ভবিষ্যতে কলঙ্কিত হইতে পারে এমন কোন কথা ব্রাহ্মধর্মে প্রবিষ্ট হইতে দিব না। যতদিন জীবিত থাকিব ব্রাহ্মধর্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিব।

যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্মত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এক মুহূর্তকালও উদাসীন থাকা উচিত নহে। অতএব বন্ধুগণ, সাবধান হউন। ঈশ্বরের নিকট দিবা নিশি প্রার্থনা করুন। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করুন।

ঢাকা ১৪ই আশ্বিন, ১৮০২ শক নিবেদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফরিদপুর গমন করেন, পরে বাগআঁচড়া হইয়া কলিকাতা গিয়া তথায় মাঘোৎসবে যোগদান করেন। তত্ত্বকৌমুদীর ১৮০২ শকের ১৬ই পৌষ সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটুকু দেখা যায়,—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত * বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ফরিদপুর সমাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথাকার উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন। সেখানকার উৎসব সমাধা করিয়া তাঁহার বাগআঁচড়াতে যাইবার সংকল্প আছে। তদনন্তর তিনি কলিকাতা আসিবেন, এখানে সকলে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবেন।"

কলিকাতায় আসিয়া ১১ই মাঘ যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয় বস্তুতঃ এক ঈশ্বরের উপাসনা। মুসলমান ধর্মগ্রন্থ হইতে ইব্রাহিমের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া জগতের একমাত্র স্রষ্টার উপস্থাপন করিয়া বলিতেছেন, পরমেশ্বরকে যাহারা সূক্ষ্মরূপে বুঝে না, তাঁহাকে তাহারা স্থূল বস্তু দ্বারা পূজা করে।

* তত্ত্বকৌমুদীর কোন এক সংখ্যায় দেখিয়াছিলাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গণতান্ত্রিক মনোভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম কাহাকেও বিশেষ শ্লাঘার সহিত উল্লেখে আপত্তি করায়, সম্পাদকীয় মন্তব্য হয় যে বিশেষ বিশেষণের সহিত কাহাকেও উল্লেখ না করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ নিয়ম হইলেও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করা হইবে। মন্তব্যের নকল না রাখায়, উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল—লেখক।

নিরাকার নির্বিকার পরব্রহ্মের পূজা কর, তাঁহার জন্য রোদন কর, কৃতার্থ হইবে। × × মনুষ্যকে তুমি অর্চনা করিও না। ব্যাকুলতার সময় তুমি ভাবিতে পার, ইহাকে পূজিলে ঈশ্বর পূজার সাহায্য হইতে পারে, তাহা হইবে না। তাহা হইলে সর্বনাশ হইবে। পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, সমস্ত হইতে প্রিয় বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। × × তাঁহার সত্তাতে আজ মন্দির পরিপূর্ণ, তাঁহাকে ভাল করিয়া প্রাণের প্রাণরূপে অনুভব করি। তিনি ভিন্ন সুখ নাই, বুঝি আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট যাইয়া জীবনের আনন্দ পাই, সকলভাবে তাঁহাকে ডাকি। × × তিনিই মঙ্গলময় প্রাচীন দেবতা, ঋষিরা ইহাকেই পূজা করিতেন। যখন ভারতের সুখ সৌভাগ্য ছিল, তখন ইহারই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।" ১৮ই মাঘ অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের হইয়া একটা আত্মানুসন্ধান দেখি। তিনি বলিতেছেন, এখন প্রশ্ন এই, আমরা কেন ব্রাহ্ম হইয়াছি? আমরা পাপ তাপে কাতর, দুঃখ শোকে জর্জর, তাই আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছে। আমি কতকগুলি ব্রাহ্মের জীবনের পবিত্রতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিজের জীবনের চিকিৎসার্থ এখানে আসিয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর এখানকার চিকিৎসক, যিনি এইভাবে এখানে আসিবেন তিনিই ঔষধ অজস্ররূপে প্রাপ্ত হইবেন। মুমূর্ষু দেখিলেই তিনি ঔষধ দেন। কিন্তু আমাদের কি দুর্বুদ্ধি কোথায় সেই ঔষধ সেবন করিব, না ফেলিয়া দিই। কত লোককে কষ্ট দিলাম, মা কাঁদিলেন, ক্রন্দন শুনিলাম না, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। পিতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয়স্বজনের হৃদয় ভাঙিয়া আপনার হৃদয়ের ক্ষত চিকিৎসার জন্য এখানে আসিলাম, কিন্তু আমাদের কি দুর্বুদ্ধি, তিনি ঔষধ ঢালিলেন, আমরা তাহা পান করিলাম না। বন্ধুগণ, জিজ্ঞাসা করি এই যে এতদিন হইল চিকিৎসা করাইতেছি, ইহাতে রোগ সারিয়াছে কি? × × যে মহাপাপী ছিলাম তাই যদি রহিলাম, তবে হইল কি? লাভের মধ্যে এই হইল যে বাহিরে লোকে বলিবে, ঐ দেখ ও লোকটা অনেক দিন যাবৎ ঔষধ খাইতেছে কিন্তু তাহার রোগ সারিল না। তবে বোধ হয় এখানকার ঔষধে রোগ যায় না। এ যে সর্বনাশের কথা, আমাদের জীবনদ্বারা অসত্য প্রচার হইল। বন্ধুগণ, বিলম্ব করা উচিত নয়। এরূপ অনেকে আছেন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজেতে আসিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন; তাঁহারা ধন্য। কিন্তু আমাদের যে কিছুই হইল না। যদি একজন লোক পরিত্রাণ পাইয়া সমাজে থাকেন, তবে তাঁহার দৃষ্টান্তে সহস্র লোক আসিবে।" সকল পথিকৃতের ন্যায় বিজয়কৃষ্ণও অনুরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর প্রাপ্তি বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মে পূর্বগামী মহাজনদিগের

জীবনাদর্শ রূপ কোন রাজপথ তখনও প্রস্তুত হয় নাই—অনুগামীদিগের সৌকর্য্যার্থে সেইরূপ রাজপথ নির্মাণের জন্য বিজয়কৃষ্ণ কৃত সংকল্প এবং জগৎ জানে যে, যে পথ তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার বহু শিষ্যের হইয়াছিল। তাহা অবশ্য পরের কথা, বর্তমানে বিজয়কৃষ্ণ যেন একটু চিন্তা আকুলিত।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি কুমারী কোলেট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় বিজয়কৃষ্ণকে দলপতি করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কুমারী কোলেটের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিত। তাহার নিদর্শন স্বরূপ ১৮০২ শকের ১৬ই মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত এই সংবাদটি প্রয়োজনীয়, "বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন, ও বাবু কালীনারায়ণ রায় পোষকতা করিলেন যে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নারীকুলরত্ন শ্রীমতী কুমারী কোলেট ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের ও উন্নতির জন্য যে প্রকার কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করতঃ অনবরত যত্ন করিতেছেন ও তাঁহার প্রকাশিত গত বর্ষের ব্রাহ্ম বার্ষিকী যে প্রকার অধ্যবসায়, যত্ন ও সূক্ষ্মদর্শী বিবেচনার সহিত ব্রহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করিয়া যুনানীমণ্ডলীর জ্ঞাপনার্থ চেষ্টা করিয়াছে, তজ্জন্য এই সভা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন ও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। প্রস্তাব আনন্দহর্ষ করতালিসহ সর্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।"

১৮০২ শকের ১লা চৈত্র অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের ১৫ তারিখের তত্ত্বকৌমুদীতে এই সংবাদটুকু আছে "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ যাত্রা করিবেন। অনেকদিন হয় এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পুত্রের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি ঢাকা গমন করেন। তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি প্রচারার্থে বহির্গত হইবেন। বিজয়বাবু ঢাকা নগরীতে কয়েকদিন "ব্রাহ্মধর্ম ও কেশববাবুর নবাবধানে প্রভেদ কি," এই বিষয়ে দুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রায় ৪।৫ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। কেশববাবু যে ব্রাহ্মধর্ম হইতে বহুদূরে গমন করিয়া ভারতের সহস্র উপধর্মের মধ্যে আর একটি উপধর্মের সৃষ্টি করিতেছেন তাহা শ্রোতাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর হইতে কিঞ্চিন্নূন তিন বৎসর কাল ঢাকা শহরে অবস্থিতির পর বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে কলকাতায় ফিরিয়া আসেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ১৬ই চৈত্রের (১৮০২ শক) তত্ত্বকৌমুদীতে সে সংবাদ এইরূপে পরিবেশিত হয়,—"কতক দিন হইল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহাশয় ঢাকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আর শীঘ্র ঢাকা যাইতে পারিবেন না। প্রচারার্থ তিনি শীঘ্র কলিকাতা হইতে বহির্গত হইবেন।"

তাঁহার এই সময়ের এই দীর্ঘ ঢাকাবাসের উপর অতি সংক্ষিপ্ত অব্রাহ্ম মন্তব্য পাই বঙ্কিম যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "পিতা পুত্র" গ্রন্থে। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন, "ঢাকায় হিন্দু ব্রাহ্মে একটু ফুটন্ত অফুটন্ত ঘর্ষণ ছিল। একদিকে (পিতা গঙ্গাচরণের নেতৃত্বে) হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা ছিল।* অন্য দিকে স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা করিতেছিলেন।"

তেইশ

কলিকাতায় আসিয়াও বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের নববিধানের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা দিতে থাকেন। কেশবচন্দ্রের অনুচরগণ কেন বিজয়কৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ রূপে মনে করিতেন তাহার কারণ জানিতে চাহিলে বিজয়কৃষ্ণের কলিকাতায় প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা পাঠ করা প্রয়োজন। তত্ত্বকৌমুদী হইতে এই দুইটি বক্তৃতার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"গত ৯ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে "ব্রাহ্মধর্ম ও নববিধানে প্রভেদ কি"— এই বিষয়ে দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী এক বাগ্মিতা-পূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নববিধান যে ব্রাহ্ম ধর্ম নয়, নব বিধানীদিগকে ব্রাহ্ম বলিলে যে অনুচিত হয়, বক্তা ধর্মতত্ত্ব ও ইণ্ডিয়ান মিরার হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। শ্রোতাগণও আনন্দধ্বনি দ্বারা বক্তার প্রকাশিত মতের প্রতি পোষাকতা করিয়াছিলেন। ১৬ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় উপাসনালয়ে নববিধানের গূঢ়রহস্য এই বিষয়ে বিজয়বাবু আর একটি বক্তৃতা করিবেন।" দ্বিতীয় বক্তৃতাটি সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হয়, "বিগত ১৬ই চৈত্র পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নববিধানের গূঢ়রহস্য বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গৃহের নিম্নভাগ ও গ্যালারিতে লোকসমাবেশ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়া ছিল। প্রায় ১৫০০ লোক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উৎসুক

---

* অক্ষয়চন্দ্রের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ঐ সময়ে ঢাকায় সদরালা বা সাব্‌জজ ছিলেন। —লেখক।

হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা তিন ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। এতগুলি লোক এই দারুণ গ্রীষ্মকালে মুগ্ধ প্রায় হইয়া বক্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ তেজস্বী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ছিলেন। নববিধানীদিগের প্রচলিত মত যে কি ভয়ানক ও ব্রাহ্মধর্মের মূলক্ষয়কারী তাহা বক্তা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। এই বক্তৃতার পর কলিকাতায় নববিধানীদিগের আর কিছু করিবার নাই। × × বিজয়বাবুর বক্তৃতা দুটি শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।”

কলিকাতায় আসিয়া নূতন প্রচারকদিগের শিক্ষা ও পরীক্ষার ভার তাঁহার উপর পড়ে। ১৮০৩ শকের ১৬ই বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, “প্রচারার্থী শ্রেণী পুনরায় খুলিয়াছে এবং প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী পরীক্ষক। এবার দুটি ছাত্র* পরীক্ষা দিয়াছেন। স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন এবং তত্ত্ব-কৌমুদীতে তাহা ছাপা হয়। প্রশ্নগুলি এইরূপ,—শিক্ষার প্রয়োজন কি, ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকে বলে, জ্ঞানে ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি, ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মবাদীর প্রভেদ কি, ব্রহ্মদর্শন কিরূপে হয় এবং তাহার লক্ষণ কি, উপাসনা কাহাকে বলে, প্রীতি ও প্রিয়কার্য কাহাকে বলে, ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মানন্দের লক্ষণ কি, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছার প্রভেদ কি. শক্তি ও ইচ্ছা এক হলে ক্ষতি কি, জড়জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, মনুষ্য কোন কালে অভয়পদ প্রাপ্ত হয়, মানবাত্মার চরম লক্ষ্য কি, ভূমানন্দ ব্রহ্মানন্দ এই দুই পদের প্রকৃত অর্থ কি ?

কলিকাতায় তাঁহার কার্যাবলী নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে, “পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গত জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় অধিক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। উৎসবের কার্য্য ভিন্ন কলিকাতায় সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য, ছাত্রসভায় বক্তৃতা, এবং অন্যান্য উপায়ে এখানে ধর্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। × × তিনি চটা, মহেশতলা, হরিনাভি এবং কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবও সম্পন্ন করিয়াছেন।

চৈত্র শেষে তিনি পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথম হাজারিবাগে গিয়া পৌছান। তথায় তিনি বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ উপলক্ষে উৎসবে উপাসনা কার্য

---

* ইহাদের মধ্যে একজন শ্রীশশিভূষণ বসু বলিয়া মনে হয়, কারণ পর বৎসর ১৮০৪ শকের শ্রাবণ সংখ্যায় তত্ত্বকৌমুদী এইরূপ লিখে—প্রচার শিক্ষার্থী বাবু শশিভূষণ বসুর দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা জুলাই মাসের মধ্যে শেষ হইবে—লেখক।

সম্পাদন করেন। কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন এবং পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য আহূত হইয়া গৃহে গৃহে ধর্মপ্রচার করেন। সেখান হইতে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে গয়ায় লইয়া যাওয়া হয়। এই সময়ে গয়াতেও নববিধানীগণের সহিত সাধারণ সমাজের লোকেদের মত-বিরোধ বাড়িতে থাকে। গয়ার এক পত্রপ্রেরক এইরূপ লিখেন, "এই সময়ে কেহ কেহ উপাসক সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে জানিয়াও মনে মনে ভিন্ন সমাজ স্থাপনেব কল্পনা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা নিরুপায় হইয়া সরল অন্তরে বিধাতাকে ডাকে তাঁহাদের উপায় তিনি নিশ্চয়ই করেন। এই সময় শুনিতে পাওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হাজারিবাগে আসিয়াছেন। তিন বৎসর হইতে গোস্বামী মহাশয়ের আসিবার কথা ছিল কিন্তু সর্বজ্ঞ পুরুষের সুকৌশলে ঠিক উপযুক্ত সময়ে আহূত হইয়া তিনি গয়ায় আসিলেন। × × যিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ জানিত লোক, তাঁহারই গৃহে গোস্বামী মহাশয় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় বিষ্ণু পুবাণ, ভগবদ্গীতা, ভাগবত, উপনিষদ, আত্মপুরাণ, মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক সত্য সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। দুই একদিন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া যাঁহারা কখনও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, তাঁহারাও গোস্বামী মহাশয়কে সবান্ধবে আহ্বান করিয়া নিজ বাড়ীতে শাস্ত্রপাঠ ও সংকীর্ত্তনাদি সপরিবারে শুনিতে লাগিলেন, হিন্দুশাস্ত্রের ভিতর ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন। কাহাবও কাহারও ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি ও অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার সময় একজন প্রধান বাঙালী মহাশয়েব বাটীতে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় "ব্রাহ্মধর্মও নববিধানে প্রভেদ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় দুইজন নববিধানী ভ্রাতা ব্যতীত অধিকাংশ বাঙ্গালী, একজন সাহেব ও দুইজন শিক্ষিত মুসলমান, সর্বশুদ্ধ ৬০।৭০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে নববিধানের আচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুগণেব নিন্দা কথাই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তিগত কথা কিছুই ছিল না, কেবল নববিধানের যে মতগুলি ব্রাহ্মধর্ম বহির্ভূত ও তদ্বিরুদ্ধ তাহাই দেখান হইয়াছিল, এবং ঐ সকল মতেব সঙ্গে যাঁহাদের নাম গ্রথিত অগত্যা তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় কেবল কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধে এইরূপ বক্তৃতা যেখানে যান দিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার কিছু আমোদ নাই।

গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও সরল নিরহঙ্কাব স্বভাব এখানে অনেকেরই

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সহবাসে ও উপদেশাদিতে কয়েকটি আত্মার প্রকৃত উপকার হইয়াছে। ইনি ছাত্রের ন্যায় প্রায় সমস্ত দিন পাঠে মগ্ন। ইংরাজি না পড়িলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না. এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিবেন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পরব্রহ্মের শুভ ইচ্ছায় গয়া উপাসনা সমাজ নামে প্রস্তাবিত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। গোস্বামী মহাশয় এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াই চলিয়া গেলেন না। আরও প্রায় একমাস থাকিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রাহ্মদিগকে ও ধর্মানুরাগী বন্ধুদিগকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত করিয়া বাঁকিপুর হইয়া মতিহারী গমন করিলেন। বাঁকিপুরে দুইদিন থাকা হইল।"

১৮০৩ শকের কার্তিক মাসের তত্ত্বকৌমুদীতে বিজয়কৃষ্ণের যে স্বলিখিত ভ্রমণ বিবরণী প্রকাশিত হয় তাহা এইরূপ, "১লা জুলাই (১৮৮১) বাঁকিপুর হইতে মজঃফরপুরের জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় অতি সমাদরে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মধর্মের উদারতা, পবিত্রতা এবং নববিধানের কুসংস্কারপূর্ণ দূষিত মত বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। মজঃফরপুরে ব্রাহ্মসমাজ নাই। অন্য কোন ধর্ম সমাজেরও প্রাদুর্ভাব দেখিলাম না। শ্রুত হইলাম সুরাপানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। ত্রিহুতের প্রধান নগর মজঃফরপুরের, ধর্মহীনতা দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। রাজর্ষি জনক যে মিথিলা রাজ্যের রাজা ছিলেন, সেই মিথিলা রাজ্যের নামই ত্রিহুত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজর্ষি জনক যে তিনটি বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই ত্রিযজ্ঞ হইতে ত্রিহুত নাম হইয়াছে। ত্রিহুত রাজ্যে জনকপুরী, ধনুর্ভঙ্গ, গৌতম আশ্রম, এই সকল স্থানের এখন নাম মাত্র রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় মিথিলার আর সে ধর্মভাব নাই। ৫ই জুলাই মজঃফরপুর হইতে শ্যামপানি নামক গোযানে আরোহণ পূর্বক মতিহারীতে যাত্রা করিলাম। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে আমার বুকের ব্যথা বৃদ্ধি হওয়াতে পথিমধ্যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলাম। প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল, দয়াময় প্রভু কেন রক্ষা করলেন জানি না। তিনিই ধন্য! ৬ই জুলাই রাত্রি ১টার সময় মতিহারীতে বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ ঘটক মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ৭ই জুলাই প্রাতঃকালে উমাচরণবাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা করিলাম।" মতিহারীতে একমাসের অধিককাল অবস্থিতি করিয়া বিজয়কৃষ্ণ আর্য্যজাতির ভারতে ধর্মোন্নতি প্রভৃতি বক্তৃতা দান করেন এবং বিষ্ণুপুরাণ, মহানির্বাণতন্ত্র হইতে যোগ সাধন বিষয়ে এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ দেন। মতিহারীতে অবস্থান কালেই বিজয়কৃষ্ণ যোগমায়া দেবী লিখিত এক পত্র

পান, মতিহারীতে এই পত্র ২০শে জুলাই (১৮৮১) ডেলীভারী হয়। ইহাতে গোস্বামী পরিবারের দারুণ আর্থিক অনটনের একটি মর্মন্তুদ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোস্বামীজায়া লিখিতেছেন, "৫৫ টাকা যেরূপ মাসিক খরচের স্থির করিয়াছেন তাহাতে সকল হয় না। হিসাব দেখ :—

বাড়ী ভাড়া	১৪্ টাকা
দুধ	৭্ টাকা কি কখনও বেশী
তোমার ঔষধ	১০্ টাকা
ঝি	৫্ টাকা
ধোপা	১॥০ কি দুই টাকা
মন্দিরের গাড়ী ভাড়া	১॥০ টাকা
মা ও ছেলেদের খাবার	৬্ টাকা
কাপড় সকলের গড়ে	৩্ টাকা
	৪৮্ টাকা

তিন টাকা ধরিলাম, কিন্তু তাহাতে কার্য্য হয় না, তথাপি ঢাকা হইতে আসিয়া অবধি জামা কি জুতা হয় নাই। বাকী ৭ টাকায় কি আমরা দুইজন, ছেলেরা তিনজনের আহার হয়? সাধারণ সমাজের আয় অল্প জানি তথাপি নিতান্ত সংকুলান হইতেছে না, এজন্য লিখিলাম। তোমার ঔষধের জন্য উমেশবাবুকে যোগজীবন বলিবে। খরচের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত কি, ব্যাকুল হইও না, সকল ঈশ্বরের ইচ্ছা, তোমার যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে তাহাই আহার করিবে, এই বিনীত অনুরোধ। মার আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে। স্বাক্ষর শ্রীযোগমায়া গোস্বামী।" বলাবাহুল্য এই সাংসারিক অসাচ্ছল্য ছিল বিজয়কৃষ্ণের স্বেচ্ছাবৃত, কাজেই জ্বালাবোধের তিলমাত্রও ছিল না তাঁর মনে। এই পত্রেই কন্যা প্রেমমালা সম্বন্ধে যোগমায়া লিখিয়াছেন, "প্রেমমালার বাতের দোষ কি সর্বদা জলে থাকার দরুন বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে প্রাতে মুখ ফুলিয়া থাকে।" এ সংবাদ পাইয়াও নির্বিকার চিত্তে তিনি যথারীতি প্রচার কার্য্য করিয়া চলিলেন। ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মতিহারীতে থাকিয়া গাজিপুর যাত্রা করেন। তাঁহার প্রচার বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছেন, ১৯শে আগস্ট গাজিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ২০শে আগস্ট প্রাতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাসায় উপাসনা। অপরাহ্ণে গাজিপুরস্থ বাঙালী ভদ্র মহোদয় দিগের সহিত সাক্ষাৎ ২১ আগস্ট রবিবার প্রাতে ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বরবাবু হিন্দি ভাষায়

উপাসনা করিলেন। ১২।১৪ জন হিন্দুস্থানী উপস্থিত ছিলেন। আমি হিন্দি উপাসনায় যোগ দিয়া আনন্দলাভ করিলাম। আহারাদির পর সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে একজন ভক্তসাধক বাবাজীকে দর্শন করিতে গমন করিলাম। শ্রুত হইলাম ১২।১৪ বৎসর বাবাজী গাজিপুরে একটি গর্তের মধ্যে অবস্থিতিপূর্বক যোগসাধন করিয়া থাকেন। একটি ঠাকুরঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিয়া লইয়াছেন। দেবালয়ের মধ্যে হইতে দ্বারবদ্ধ করিয়া বাবাজী সুড়ঙ্গের মধ্যে যোগসাধন করেন। ২।৩ মাসও দ্বারবদ্ধ থাকে, কেহ কেহ বলেন প্রতি একাদশীতে দ্বার খোলা হয়। আমরা গিয়া দেখিলাম বাবাজী দ্বার খুলিবেন বলিয়া স্ত্রী পুরুষে বহু সংখ্যক লোক অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুরঘরের মধ্যে ঠনঠন শব্দ হইল, সকলে বলিল বাবাজী উপরে উঠিয়াছেন। সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কেরোসিন তৈলের উৎকৃষ্ট আলোকমালায় গৃহ উজ্জ্বল, গৃহমধ্যে সিংহাসনে রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি। অত্যুত্তম জড়োয়া সাটিন বস্ত্রে প্রতিমাগুলি সুসজ্জিত। জড় বস্তুতে দেব বুদ্ধি না থাকিলেও সেই সুন্দর সুসজ্জিত মূর্ত্তিগুলি দেখিতে ইচ্ছা হয়। বাবাজী দ্বার খুলিয়া আরতি করিলেন। পরে ঠাকুরদের সিংহাসনস্থ টানা পাখা টানিতে টানিতে উপবেশন করিলেন। বাবাজী অতি সুন্দর পুরুষ। একটি চক্ষু নাই. তথাপি তাহাতে শোভার হানি নাই। বাবাজী নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ প্রশ্ন করিলে বলেন, 'দাস কি জানে?' বাবাজীকে প্রশ্ন করিলাম, ধর্ম সাধকের প্রতিবন্ধক কি? বাবাজী অনেক বিনয়ের পর বলিলেন, 'হাম বারাই অর্থাৎ অহঙ্কার প্রধান প্রতিবন্ধক।' বাবাজী সকলকেই বাবাজী বলেন। একবার তাঁহাকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, বাবাজী তিন দিন অচেতন ছিলেন। চেতনা পাইয়া বলিলেন নাগবাবা কৃপা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দি ভাষায় কথা বলেন। প্রশ্ন করিলাম অনন্তস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে কিরূপে লাভ করা যায়? উত্তর করিলেন শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাকে লাভ করিতে হয়। একদিনে হয় না। প্রথমে নামে রতি, তাহার পর নামে অনুরাগ, তাহার পর নামে আনন্দ। নামে আনন্দ হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রভুর কৃপাতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। আরও অনেক কথা হইয়াছিল, বাহুল্য জন্য তাহা লিখিলাম না। সায়ংকালে গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিয়া ভগবৎ গীতা হইতে যোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলাম। উপাসনায় অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহারা আমার সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য এবং ধর্ম্ম পিপাসু।" ভগবদ্ভক্ত বাবাজীর এই সশ্রদ্ধ বিবরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিশেষতঃ 'জড় বস্তুতে দেহ বুদ্ধি না থাকিলেও সেই সুন্দর সুসজ্জিত মূর্ত্তিগুলি দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিজয়কৃষ্ণের

অনেকখানি মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। পৌত্তলিকতার প্রতি বিপন্নতা যেন অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে; বঙ্ক কর মহাশয় ব্রাহ্ম হিসাবে বিবরণের এইখানে কাঁচি চালাইয়াছেন, যেমন 'নাগ বাবা' কে 'নাগা বাবায়' রূপান্তরিত করিয়াছেন। ২২শে আগস্ট যমুনিয়া স্টেশনে উপস্থিত হইয়া সেখানে একদিন বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রেমমালার অসুখ বৃদ্ধির পুনরায় খবর টেলিগ্রামে আসিয়া থাকিবে, কারণ বিজয়কৃষ্ণ লিখিতেছেন, 'কন্যার পীড়ার সংবাদে হঠাৎ কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রিয়তমা কন্যাকে দেখিলাম না। কন্যা পরলোকগমন করিয়াছেন'। বিজয়কৃষ্ণের কন্যার মৃত্যু সম্বন্ধে ১৮০৩ শকের ১লা ভাদ্রে এইরূপ লেখা হয়, "আমরা অত্যন্ত শোকার্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তৃতীয়া কন্যা প্রেমমালা গত ৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার (২৩ আগস্ট) জ্বর বিকারে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৪।৫ দিন জ্বর হইয়াছিল, তাদৃশ গুরুতর পীড়া বলিয়া অনুভূত হয় নাই, ষষ্ঠ দিনে এককালে নাড়ী ছাড়িয়া যায় এবং বিদায়ের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন কোন চিকিৎসাই কার্য্যকরী হইল না। গোস্বামী মহাশয় তারে পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন, কিন্তু সে মৃত্যুর একদিন পরে। আশ্চর্য, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে শিশু উচৈঃস্বরে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেছিল। দয়াময় পরমেশ্বর পরলোকগত শিশুর নির্দোষ কোমল আত্মাকে তাঁহার মঙ্গল ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত পরিবারকে তাঁহার প্রেমসুধা পান করাইয়া সান্ত্বনা দান করুন।"

বিজয়কৃষ্ণের উপরিউক্ত প্রচার বিবরণীর শেষটুকু এইরূপ, "২৮শে আগস্ট রবিবার সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের উপাসনা করিয়া ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছি। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতে ছাত্রসমাজে পৌত্তলিকতা বিষয়ে, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পর কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যের জীবন অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিয়াছি। ১১ই পীড়ার জন্য কাজ করিতে অক্ষম ছিলাম। ১৮ই রবিবার প্রাতে ছাত্রসমাজে উপবীত বিষয়ে উপদেশ, সায়ংকালে উপাসনার পর অজামিলের জীবন লইয়া উপদেশ দিয়াছি। ২৫শে সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতে ছাত্র-সমাজে মহাপুরুষ ও পৌত্তলিকতা বিষয়ে উপদেশ ও সায়ংকালে ভাগবত হইতে কলির জীবের গতি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছি। দয়াময় প্রভু আমাদিগের সহায় হউন। তাঁহার প্রসাদে পবিত্র সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীতে প্রচারিত হউক।"

উপরিলিখিত বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে কলিকাতা ফিরিয়া বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা জাগাইতে চেষ্টা করেন। এ সম্বন্ধে

তত্ত্বকৌমুদীতে পৃথকভাবে মন্তব্য করা হয়, যথা, "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও যুবকদিগের উপাসনা সমাজের কার্য্যনির্বাহ করিতেছেন। কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ বোধহয় কলিকাতা ছাড়িতে পারিবেন না। বিগত রবিবার ছাত্রসমাজে পৌত্তলিকতা বিষয়ে তিনি একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। ছাত্রসমাজে যে সমুদয় উপদেশ হয় তাহা এত সুন্দর যে অনেকের পক্ষে তাহা অতি আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে ছাত্রসমাজ হইতে একখানি কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছে। তাহাতে ছাত্রসমাজের সুন্দর উপদেশগুলি বাহির হইবে।"

এই বৎসরের কার্ত্তিক মাসে তিনি "বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী বড় বেলুনী গ্রামে ব্রাহ্ম-সমাজগৃহের ভিত্তি স্থাপনার্থ আহূত হইয়া তথায় গমন করেন, এবং ২।৩ দিন অবস্থিতি করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন। ২৫শে নভেম্বর তিনি সিন্দুরিয়া পটী ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে সায়ংকালে আচার্য্যের কার্য্য করেন।" এই সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে পরে একদিন তাঁহার পরমহংসদেবের সহিত দেখা হয়।

এই সময়েই তাঁহার আশৈশব বন্ধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় লক্ষ্ণৌ নগরে দেহ রক্ষা করেন। তত্ত্বকৌমুদী অনুসারে, "মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে গভীর বিষাদ সঞ্চার হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকটি সভ্য, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের ভবনে (২৮নং ঝামাপুকুর) তাঁহার কল্যাণও সদ্‌গতি প্রার্থনার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে সম্মিলিত হন।"

ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণের শেষ দিকে তিনি জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তথায় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়া রামপুর বোয়ালিয়ার উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন, তথা হইতে রামপুরহাট ও বহরমপুর হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় মাঘোৎসবে যথারীতি অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি পুনরায় বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। এই বহরমপুরেই বিজয়কৃষ্ণ বাউল সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির পরিচয় লাভ করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই জলপাইগুড়ির উৎসবে যোগ দিবার জন্য গমন করেন। এই সমুদয় স্থান হইতে আসিয়াই বর্ধমান সমাজের উৎসব সম্পাদনার্থে যান, তথা হইতে রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন। ঐ সময়ের ত্রৈবার্ষিক রিপোর্টে লিখিত হয় যে তাঁহার কলিকাতা অবস্থিতি ব্রাহ্মগণের ধর্মভাব উদ্দীপনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্বাহক সভার অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও তিনি সভ্য হন, তবে এখন আর তাঁহার নাম তালিকার শিরোদেশে নয়, বারো জনের মধ্যে তিনি সপ্তম। বাকী নাম যথা—আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কালীশঙ্কর সুকুল, শিবনাথ শাস্ত্রী, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাকিশোর চৌধুরী, ফণীন্দ্রমোহন বসু, কেদারনাথ রায়। তিন বৎসরের মধ্যে গঙ্গার বুকে অনেক জল গড়াইয়া গিয়াছে। অন্য ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে এখন নামী হইতেছেন। এই সময়ে কলিকাতায় একটি উপাসনা সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী এইরূপ লিখে, "৩০শে মাঘ সন্ধ্যার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্য্য করেন এবং প্রত্যেক ভ্রাতাভগ্নী হৃদয়ে উৎসাহ, সরলতা ও বিনয়ের সহিত উৎসবে যোগদান করেন, এইরূপভাবে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই দিন হইতে উপাসকদিগের হৃদয়ে উৎসবের ভাব বিকাশ পাইতে থাকে।" বিজয়কৃষ্ণের উপাসনা ও উপদেশ মামুলি উপাসনা ও উপদেশ ছিল না, ঐকান্তিকতা উহা শোতৃমণ্ডলীকে সর্বদাই আশ্চর্য্যভাবে প্রভাবিত করিয়া ফেলিত—এইসব সমসাময়িক কাগজপত্রে এই স্বীকৃতিটা বারংবার নজরে পড়ে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৮।১৯ মার্চ তিনি সাপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কার্য্য উপলক্ষে তথায় গমন করেন। সেখান হইতে পাবনা, তথাকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সারিয়া কলিকাতা ফিরেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ জন্মোৎসব সম্পাদনার্থে যে কার্য্য প্রণালী প্রস্তুত হয় তাহাতে আচার্য্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম পাওয়া যায়। ১লা জ্যৈষ্ঠ পূর্বাহ্নে এবং ২রা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে তিনি উপাসনা করেন। আষাঢ়ের প্রথম দিকে তিনি বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগদান করিতে তথায় গমন করেন। ১৮৮২ এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জন্য যে প্রচার কমিটী গঠিত হয় তাহা এইরূপ: পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর যে চারিজন আচার্য্য নিযুক্ত হন তাঁহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ অগ্রগণ্য; বাকী তিনজন পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রাবণের মাঝামাঝি তিনি সৈদপুর ও দার্জিলিং গমন করিয়া থাকিবেন, কারণ ১৮০৪ শকের (১৮৮২) ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, সৈদপুর হইতে

একজন লিখিয়াছেন,—শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং বাবু কালীশঙ্কর সুকুল মহোদয়গণ ক্রমান্বয়ে এখানে আগমন করিয়া ধর্মপ্রচার করতঃ আমাদিগের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা অন্তরেই অনুভব করিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি নাই। কেন করি নাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে নিজের দোষ স্বীকার করাই কর্তব্য। ইতিমধ্যে আবার পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিস্বার্থভাবে ধর্মপ্রচার দেখিয়া নিতান্ত পাষণ্ড হৃদয়, যাহার ধর্মাধর্ম বিচার নাই—তাহার হৃদয়েও ধর্মভাব উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। গোস্বামী মহাশয় এক্ষণে শারীরিক অসুস্থ অবস্থাতেও যে প্রকার আগ্রহের সহিত ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে কেনা স্বীকার করিবে যে ধর্মের জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। যে কয়দিন তিনি এখানে ছিলেন সে কয় দিবসই তাঁহার কৃত পরব্রহ্মের উপাসনায় আমরা এ জীবনেই স্বর্গ ভোগ করিয়াছি। একদিন অত্রস্থ উন্নতি বিধায়িনী সভাগৃহে মহানির্বাণতন্ত্র পাঠ এবং বক্তৃতা করেন। পরব্রহ্মের পূজাই যে শ্রেষ্ঠ এবং আর্য্য ধর্মের সর্বপ্রধান শিক্ষা, ঐ বক্তৃতাতে তাহা অতি সুন্দররূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।"

দার্জিলিংএর প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে ১৮০৪ শকের ১৬ই ভাদ্র অর্থাৎ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তত্ত্বকৌমুদীতে এইরূপ লেখা হয়, "কিছুদিন হইল আমরা দার্জিলিং হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পত্রে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পত্র প্রেরক বলেন, পাহাড়ে গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের শরীর যদিও রুগ্ন ও অপটু ছিল, তথাপি তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম করেন নাই। প্রতিদিন হয় পারিবারিক উপাসনা, না হয় বক্তৃতা, না হয় সামাজিক উপাসনাতে যাপন করিয়াছেন। দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজগৃহে তিনি একদিন আর্য্যধর্ম বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতাতে ভারতবর্ষের উন্নতির ক্রম, অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পত্র প্রেরকের মতে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দার্জিলিং এ কখনও হয় নাই এবং বাংলাদেশেও প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। দার্জিলিং-এর বাঙালী ভদ্রলোকদিগের অনেকে এই সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দার্জিলিং হইতে গোস্বামী মহাশয় শিলিগুড়িতে আগমন করেন! পরে সৈদপুর সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ তথায় গমন করেন। ২১শে অক্টোবর ভবানীপুর ছাত্রসমাজের শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রাতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করেন।"

বিজয়কৃষ্ণের লোক প্রিয়তার প্রমাণ সম্বন্ধে ১লা অক্টোবর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত একখানি পত্র হইতে সামান্য উদ্ধার করি। পত্র প্রেরক শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "ঈশ্বর কৃপায় আপনাদের মধ্যে অনেকগুলি লোক আছেন, কিন্তু বহুদর্শী লোকের সংখ্যা এত অল্প যে তাহা গণনীয় নহে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু শিবচন্দ্র দেব এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভিন্ন বহুদর্শী বিজ্ঞলোক আর কই ?" বিজয়কৃষ্ণের বয়স ঐ সময় ৪১ বৎসর কিন্তু ধার্মিক হিসাবে সাধারণ্যে তাঁহার বিপুল খ্যাতি যে কোন ব্যক্তির ঈর্ষার বস্তু। শিবনাথ সত্যই বলিয়াছেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি শিরোমণি ছিলেন।

চব্বিশ

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বাংলার ধর্মাকাশে ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম সাক্ষাতের পর কেশবচন্দ্র তাঁহার এক প্রবন্ধে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে বিশেষভাবে সজাগ করিয়া তুলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চে বেলঘরিয়া বাগানে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করেন সেইদিন না হইলেও, অন্ততঃ তাঁর নিকটবর্তী কোন সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সর্বাগ্রগণ্য সহকর্মী বিজয়কৃষ্ণের সহিতও শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় হইয়া থাকিবে। ত্রৈলোক্যনাথ দেব মহাশয় তাঁহার 'অতীতের ব্রাহ্মসমাজে' লিখিয়াছেন যে, আমি যখন ঝামাপুকুরে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও উমেশচন্দ্রের সহিত সপরিবারে বাস করিতাম তখন পরমহংসদেব নরেনকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই আমাদের ওখানে আসিতেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একত্রে কীর্তন করিতেন। উপস্থিত শ্রোতাগণ সেই অপরূপ ভক্তি ও প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন। আমরা দেখিয়াছি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর অঘোরনাথ গুপ্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয় বিজয়কৃষ্ণ ও উমেশচন্দ্রের ঝামাপুকুরের বাটীতে। নরেন ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত শুরু করেন। সুতরাং দেব মহাশয়ের লিখিত বিজয়কৃষ্ণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনগুলি আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তাঁহার কিছু পূর্বের ঘটনা। দুঃখের বিষয় বিজয়কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে কেহই এই সকল মিলনের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। সেই হিসাবে শ্রীম তাঁহার রামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে বাংলার এই দুই

মহাপুরুষের কয়েকটি মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া উঁহাদিগের অনুরাগীগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কথামৃতে বিবৃত প্রথম মিলনের তারিখে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর। বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর গিয়াছেন। এমন সময় কেশব সেন মহাশয়ও আসিয়া হাজির হইলেন স্টীমারে করিয়া। উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে স্টীমারে করিয়া কিছুটা বেড়াইয়া লইয়া আসা। বিজয়কৃষ্ণের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়—সত্যের ও কর্তব্যের খাতিরে তিনি কেশবচন্দ্রের আচরণ ও মতামতকে কিরূপভাবে সমালোচনা করিতেছিলেন তাহার আভাস আমরা ইতিপূর্বেই দিয়াছি। কেশবের দলস্থ লোকেরা বিজয়কৃষ্ণকেই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ভাবিতেন তাহাও পূর্বে দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় কেশব-বিজয়ের মিলন যে নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ তাহা অনুমান করা যায়। তবে শ্রীম উহাতে মোটেই interested নন, কাজেই মাত্র ইঙ্গিত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের মনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কিছু মাত্র ছিল না, সুতরাং কোনরূপ ইতস্তত না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবের জাহাজে গেলেন। তার পর শ্রীমর কথায়, "সকলে কেবিন ঘরে প্রবেশ করিলেন। ×× ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, খানকতক চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) বসান হইল, কেশব একখানিতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। ×× কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত হইলেন।" যতই হোক বিজয়কৃষ্ণ এখন তাঁহার অতিথি, পূর্বের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের খাতিরেও কিন্তু কেশবচন্দ্র কোন শিষ্টবাদ করলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। অনেক পরে হয়তো বা আবহাওয়াটা কথঞ্চিৎ হাল্কা করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন "ওগো এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ যেন শিবরামের যুদ্ধ ইত্যাদি।" আশ্চর্য্যের বিষয় কেশবচন্দ্র তথাপি কোন কথা বলিলেন না, ইহাতেই বুঝা যায় বিজয়কৃষ্ণের উপর কেশবচন্দ্র কতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অবশ্য কেশবের মৃত্যুর কিছু পূর্বে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বন্ধুভাবে অনেক কথাবার্তা করেন, সে কথা পরে বলা যাইবে।

পরের দিন শনিবার সিঁথির ব্রাহ্মসমাজের যান্মাসিক উৎসব। তত্ত্বকৌমুদী হইতে জানা যায় যে "শনিবার প্রাতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রাত্রিতে পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী ও রবিবার প্রাতে নবদ্বীপ দাস আচার্য্যের কাজ করেন।" কথামৃতে দেখি পরমহংসদেব বেলা তিনচারটার সময় ঐ উৎসব দেখিতে আসেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন চলিয়া গিয়া থাকিবেন, কারণ ঐদিন যাবতীয় কথাবার্তা শিবনাথের সহিতই দেখা যায় বিজয়কৃষ্ণের কোন উল্লেখ নাই।

প্রায় একমাস পরে ২৬শে নভেম্বরের কথা শ্রীম লিখিয়াছেন। ঐ দিন মণিমল্লিকের সিন্দুরিয়া পটীর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন বিজয়কৃষ্ণ সে দিন উপাসনা করেন। শ্রীম বলিতেছেন, "বিজয় এখনও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন নাই।" বিজয়কৃষ্ণ এখনও দীক্ষাই পান নাই গৈরিক বস্ত্র ত পরের কথা। সমবেত সকলকে উপদেশ দিতে দিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, মতুয়া বুদ্ধির নিন্দা করিতেছেন, ঈশ্বরের আদেশ লাভের পূর্বে লোকশিক্ষা দেওয়ার নিষ্ফলতার কথা বলিতেছেন। আমরা দেখিয়াছি বিজয়কৃষ্ণের চিন্তাধারাও অনুরূপ উপলব্ধির পথে চলিতেছিল সুতরাং তাঁর মনে এই উপদেশ সাড়া পাইয়া থাকিবে। বিজয়কৃষ্ণের উপাসনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আচ্ছা তোমরা এত পাপ পাপ বল কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই অভিযোগ প্রায়ই করিতেন। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম যে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সমক্ষে বিজয়কৃষ্ণের সেই মলিন পঙ্কিল মনে ইত্যাদি গানটি একদিন গাহিবার পরও তিনি ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার বর্তমান অবস্থায় অসন্তোষ না আসিলে ঈশ্বরমুখী হইবার আশা কোথা? সংসারী ব্যক্তি যদি সংসারে আসক্ত হইয়া থাকায় অন্যায় বোধ না করিল, তবে আসক্তি ত্যাগের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে?

১৪ই ডিসেম্বর বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বর যান। ঐদিন গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম চরিত লেখক নবকুমার বাগচী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমর কথা হইতে বুঝা যায় বিজয়কৃষ্ণের নানান মতবাদের সহিত ইতিপূর্বেই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষের বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য সমাজের মুখপত্র তত্ত্ব-বোধিনীতে উহার কোন স্পষ্ট আভাস না থাকিলেও, বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদাদি আলোচ্য সময়ে ঐ পত্রিকায় বেশ কমিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীম লিখিতেছেন, "এখন সমাজের সহিত নানান বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম স্বীকার করিয়াছেন কি করেন, স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বা কার্য্য করিতে পারেন না।" বিজয়কৃষ্ণের পবিত্র বংশের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "বিজয় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন, কিন্তু মহাভক্ত পূর্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতে ছিল, শরীর মধ্যস্থিত

হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ, কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। × × আবার যখন শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।" মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের সন্ন্যাসী যিনি বিজয়কৃষ্ণের ধর্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আমন্ত্রণে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আসিয়া তাঁহার উপাসনায় যোগদান করেন, এবং যিনি বিজয়কৃষ্ণের গুরুকরণ হয় নাই; সেই জন্যই সকল বিগড়াইয়া যাইতেছে, বলিয়াছিলেন, "আউর দ্যাখ আসমান মে ইমারত বনানে কোই নেহি শেকতা, তোমারা গুরু করনে হোগা," এই মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এই সময়েই হইয়া থাকিবে।

দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের পূর্ব প্রতিকূলতা এখন স্পষ্টতই তিরোহিত। এখন তিনি বুঝিয়াছেন, "যে ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহ বাস ব্যতীত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ঔষধ নাই।" এখন একান্ত ব্যাকুলতায় তিনি ঐ ঔষধের অন্বেষণই করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে সেই ঔষধের ব্যবস্থাদাতা উপযুক্ত ভেষকের। এই সময়ের উল্লেখ করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিয়া থাকিবেন, যে বিজয় দ্বারে ঘা দিচ্ছে। বিজয়ের যে সে দ্বার পরে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল পরমহংসদেবের মুখেই তাহার স্বীকৃতি আছে, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। সুতরাং শ্রীম তাঁহার কথামৃত তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে নরেন্দ্রনাথের মুখে বিনা মন্তব্যে ঐ কথা কয়টি তুলিয়া দিয়া বিজয়কৃষ্ণের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বই ক্রম বিকাশমান, কালের উল্লেখ না করিয়া কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করিলে অনর্থক ভুল বোঝার অবকাশ থাকিয়া যায়। যদি নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বার ছিলেন, সমাজমন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতেন, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথের বিরাটত্বের কতটুকু প্রকাশ পায়?

যাক সে কথা,—এখন আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাউক। ঐদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণকে বলিতেছেন, আগে অত আসতে, এখন আস না কেন? তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে ত্রৈলোক্য দেব মহাশয়ের কথামত শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কলিকাতায় বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাইতেন, বিজয়কৃষ্ণও সেইরূপ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রায়ই আসিতেন। শ্রীম তাঁহার গ্রন্থে ঐ সকল মিলনের কয়েকটি মাত্রই আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

এই তারিখের বিবরণীর শেষে শ্রীম লিখিতেছেন, "বিজয় ঔষধ আনিয়াছেন, (পূর্বেই তিনি বলিয়াছেন বিজয় শূল বেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান, তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন, ঔষধ সেবনের সময় হইলেই খাইবেন।) ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিবেন। ঔষধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বিজয় গাড়ীভাড়া, নৌকা ভাড়া দিয়া আসিতে পারেন না, ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসিতে বলেন। এবাব বলরামকে পাঠাইয়া ছিলেন।" এইটুকু হইতে প্রথমতঃ বুঝা গেল যে বিজয়কৃষ্ণ শূল বেদনার জন্য যে ঔষধ সেবন করিতেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সাধকের সম্মুখেও খাইবার তিনি সাহস রাখিতেন। বিজয়কৃষ্ণেব বিপক্ষীয়গণ প্রয়োজন হইলেই তাঁহার এই ঔষধ সেবন সম্বন্ধে যে নানারূপ হীন ইঙ্গিত করিতেন তাহার আভাষ আমরা পূর্বে কিছু দিয়াছি, পরে আবার দিতে হইবে। ইহারা যে নিছক বিদ্বেষ প্রণোদিত তাহারই সামান্য প্রমাণ এইখানে মিলে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিজয়কৃষ্ণকে কতদূর প্রীতি করিতেন তাহারও আভাস উদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যায়। লোক পাঠাইয়াও তাঁহাকে মাঝে মাঝে আনিতেন।

ইহার পবেই বিজয়কৃষ্ণ প্রথম বোয়ালিয়া এবং পরে বাগআঁচড়া গিয়া থাকিবেন, কারণ ১৮০৪ শকের ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে এই সংবাদটুকু পাই, "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইতিপূর্বে বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তথাকার উৎসব সমাধা করিয়া কলিকাতায় সমাগত হইয়াই পুনরায় বাগআচড়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে আহূত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন।"

ইহার পরই ৩ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, ১৮৮৮র খবর, "অদ্য প্রাতে উপাসনালয়ে উপাসনা হয়, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কাজ করেন।" এইবাব মাঘোৎসবে বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে সংবাদ অত্যন্ত কম দেখা যায়। নিম্নলিখিত সংবাদটুকু দেখিয়া মনে হয় ঐ সময়ে তাঁহার শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না। সংবাদটি এই, "মাঘোৎসবের অব্যবহিত পরেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যে তাঁহার জীবনাশঙ্কা হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় এখন কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।" ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তথায় যান। এই সম্বন্ধে তত্ত্ব-

কৌমুদীর সংবাদটুকু এইরূপ, "উক্ত সময়েই রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা, বর্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ, পচম্বা, বোলপুর, মুর্শিদাবাদ, জামালপুর মধুপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু উৎসবে যোগ দিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মবন্ধু তথাকার উৎসবে নিম্নলিখিত কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, —৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রাতে সমাজের উপাসকগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দুই একটি বন্ধু পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া একটি বাগানে যান এবং সমস্ত দিন সেখানে উপাসনা, পাঠ, সঙ্গীত ও কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া শেষ বেলায় ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যাকালে সকলে মন্দিরে মিলিত হইলে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উৎসবের জন্য উদ্বোধন করেন, আরাধনার সময় উপাসকেরা এক একটি স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে ঐ সময় মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। দার্জিলিং ভ্রমণে বাহির হন, চৈত্র মাস শেষ হইবার পূর্বেই কারণ ১লা বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতেই দেখি, "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়জকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া দার্জিলিং সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছিলেন।" এইবারে দার্জিলিং গিয়াই বিজয়কৃষ্ণ এক বৌদ্ধ মহাপুরুষকে (লামা) দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। গোস্বামীভক্ত শ্রীধর ঘোষ তাঁহার "শ্রীশ্রীযোগমায়া ঠাকুরাণী" গ্রন্থে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক, কারণ এই দর্শনের অনতি পরেই শ্রীধরের সহিত বিজয়কৃষ্ণের জলপাইগুড়িতে দেখা হয় এবং বিজয়কৃষ্ণের স্বমুখে শ্রীধর এই ঘটনা শুনেন। শ্রীধর লিখিয়াছেন, "দার্জিলিং-এর নিকট প্রাচীন পৌরাণিক দুর্জয়লিঙ্গ পীঠস্থানে তিনি এক বৌদ্ধ মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি এই প্রকার বর্ণন করিতে থাকেন, এই পুরুষ প্রথমতঃ তাঁহার নিকট পঞ্চভৌতিক দেহে প্রকাশিত হইয়া তৎপরে একজ্যোতির্ময় রূপ তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোস্বামী মহাশয় বলিয়া থাকেন, যেন একটি লণ্ঠনের মধ্যে বাতি রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ধর্ম উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। তদুত্তরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন তোমার কি সদ্গুরু মিলিয়াছে? তিনি বলিলেন, সদ্গুরু অনুসন্ধানে আমি ভারতবর্ষের প্রচলিত সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশিয়াছি। আমার মনের মত গুরু কোন স্থানে

মিলিল না। যে কয়েকজন গুরুর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে তাহার একজনও আমার মনের মত হয় নাই। আমি সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানের জন্যই ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের এই উচ্চ শৃঙ্গে আসিয়াছি। অদ্য আপনাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইতেছে। আপনাকে আমি সদ্‌গুরুরূপে বরণ করিতেছি, আপনি আমাকে যোগ সম্বন্ধে শেষ উপদেশ প্রদান করুন। তাহাতে ঐ লামাগুরু বলিলেন, তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর, অচিরে তোমার গুরু মিলিবে, আমি তোমার গুরু নই কিন্তু তোমার সদ্‌গুরু পাইবার পক্ষে আমি তোমার সাহায্য করিব।" এইবার দার্জিলিং হইতে যে বিজয়কৃষ্ণ জলপাইগুড়ি আসেন, তাহাও ১৬ই বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীর এই সংবাদ হইতে জানিতে পারি, "উৎসবান্তে (দার্জিলিং-এর) শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সৈয়দপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচাব করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।" শ্রাবণ মাসে যখন দার্জিলিং গিয়াছিলেন তখন জলপাইগুড়ির কথা তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি না, সুতরাং চৈত্র মাসে দার্জিলিং গিয়াই তিনি লামাগুরুর সন্ধান পাইয়া থাকিবেন। শ্রীধর তাঁহার বিবরণে এই দুইবারেব দার্জিলিং যাত্রাকে মিশাইয়া ফেলিয়া সময়ের ভুল ইঙ্গিত দিয়াছেন। বলা বাহুল্য শ্রীধর স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এই বিবরণ বেশ কয়েক বৎসর পরে লিখেন। সে যাহা হোক, গুরুকরণে যে বিজয়কৃষ্ণের পূব বিরূপতা এখন সম্পূর্ণ তিরোহিত তাহা বুঝা গেল। তবে গুরুর মত গুরু চাই তাঁর, বিজয়কৃষ্ণের মনের মত গুরু কি শীঘ্র মিলে! তবে লামাগুরুর ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হয় নাই—সেই অসীম সমর্থ গুরু সত্যই অচিরেই মিলিয়া গেল। সে কথায় পরে আসিতেছি। তাহার পূর্বে আরও কয়েক মাসের খবর দিয়া লই।

আষাঢ়ের শেষের দিকে বিজয়কৃষ্ণ সিরাজগঞ্জ গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানকার স্কুলগৃহে আর্য জাতির চরিত্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জীবনীর একজন সংবাদদাতা বলেন উক্ত বক্তৃতা শ্রবণে তত্রস্থ লোক সকল বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

শ্রাবণের প্রথমার্ধে তিনি বাগআঁচড়া গমন করেন। সেখানে কয়েকটি ব্রাহ্মবিবাহে তিনি আচার্যের কার্য করেন। একটি বিবাহ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রতিকূল সমালোচনা করিতে দেখা যায়, যথা "বিগত ২৩শে শ্রাবণ বাগআঁচড়া গ্রামে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। শুনিলাম বিবাহ রেজিস্টারী করা হয় নাই। সামান্য কারণে বিবাহ রেজিস্টারী না করা কোন রকমেই উচিত নয়।" ব্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় আইন যে বিজয়কৃষ্ণের মনঃপূত ছিল না, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। ইহা সেই মনোভাবেরই প্রকাশ না অন্য কিছু সূচিত করে তাহা জানিবার উপায় নাই।

পঁচিশ

তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত পরের সংবাদটি বিজয়কৃষ্ণের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সংবাদটি এইরূপ,—"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বাগআঁচড়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া কয়েকদিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কলিকাতায় ছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি একটু সুস্থ হইয়াই বিহার অঞ্চলে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন। প্রচারার্থী বাবু শশিভূষণ বসু* ও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন।" পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না যে এই যাত্রাতেই বিজয়কৃষ্ণ গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তাঁহার ঈপ্সিত গুরু লাভ করেন। উপরের সংবাদটি ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে বাহির হয়, বাগআঁচড়ায় ২৩শে শ্রাবণ বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া, অসুস্থতা নিবন্ধন কলিকাতায় কয়েকদিন কাটাইয়া, তিনি খুব সম্ভব শ্রাবণের দুই এক দিন থাকিতে গয়াভিমুখে যাত্রা করেন। অর্থাৎ তাঁহার দীক্ষা কোন ক্রমেই ঐ বৎসরের (১৮৮৩, বাংলা ১২৯০) ভাদ্র মাসের পূর্বে হইতে পারে না। ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদটি এই রূপ, শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে অসুস্থতা নিবন্ধন গিরিডিতে কিয়ৎকাল বাস করিতে হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি বিহার প্রদেশে গমন করিবেন। সেখানে গয়াকে তাঁহার কার্যক্ষেত্রের মধ্যবিন্দু করিয়া বিহারের নানা স্থানে প্রচার করিবেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে তিনি ভাদ্রের শেষার্ধে গয়া পৌছান।

বিজয়কৃষ্ণের এই ভ্রমণের প্রথম দিকের বিবরণের জন্য আমরা তাঁহার সহকারী প্রচারক শশিভূষণ বসু মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। বসু মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের কোন চরিত লেখকই এই বিবরণটি উদ্ধৃত না করিয়াই পারিবেন না, এতই প্রয়োজনীয় এই বিবরণটি। বসু মহাশয় লিখিতেছেন, "আমরা প্রথমে মধুপুরে ** যাই। তথায় প্রায় পনের দিন উপাসনা কীর্ত্তন, আলোচনায় অতিবাহিত হয়। গোসাইজীর প্রাণস্পর্শী উপাসনা আলোচনা

* আমরা ইহাঁর প্রচারার্থী পরীক্ষা দেওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্পষ্টই তিনি এখন বিজয়কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে প্রচারকার্যে তালিম লইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীর মন্তব্য—"আমরা আশা করি তিনি এই সুযোগে দীর্ঘকাল বিহারে অবস্থিতি করিয়া হিন্দি শিক্ষা করিতে যত্ন করিবেন এবং যথা সাধ্য প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিবেন।" —লেখক।

** মধুপুর হইয়া গিরিডি যাইতে হয়।—লেখক।

এবং মধুর সংকীর্ত্তনে প্রতিদিন সায়ংকালে বহুলোক একত্রিত হইত; কীর্ত্তনে তিনি প্রায়ই আত্মহারা হইতেন। কীর্ত্তন উপাসনাদির সময় ব্যতীত অধিকাংশ সময় তিনি জঙ্গলে ধ্যানে মগ্ন রহিতেন; ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয় থাকা সত্বেও দিবাবসানেও গৃহে ফিরিতেন না।*

তৎপরে আমরা পচম্বাতে (গিরিডির উপকণ্ঠে) গিয়া শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু মহাশয়ের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করি। তথায় প্রতিদিন দশটার সময় সমবেত উপাসনা হইত; গোসাইজীর মুখে তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত শুনিয়া উপাসকগণের মন নিতান্ত আর্দ্র হইত। তিনি পদ্মাতে নিমজ্জিত হইয়া যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন এস্থানে অধিকাংশ সময় সেইটি গান করিতেন। মধুপুরে তাঁহার যে ব্যাকুলতা, ধ্যানমগ্নতা ও নির্জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এখানে উহার আরও বৃদ্ধি হইল, এবং সর্পের নির্মোক যেমন ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া যায় তেমনি যেন তাঁহার বাহ্য ব্যাপারের সহিত সম্পর্ক শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।" বসু মহাশয়ের এই উক্তিটুকু প্রমাণিত করে যে মধুপুর ও পচম্বায় তিনি প্রায় ২০।২২ দিন কাটান। শ্রাবণের দুই একদিন থাকিতে কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহাদের গয়া পৌঁছাইতে ভাদ্রের ২০ তারিখ হইয়া গিয়া থাকিবে।

গয়ায় তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে শশিভূষণ বসু মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন, "গয়ায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বক্ষিত প্রভৃতি তথায় স্থায়ীরূপে প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ীভাড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা গোবিন্দবাবুর গৃহে

* ব্রহ্মোপলব্ধি এবং ব্রহ্ম সম্ভোগের জন্য তাঁহাব গভীর এবং দীর্ঘকালব্যাপী ধ্যান তাহার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের নিকট অবিদিত ছিল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "একদিন ছাদে বসিয়া আলোচনা করিতে করিতে আমরা ধ্যানস্থ হইলাম। কোন দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল জ্ঞান রহিল না, অবশেষে তোপের শব্দে ধ্যান ভঙ্গ হইল, কিন্তু তখন ভোর ৫টা। কখনও কখনও বিজয়কৃষ্ণ এরূপ ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন যে সমাজে উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইত না। শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন, এরূপাবস্থায় তাঁহার হইয়া একদিন তিনি উপাসনা করিয়া আসেন, পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে শাস্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কই উপাসনার সময় হয় নাই?" কথা প্রসঙ্গে বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একবার বলিয়াছিলেন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু উপাসনা এত মিষ্ট লাগিল যে আর শুইতে ইচ্ছা হইল না সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল।—লেখক।

স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের আয়োজন, সামাজিক উপাসনাদির বন্দোবস্ত প্রভৃতি উপায়ে তথায় ব্রাহ্মসমাজের কাজের কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্প্রতি সম্ভবপর নহে। গোবিন্দবাবুর গৃহে ছাদের উপর প্রতিদিন সায়ংকালে ধর্ম সাধন বিষয়ে আলোচনা হইত। গোঁসাইজী আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন; অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। উপাসনা সময়েও তাঁহার দুই তিন ঘণ্টা ধ্যানে অতিবাহিত হইত; কিন্তু সাধারণ উপাসকগণের পক্ষে এত অধিক সময় ধ্যানে বসিয়া থাকা প্রীতিকর হইত না।

ইতিমধ্যে একদিন কথা প্রসঙ্গে গোবিন্দবাবু আকাশগঙ্গা পাহাড়ের বাবাজির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ঐ বাবাজির নিকট গমন করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে। গোস্বামীমহাশয় বাবাজির নাম শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন; এবং পরদিবস আমাকে লইয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যাত্রা করিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ঐ বাবাজি আমাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সরল দেহ ও সৌম্য মূর্তি দেখিয়া সহজেই আমাদের মন আকৃষ্ট হইল, গোঁসাইজী তাঁহার দর্শনমাত্র দূর হইতে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া গিয়া পায়ে পড়িলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি নিতান্ত অজ্ঞান কিছুই জানি না, আমাকে ধর্মশিক্ষা দিন, আমাকে ভক্তির পথ প্রদর্শন করুন।" বাবাজি তাঁহার কাতরোক্তিতে বিস্মিত হইলেন এবং পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, স্থির হও, স্থির হও, আমি তোমার মত ব্যাকুলাত্মা আর দেখি নাই। তোমার যদি ধর্ম না হয় তবে আর কাহার হইবে? তোমার নিশ্চয়ই ভক্তিলাভ হইবে, তুমি নিশ্চয়ই ধর্মলাভ করিবে। আমরা বাবাজির জন্য কিছু চাল ডাল সঙ্গে লইয়াছিলাম, উহা তাঁহাকে দেওয়া হইল; তিনি আমাদিগকে বিশ্রামার্থে উপবেশন করাইয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্রামের পর অদূরস্থ নির্ঝরের নির্মল বারিতে স্নান করিয়া আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হইল; এবং চতুর্দিকের পার্বত্য শোভা দর্শনে আমাদের মন পরমেশ্বরের অর্চনার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। গোস্বামীমহাশয় উপাসনা করিলেন। ইতিমধ্যে রন্ধনাদি সম্পন্ন হইলে আমরা আহারার্থে আহূত হইলাম; এবং জননী যেমন স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পরম যত্নে সন্তানের পরিবেশন করেন, বাবাজিও তেমনি আমাদিগকে পরিবেশন করিয়া পরিতোষপূর্বক খাওয়াইলেন। ইহার পর অভুক্তদের আহ্বানার্থ শঙ্খধ্বনি হইলে অন্যান্য অভুক্ত—যাহারা নিয়মিতরূপে সেই আশ্রমে অন্ন পাইত,

তাহারা আসিয়া উপবেশন করিল। বাবাজি সকলকে আহার করাইয়া পরে স্বয়ং আহার করিলেন। তাঁহার আশ্রমের এই নিয়ম ও ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইল পরমেশ্বর স্বয়ং এই নির্জন অরণ্যে তৃষ্ণার্তদের জন্য সুশীতল বারি এবং ক্ষুধিতদের জন্য অন্নছত্র খুলিয়া তাঁহার সদাব্রত রক্ষা করিতেছেন। ধন্য তাঁহার করুণা।

আহার ও বিশ্রামান্তে বাবাজির সঙ্গে গোস্বামীমহাশয়ের ধর্ম বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল। অপরাহ্নে আমরা তাঁহার পরামর্শে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে সাধুদর্শনে গমন করিলাম। এক সাধু ইহাঁকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আনন্দ রহ'। এই সাধুর সঙ্গেও তাহার ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। প্রদোষে আমরা নামিয়া আসিলাম, আসিতে পথে তিনি একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে মহাপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবোদয় হইয়াছিল, তিনি কৃষ্ণ বিরহে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণরে বাপরে কোথা গেলিরে বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। এইরূপে ভক্তের কাহিনী বলিতে বলিতে তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সাধু চরিত্র মালায় পাঠ করিয়াছিলাম ধর্মের জন্য উন্মত্ত হইতে হয়, আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। মনে হইল ইনি প্রকৃতই ধর্মের জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন। *

একদিন তিনি সংস্কৃতশাস্ত্র পড়িতেছিলেন, পড়িতে পড়িতে বলিলেন, শশি আমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে যে গেরুয়া পরিয়া প্রচার করি। ইহাতে সুবিধাও আছে, সঙ্গে বেশি কাপড় রাখিবার প্রয়োজন নাই। অধিক কাপড় না রাখিয়া অধিক বই রাখাই ভাল। এই বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন, আমাকে ফকির সাজাইয়া দাও।' সেই দিনই বাক্স খুলিয়া কতক কাপড় বিলাইয়া দিলেন, আর অবশিষ্টগুলি গেরুয়া রঙে ছোপাইয়া লইলেন। গোবিন্দবাবু কোর্ট হইতে আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'এ যে সব লালে লাল হইয়া গেল।'

একদিন গেরুয়া পরিয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যাইতে পথে একজন লোক আট আনার পয়সা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। আশ্রমে উপস্থিত হইলে বাবাজি বলিলেন, তোমার যেরূপ

* প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয় ধর্মের জন্য একেবারে ক্ষেপা হইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোক আমি দেখি না। একটি লোক দেখিয়াছিলাম তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমি তাঁহার ন্যায় ধর্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দেখি নাই।—লেখক।

ব্যাকুলতা দেখিতেছি তাহাতে তোমার জন্য সাধনকুটির বিশেষ আবশ্যক; আমি পাহাড়ের উপরিস্থ আমার ঐ সাধনকুটির তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, তুমি এখানে অবস্থান করিয়া সাধনভজন কর। পাহাড়ে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল, গোবিন্দবাবু তজ্জন্য অনেক সময় তাঁহাকে সাবধান করিতেন, কিন্তু তিনি যেরূপভাবে বিচরণ করিতেন তাহাতে বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। ইহার পর আমরা প্রায়ই আকাশগঙ্গায় যাইতাম। একদিন আমাকে বলিলেন, 'শশি, তুমি ফিরিয়া যাও, আমি এখানেই থাকি।' কিন্তু আমি একাকী আসিতে সাহসী না হওয়ায় আমিও রহিলাম। আমাকে লাড্ডু খাইতে দেওয়া হইল, উহাতেই আমার উদর পূর্ণ হইল।

একদিন অপরাহ্নে আমরা কোন জঙ্গলের পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছি, গোঁসাইজী প্রসঙ্গক্রমে সাধু অঘোরনাথের কথা উত্থাপন করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "অঘোরের সঙ্গে কথা হইয়াছিল, যে, আমরা দুই ভাই মিলিয়া ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব। কিন্তু হায় তাহা হইল না; অঘোর আমাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।' তারপর বলিলেন, 'শশি, আমি আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিব, তুমি আমার পার্শ্বে ঘুমাইয়া থাক।' এই বলিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র দ্বারা আমাকে উপাধান করিয়া দিলেন। শিশু যেমন মাতৃপার্শ্বে নির্ভয়ে নিশা যাপন করে আমি তাঁহার পার্শ্বে তেমনিভাবে নিশা যাপন করিলাম। আর এই জীবন্মুক্ত সাধু পুরুষ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসংকুল সেই ভীষণ অরণ্যের পার্শ্বে সমস্ত রজনী অটলভাবে, ভয় উদ্বেগ বিহীন হইয়া ব্রহ্মধ্যানে অতিবাহিত করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল শীতবাত এবং হিংস্র জন্তুর কোন প্রকার ভয় তাঁহার ছিল না। রাত্রি শেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে পুনরায় আমাকে উঠাইলেন; আমরা নির্ঝর বারিতে স্নান করিয়া নির্জন গুহাপ্রান্তে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলাম। তাঁহার সেই সময়ের প্রাণস্পর্শী উপাসনার স্মৃতি আমি অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এইদিন উপাসনার সময়ে খুব বড় একটি সাপ তাঁহার গলায় উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই, আপনা হইতেই নামিয়া গিয়াছিল; আর তাঁহাতেও কোনরূপ ভীতির চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার ভক্তি অনুরাগে যেন হিংস্র জন্তুগুলিও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইত, তাহাদের হিংস্রাবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হইত।

ইহার পর একদিন আমাকে বলিলেন, 'শশি, আমি আর কলিকাতা যাব না, তুমি ফিরে যাও।' এই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। গয়ার পথে যুবক নিমাইএর পরিবর্তন

হইলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সঙ্গীগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাবো না। আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরাতে চলিলাম। ইনিও যেন তেমনি গয়ার নির্জনতার মধ্যে ডুবিয়া সমগ্র মনে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত হওয়ার আশায় তথায় চিরবাসস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আর পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, আমি আর কলিকাতায় যাবো না।' কলিকাতায় তাঁহার পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি যেন তাঁহার কোনরূপ মায়া নাই। কলিকাতা পরিত্যাগ অবধি একবারও তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ না করায় মনে হয় তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তাই ছিল না। একদিন আকাশগঙ্গা হইতে আসিবার সময় পথে করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমায় স্বতন্ত্র কুটির দাও, স্বতন্ত্র কুটির না হইলে আর চলে না।" অবশেষে গোবিন্দবাবু প্রভৃতি তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র কুটির নির্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

একদিন আমরা বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলাম। বুদ্ধের সাধনক্ষেত্র, নিরঞ্জনা নদী ইত্যাদি দেখাইয়া তিনি আমার নিকট শাক্যমুনির গুণকীর্তন করিলেন এবং অবশেষে নিরঞ্জনা তীরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমস্ত দিবস যাপন করিলেন। আমরা সায়াহ্নে আহার্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি সূর্যাস্তের পূর্বে গৃহে ফিরিলেন না।

ইহার পর তিনি একাকী আকাশগঙ্গায় যাইতেন; এবং আর কলিকাতায় ফিরিবেন না স্থির করিলে আমি শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে কলিকাতায় চলিয়া আসি। অবশেষে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনেন।"

উদ্ধৃত বিবরণটি মনোযোগ সহকারে পড়িলে বুঝা যাইবে যে শশিভূষণ বসু মহাশয়ের গয়ায় অবস্থান কালে বিজয়কৃষ্ণের গুরুলাভ হয় নাই। গয়ায় পৌঁছাইয়া কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে পর বিজয়কৃষ্ণ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে বাবাজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ঐ প্রথম সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে উদ্ধৃত বিবরণটিতে আরও সাত দিনের পৃথক উল্লেখ রহিয়াছে, এবং এই সাত দিনও ক্রমান্বয়িক নয়। এক দিনের পর পর হইলেও চৌদ্দ দিন হইয়া যায়। তাহার পর শাস্ত্রীমহাশয়কে কলিকাতায় চিঠি লেখা, তাঁহার নির্দেশ প্রাপ্তির জন্য কয়েকদিন ধরিতে হয়। সুতরাং গয়ায় পৌঁছাইয়া অন্যূন ১৭।১৮ দিনের পূর্বে বসুমহাশয় কলিকাতায় ফিরেন নাই। অর্থাৎ খুব সম্ভব বসুমহাশয় আশ্বিনের দ্বিতীয়ার্ধে কলিকাতায় ফিরিয়া থাকিবেন। এইরূপ মনে করিবার আর একটি

কারণ এই যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য বিবরণীতে লেখা হয় যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখন বেহার অঞ্চলে তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র করিয়াছেন। শশিভূষণ বসু সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি বিজয়কৃষ্ণকে ধর্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। এই রিপোর্ট ১লা কার্তিক ছাপা হয়। সুতরাং বসুমহাশয় যে আশ্বিন মাস শেষ হইবার বেশি পূর্বে কলিকাতা ফিরিয়া আসেন নাই তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। বিবরণীর "শীত-বাত" ও আশ্বিনকে লক্ষিত করে। ঠিক কোন তারিখে তিনি ফেরেন তাহার ইঙ্গিত তত্ত্বকৌমুদীতে পাই নাই।

বসুমহাশয় ফিরিয়া আসিলে বিজয়কৃষ্ণ রঘুবর দাস বাবাজির আশ্রমে দিবারাত্র বাস করিয়া থাকিবেন এবং এক ব্রহ্মচারীর সহিত অন্তরঙ্গতা হইয়া থাকিবে। তাহার দীক্ষা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাব কোন কোন শিষ্যকে পরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই "মানস সরোবরের পরমহংসজীর নিকট আমাব দীক্ষা পাইবার পূর্বে কিছু দিন আমি ও আর একটি সন্ন্যাসী (ব্রহ্মচারী) আকাশগঙ্গা পাহাড়ের রঘুবর দাস বাবাজীর আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলাম এবং গয়ার চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া সাধু দর্শনাদি করিয়া বেড়াইতাম। একদিন আমরা আশ্রমে বসিয়া আছি, এমন সময় রাখাল বালকেরা আসিয়া বলিল পাহাড়ের উপরে এক মহাত্মা আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া আমি ও আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী তাঁহার জন্য কিছু আহারাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া উপরে সেই মহাত্মার নিকটে গেলাম। প্রথম দিন তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না। দ্বিতীয় দিন আমার সঙ্গের সেই সন্ন্যাসী অন্য কোথাও বেড়াইতে গেলেন। সেদিন আমি একাকী কিছু আহার্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপরে মহাত্মার নিকট গেলাম। যাইবামাত্র তিনি আমাকে কাছে ডাকিয়া লইলেন এবং বলিলেন, আমি কেবল তোমার জন্যই এখানে আসিয়াছি। কাল তোমার সঙ্গে অন্য লোক থাকায় কোন কথা বলিতে পারি নাই। এই বলিয়া তিনি আমাকে মা যেমন ছেলেকে কোলে নিয়া দুধ খাওয়ান, সেইরূপভাবে কোলে নিয়া রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনাবলী বলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ আমাকে অভিভূত করিয়া নাম দিলেন। তাহার পর আমি তাঁহাকে প্রণাম করি এবং মস্তক উত্তোলন করিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঢুলুঢুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম। গোফার ধারে বেলগাছের নীচে বড় পাথরের চটাংখানার উপর বসে পড়লাম। এগার দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল। সে সময় বাবাজী খুব যত্নের সহিত আমার দেহটি রক্ষা করেছিলেন।" পাঠকদিগের জানিয়া রাখা ভাল

যে বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষা লাভের যে বিবরণটি আমি দিলাম, তাহা সকল খুঁটিনাটিতে সর্ববাদীসম্মত নয়। কাহারও মতে দীক্ষাস্থানেই বিজয়কৃষ্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়েন, এবং বাবাজি তাঁহাকে খুঁজিয়া আপন আশ্রমে লইয়া আসেন, কাহারও কাহারও মতে এগার দিনব্যাপী তিনি যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন, তাহা দীক্ষার কয়েকদিন পরে। আমরা এ দুই বিষয়ে "সৎগুরুসঙ্গে" লিখিত বিবরণটিই অনুসরণ করিলাম। "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদ"* গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষালাভ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, কৌতূহলী পাঠক তাহা শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডের ৯০-৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দেখিতে পাইবেন। বিজয়কৃষ্ণ লিখিত 'আশাবতীর উপাখ্যান' সামান্য রূপকের আড়ালে বিজয়কৃষ্ণেরই আধ্যাত্মিক আত্মচরিত। তনুপুরের আশাবতী বিজয়কৃষ্ণেরই আধ্যাত্মিক সত্তা। এই গ্রন্থেও বিজয়কৃষ্ণের গুরুকরণ ব্যাপারটি মোটামুটি উপরোক্তভাবেই ইঙ্গিত হইয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণের গুরুদেব যে অসামান্য সমর্থী মহাপুরুষ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। লৌকিক পরিচয়ে ইহার নাম ব্রহ্মানন্দ পরমহংস ; বিদেহমুক্ত অবস্থায় ইনি মানস সরোবরে বাস করিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে দেহধারণ করিয়া অথবা সূক্ষ্ম দেহে গমনাগমন করিতে পারিতেন। সংসারাশ্রমে ইনি পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ এবং নানকপন্থী উদাসী সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন। কথিত আছে যে কথাপ্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ একদিন তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন শাস্ত্রে যে অষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, এবং যত্রকামাবসায়িত্বের কথা আছে তাহা কি সত্য। প্রকাশ যে গুরুজী একদিন নির্জনে অষ্টসিদ্ধির সকল শক্তিগুলির একে একে প্রমাণ দিয়া শিষ্যের মনে যুগপৎ বিস্ময় এবং বিশ্বাস আনয়ন করেন। তবে এ কথাও বলিতে ভুলেন না যে এ সকল ক্ষমতা কিছুই নয়—ইহারা যোগের কতকগুলি বিভূতিমাত্র। বিজয়কৃষ্ণও আপন জীবনে ইহাদের বিশেষ কোন মর্যাদা দেন নাই। বিজয়কৃষ্ণের পরকালতত্ত্বে এবং দেহান্তর বাদতত্ত্বে অনড় বিশ্বাস এই সময়ে আশ্চর্য রূপে অতিরিক্ত সমর্থন পায়। দীক্ষা লাভের পূর্বে সাধু দর্শনে ঘুরিতে ঘুরিতে নৃসিংহ মন্দিরের নিকট আপনার পূর্বজন্মের স্মৃতি তাঁহার জাগরিত হয়। পূর্ব জন্মে তিনি ঐ স্থানে সাধু ছিলেন এবং যে বটবৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেন তাহার উত্তর শাখায় ওঁ রাম শব্দ দুটি খোদিত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে দেখা যায় সত্যই

* হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ বিখ্যাত সাহিত্যিক, গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার সম্পাদক এবং বাউল গান রচয়িতা ও গায়ক। সাহিত্যিক জলধর সেন ইহার জীবনী লিখিয়াছেন—লেখক।

খোদিত শব্দ দুটি পাওয়া যায়—অবশ্য বৃক্ষের বৃদ্ধিতে লেখাগুলি আঁকাবাঁকা হইয়া গিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং আশাবতীর উপাখ্যানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন তাই আমরা ইহার সামান্য উল্লেখ করিলাম।

সে যাহা হউক, বিজয়কৃষ্ণ এতকাল ধরিয়া যাহা খুঁজিতে ছিলেন এই মহাত্মার কৃপায় তাহা তাঁহার করতলগত হইল। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার আপন অমানুষী সাধনার নানান পর্যায়ের এবং এই শেষ সাফল্যের বিবরণ দিয়াছেন অতি স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট ভাষায় তাঁহার যোগসাধন গ্রন্থে। তাঁহার এই সাফল্যের মুহূর্তে তাঁহার সমগ্র সাধনাটিকে আর একবার স্মরণ করিয়া লইবার জন্য উহা বিস্তারিত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বিজয়কৃষ্ণ লিখিতেছেন, "পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি। তথায় করুণাময়ের কৃপায় অনেক সত্য ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার অল্প শক্তিতে যে পরিমাণে সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়াও লইলেন। তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে অনেক বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্যলাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান ধারণাদি করিতে শিখিলাম। এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না। কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম সত্য কিন্তু কেন জানি না, এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময়েই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইতে হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্বে আমি বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম। তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয় এবং তাহাতে দেখি যে জীবনের প্রকৃত ধর্মের অবস্থা অতি হীন; সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অর্থাৎ তখনও পাপশক্তির মূল জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্মচিন্তা আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি এবং নানা দেশ-বিদেশে ধর্ম প্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্মের ভিত্তি কোথায়?

নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায় নাই। তাঁহার সহিত আমার প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ওষধি নাই। তখন নানাস্থানে ঐ ওষধির অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ কবিলাম। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন ধর্মবন্ধুর * সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু তাহাও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিল না। আমার অন্তরের বস্তু সেখানেও পাইলাম না, তখন নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোর পন্থীদের কাছে গেলাম, তাহারা সাধক বটেন কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিকদের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। বামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধযোগী সকলের নিকটই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না। কিন্তু এটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে আমার অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি। কি যে সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।"

বিজয়কৃষ্ণের এই সদ্‌গুরু লাভ আমাদের হিসাবে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১২৯০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের দ্বিতীয়ার্ধে। বক্স কর মহাশয়ের পুস্তকে আষাঢ় মাসে দীক্ষা হয় বলিয়া লেখা হইয়াছে। তিনি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার পুরাদস্তুর সাহায্য লইয়াও কিসের ভিত্তিতে আষাঢ় মাসে দীক্ষা হয় লিখিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। হয়ত মুদ্রাকর প্রমাদ এবং সেই প্রমাদ ক্রমান্বয়ে অনুসৃত হইয়া গিয়াছে! এই সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্য সন্দেহ উত্থাপন করেন শ্রীযুক্ত ঘর মহাশয়।**

* কৃষ্ণকুমার মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাকিশোর চৌধুরী (পরবর্তী জীবনে সন্তদাস বাবাজী) প্রভৃতি বহু ব্রাহ্ম কর্তাভজা সম্প্রদায়ে যাতায়াত করিতেন। গরিফার জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয় এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।—লেখক।

** শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ঘর শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় প্রথমে কুচবিহার কলেজে এবং পরে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক। 'মন্দিরে' প্রকাশিত তাঁহার 'গোস্বামী চরিতের উপাদান সংগ্রহ' আশ্চর্য গবেষণা শক্তির নিশ্চিত নিদর্শন।—লেখক।

তবে তাঁহার বিকল্প মাস ভাদ্রকে গ্রহণ না করিতে পারার যুক্তি আমি পূর্বে দিয়াছি। বিজয়কৃষ্ণের এই যে সিদ্ধিলাভ তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেরই একটি অতি প্রধান ঘটনা নয়,—নব জাগরিত বাঙ্গলার ধর্ম সাধনার ইতিহাসেও ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্রোশ শিলা (milestone).

ছাব্বিশ

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভের পর পুনরায় তিনি প্রকাশ হইলে বিজয়কৃষ্ণ সংসার ছাড়িয়া তাঁহার সহিত চলিয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। তাহাতে গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণকে বাঙ্গলায় ফিরিয়া তথাকার মৃতধর্ম সঞ্জীবিত করিতে আদেশ করেন। বিজয়কৃষ্ণ আরও কিছুদিন গয়ায় থাকিয়া সাধনভজন করেন এবং নিকটবর্তী স্থান সমূহের ভজনশীল সাধুদের দর্শন করিয়া বেড়ান। এই সময়েই বরাবর পাহাড়ে এক ভীষণ দর্শন ভৈরবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্তবস্তুতির দ্বারা বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার কপট ক্রোধ প্রশমিত করাইলে তিনি বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে এক গুহার মধ্যে লইয়া গিয়া চারি কোণে সমাধিস্থ চারিজন সাধুকে দর্শন করান। এই চারিজন সাধু চারি ভিন্ন মার্গ (অঘোরী, নানক পন্থী, কাপালিক, ও রামাৎ) অবলম্বন করিয়া একই লক্ষ্য বস্তু ঈশ্বরলাভে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা সকলেই একই রূপ দর্শন করিতেছেন। বিভিন্ন লোকের রুচি অনুসারে নানা পথ, নানা মত হইলেও সকলেরই গম্য যে এক, ধর্ম যে এক, এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িক মন বিশেষ তৃপ্ত হইয়া থাকিবে। আরও কিছুদিন গয়ার নির্জনে সাধনভজন করিয়া তিনি গুরুর নির্দেশ মত কাশীধামে গমন করিয়া হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাস গ্রহণ তিনি সাধারণ্যে বড় একটা প্রকাশ করেন নাই। কাশী গিয়া তিনি যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তাহা স্বাভাবিক। স্বামীজী তখন অজগর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গোস্বামী শিষ্য ডাক্তার হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নোট বই হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, "হঠযোগ ছাড়িয়া স্বামীজীর শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। গিয়া নমস্কার করিয়া বসিলে দক্ষিণ বাহুর তল দিয়া গোঁসাইএর দিকে তিনি তাকাইলেন এবং চিনিয়া ফেলিলেন, লিখিলেন, "ইয়াদ হ্যায় ?" গোঁসাই "হাঁ" বলিলে স্বামীজী গোঁসাইএর গায়ে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।" কাশী হইতে তিনি পুনরায় গয়ায় ফিরিয়া নির্জনে তপস্যা করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে বিজয়কৃষ্ণ-জায়া যোগমায়া স্বামীর সংসার ত্যাগ সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে গয়ায় আসেন এবং বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া কলিকাতায় ফিরেন। দীক্ষার অব্যবহিত পরের ঘটনাগুলি বিজয়কৃষ্ণের জীবনীগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে বলিয়া আমি উহাদের সংক্ষেপেই উল্লেখ করিলাম। বিজয়কৃষ্ণের এই সময়কার ঘটনাগুলির স্বতন্ত্র সমর্থন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র তত্ত্বকৌমুদীতে আশা করা বৃথা। এই সকল ঘটনা তাঁহার শিষ্যগণ বিজয়কৃষ্ণের স্বমুখে নানান সময়ে শুনিয়া থাকিবেন; সুতরাং ইহাদের কালানুক্রমকে যাচাই করিয়া লইবার সুযোগ অল্প। তবে তিনি দীক্ষার পর এবং কলিকাতা ফিরিবার পূর্বে যে কাশী গমন করেন তাহা তাঁহার কিঞ্চিৎ পরে লেখা আশাবতীর উপাখ্যান হইতেই বুঝা যায়।

এখন কথা হইতেছে বিজয়কৃষ্ণ গয়া হইতে ফিরেন কবে। এ বিষয়েও তত্ত্বকৌমুদী হইতে কোন পরিষ্কার সাহায্য মিলে না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের সমাজের ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রায় ২॥ মাস কাল গয়ায় বাস করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে তিনি ভাদ্রের শেষার্ধে পৌছাইয়া থাকিবেন। সুতরাং আশ্বিন কার্তিক গয়ায় থাকিলে গয়ায় অবস্থিতি কাল ২॥ মাস হয়। এই অনুমান মত তিনি অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে কলিকাতা ফিরেন। ১৬ই অগ্রহায়ণে তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, "সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গত ১১ই অগ্রহায়ণ প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অপরাহ্নে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্য করেন।" ঐ তারিখের অপরাহ্নের উপাসনায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন এবং কথামৃতে ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীম লিখিতেছেন, "শ্রীযুক্ত বিজয় সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেকদিন নির্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারি সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁট মুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।" উদ্ধৃত অংশের 'সবে' কথাটি আমাদের অনুমান সমর্থন করে, বিজয়কৃষ্ণ ১১ই অগ্রহায়ণের বেশি আগে কলিকাতায় ফিরেন নাই। বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়, তুমি কি বাসা পাকড়েছ?" তারপর বাসা পাকড়ানর অর্থ-জ্ঞাপক গল্প করিলেন। প্রথম পরশ মাণিক ছুঁইয়া সোনা হওয়ার উপদেশ দিলেন, মনরূপ দুধ হইতে জ্ঞানভক্তি রূপ মাখন তুলিবার ইঙ্গিত করিলেন, তারপর বাসা পাকড়ানর অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। শ্রীম প্রভৃতিকে বলিলেন, দেখ

বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে। তারপর শিবনাথের ভারি ঝঞ্ঝাটের উল্লেখ করিয়া বিজয়কে বলিলেন, তোমার এখন সময় হয়েছে। সব ছেড়ে তুমি বলো, মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। বলিয়াই যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে, এই গানটি গাহিলেন। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা ভয় এসব ত্যাগ কর। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে এসব ভাব ত্যাগ কর।" উপদেশগুলি সুন্দর কিন্তু সত্য বলিতে কি এই উপদেশগুলি ঐ সময়েও বিজয়কৃষ্ণের কাছে বাহুল্য মাত্র। ঈশ্বর লাভের জন্য বিজয়কৃষ্ণ প্রয়োজন হইলে অনায়াসে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, বিজয়কৃষ্ণের জীবনের সকল ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের জানা থাকিলে তিনি তাহা বুঝিতেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতেন ধর্মের প্রেরণা পাইবার জন্য, আপনাকে জাহির করিবার জন্য নয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে বিজয়কৃষ্ণের অবস্থা অনেক উচ্চ—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এ তিনের বহু ঊর্ধ্বে। তবে বিজয়কৃষ্ণ সেই অবস্থাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না, সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত সন্ধান ছাড়িবেন না, এই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাই তখনও তিনি দীন জিজ্ঞাসুর মতই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিতেন। ধর্ম সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ কখনই অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন না। শাস্ত্রী মহাশয় যে বলিয়াছিলেন বিজয়কৃষ্ণ ধর্মার্থে দ্বিতলের ছাদ হইতেও লম্ফ দিয়া পড়িতে পারেন তাহা এতটুকু অতিরঞ্জন নয়। বিজয়কৃষ্ণের তীব্র ব্যাকুলতার প্রমাণ তাঁহার জীবনের ঘটনায় ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাঁহার সহকর্মী শশিভূষণ বসু মহাশয়ের লিখিত গয়ার বিবরণটিতেও তাহা বেশ ফুটিয়া রহিয়াছে। বসু মহাশয় ব্যাকুলতার তীব্রতায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি দুই বৎসরের অধিক পরে (১৮০৭ শকের মাঘ মাসে) এক উপাসনায় তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমি কোনও ভক্তিভাজন বন্ধুর সহিত একবার গয়ায় যাই। আমরা উভয়ে একদিন একত্রে ব্রহ্মযোনি পর্বতে বেড়াইতে গিয়েছিলাম; আমার সেই ভক্তিভাজন বন্ধু একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন যে, এ স্থান দর্শন করিয়া মহাত্মা চৈতন্যের প্রথম প্রেমের সঞ্চার হয়। চৈতন্যের মনে কৃষ্ণরে বাপরে কোথায় গেলিরে এই কথা উদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়, এবং সেই স্থানে তিনি সন্ধ্যার সময় তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রথম সাক্ষাৎ পান। × × × আমি আমার সেই বন্ধুকে তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে মানুষ একবার ইষ্টদেবতাকে পাইয়া আবার তাঁহাকে দেখিতে পায় না কেন? কেন তিনি দেখা দিয়া আবার লুক্কায়িত হন? মানুষই বা কেন তাঁহার অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়ে? তিনি বলিলেন, ভগবান একবার

দেখা দিয়া অন্তর্ধান হন, কারণ তাহা হইলে মানুষ তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে। এক একবার দেখা দেন, তাঁহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য। এই ব্যাকুলতাই ধর্মের জীবন। স্পষ্টই বসু মহাশয় বিজয়কৃষ্ণকে উল্লেখ করিতেছেন, এবং তাঁহার সেই "শশি, তুমি ফিরে যাও, আমি আর কলিকাতায় ফিরে যাব না"—তখনও হয়ত বসু মহাশয়ের কানে বাজিতেছিল।

অগ্রহায়ণের শেষের দিকে বামাবোধিনী পত্রিকায় গয়াতীর্থ শিরোনামায় এক প্রবন্ধ দেখি—ইহাতে লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নাই, তবে অনুমান হয় যে উহা সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের রচনা। কয়েক মাস পরেই ঐ পত্রিকায় বিজয়কৃষ্ণের আশাবতীর উপাখ্যান বাহির হইতে থাকে। ইহার প্রথম পাঁচ অধ্যায় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ হইতে জুলাই মাসের মধ্যে বাহির হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেখা আছে, তাই হয়ত বামাবোধিনীতে গ্রন্থের বাকী অংশ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অধ্যায় বাহির হয় পর বৎসর (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। নবম দশম একাদশ অধ্যায় আর ঐ পত্রে বাহির হয় নাই।

বিজয়কৃষ্ণ দীক্ষালাভান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের পীড়ার খবর শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কৃষ্ণের যে বিবাদ, তাহা মতবাদের বিবাদ; ব্যক্তিগতভাবে এই দুই মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা হয়ত বা কোন কালেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে কতখানি ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার কথাতেই প্রকাশ। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম। সমস্ত দিনের প্রচারে ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দুই এক পয়সার মুড়ি খাইয়া হয়ত ক্ষুধা দূর করিতে হইয়াছে, কিন্তু কেশববাবুর জন্য বাজার হইতে ভাল খাবার লইয়া গিয়াছি। কেশববাবু বড়লোকের সন্তান, ভাল খাওয়া অভ্যাস, এখন গরীব হইয়াছেন, ভাল খাবার পান না, ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, ভাবিয়া আমরা তাঁহার জন্য ভাল ভাল খাবার লইয়া যাইতাম। তিনি এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রগাঢ় বন্ধুতা তাহাতে আমরা যেন ইহলোক হইতে একত্র প্রস্থান করি।' কেশবচন্দ্র দেহরক্ষা করেন ১৮০৫ শকের ২৫শে পৌষ অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী। মৃত্যু-পূর্বের এই মিলন সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ নিজে লিখিয়াছেন, কেশববাবুর মৃত্যুর একমাস পূর্বে (অর্থাৎ ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে) তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে শরীর মৃতদেহের ন্যায় প্রভাহীন হইয়াছে। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে বলিলেন, গোঁসাই, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইল না।

পথহারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া আশা হইতেছিল, এমন সময় এই পীড়া। আমাকে বলিলেন, তুমি না কি নূতন মত অবলম্বন করিয়াছ? আমি বলিলাম, নূতন পুরাতন বুঝি না, ভগবানকে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। এখন কত পরিবার ব্রাহ্মসমাজে, তখন কিছুই ছিল না, সুতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া গোল করিতে আসি নাই। ভগবানকে পাইলাম ইহা প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরিব না। যে কোন উপায় ।।রতে হয় ধরিব। বাহিরের উপায় কিছুই নহে। মৃত্যুকালে আমি কৃতার্থ, আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমিই সত্য ইহা বলিয়া মরিব, এই আকাঙ্ক্ষা। আশীর্বাদ করুন। কেশববাবু বলিলেন, এ সম্বন্ধে আমার অনেক বলিবার আছে। ।দি আরোগ্য লাভ করি, তোমাকে ডাকাইব। দুঃখের বিষয় তাঁহার লীলা সম্বরণ ইল।" বন্ধুবরের রোগাকীর্ণ জীর্ণ দেহ দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন ।বং আচার্য দেহত্যাগ করিলে বিজয়কৃষ্ণ অতীব দুঃখে শয্যাশায়ী হন। তিনি ত্যুর দিন আর বন্ধুবরকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই।

১২৯০ সালের ১১ই মাঘের উৎসব সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে এইরূপ পাই, "আজ মস্ত দিনব্যাপী উৎসব। পৃথিবীর মুখ হইতে গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত ইতেছে, আর উপাসকগণ বহু আশা প্রাণে ধরিয়া দ্রুতপদে উপাসনালয়ে গিয়া দৃঢ় াসনে বসিতেছেন। উষার প্রাক্কালেই মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া গেল—সঙ্গীতের া‍হন ধ্বনিতে প্রাণ চমকিয়া উঠিতে লাগিল। রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের বাবু জকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর সঙ্গীতে শক্তি মূর্তিমতী হইয়া যেন উপাসকগণের ন মোহিত করিয়া ফেলিল। ১১ই মাঘের প্রাতঃকাল, তাতে মধুর সঙ্গীত, পাসকগণ সকল ভুলিয়া ব্রহ্মপূজায় ডুবিয়া গেলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দীতে উপবেশন করিলেন, বিধাতা আচার্যের মুখ দিয়া স্বর্গের তত্ত্ব নরনারীকে বগত করিলেন— ঈশ্বরকে পাইয়া আচার্য ধন্য হইলেন, উপাসকের প্রাণে বত্রাণের আশা হইল। সে সময়ে যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল—মানুষের ক্ষমতা ই যে তাহার যথাযথ বর্ণনা করে। মানুষের প্রাণ মন ভরিয়া যে ব্যাকুলতার ীর ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।" বিজয়কৃষ্ণ ায় যে অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছেন তাহারই স্ফুলিঙ্গে কলিকাতা তথা বাংলা কি তমান হইতে চলিল?

তত্ত্বকৌমুদী হইতেই পাওয়া যায় যে "১৪ই মাঘ ব্রাহ্মগণ বেণীমাধব পাল াশয়ের দমদমার নিকটবর্তী উদ্যানবাটীতে সম্মিলিত হন। বেণীমাধববাবু স্বীয় য় ইহাদের সকলের আতিথ্য সৎকার করেন। বৃক্ষের সুশীতল ছাওয়ায় এক

সুন্দর বেদী রচিত হইয়াছিল। বৃক্ষতলে বসিয়া উপাসকগণ সম্মিলিত হৃদয়ে উপাসন করিয়া পরে পৃথক পৃথক দলে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করেন। কেহ ব নির্জন ধ্যানে, কেহ বা ধর্মকথায় সময় যাপন করেন। উদ্যানে প্রচার বিষয়ে কথোপকথন নির্দিষ্ট ছিল, অনেকে প্রচার সম্বন্ধে বিবিধ পরামর্শ প্রদান করিলেন। সারাদিন প্রকৃতির ক্রোড়ে যাপন করিয়া অপরাহ্নে আবার ব্রাহ্মগণ দলে দলে সহরে ফিরিয়া আসিলেন।" বিজয়কৃষ্ণের নামোল্লেখ না থাকিলেও তিনি এই outing এ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ধরিয়া লওয়া যায়, কারণ "সন্ধ্যার পর আবা উপাসনালয়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য করেন।" ১৬ই ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীতে পাই, "ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ৭।৮ জন ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে তেলিনীপাড়া গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে দুই দিন উপাসনা এবং একদিন তেলিনীপাড়া হইতে নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভদ্রেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া হয়। সেখানে একটি উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রকার গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত না হইলে বাস্তবিক ধর্মপ্রচারে সফল-মনোরথ হওয়া সম্ভব নয়।" গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার যে বিজয়কৃষ্ণ উদ্ভাবিত তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, নগর সংকীর্তনও যে মুখ্যতঃ তাঁহারই যোজনা তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। গয়া হইতে তিনি যে নূতন বার্তা আনিয়াছেন, তাহা আপামর সাধারণে বিতরণ করিতে হইবেত তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে সংসার না ত্যাগ করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে বলিয়া দিয়াছেন, তিনি তাঁহার এক্ষণে অপটু রুগ্ন দেহ লইয়াও জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত তাঁহার নব-লব্ধ সত্যের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কি সত্য প্রচার করিতেছিলেন, এই সময়ের লেখা আশাবতীর উপাখ্যানে তাহার আভাস পাই। প্রথম পাঁচ অধ্যায়েই তিনি ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, কুণ্ডলিনী শক্তি, আসনশুদ্ধি প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগসম্বন্ধীয় কথা বলিয়াছেন। বাবাজীর মুখে বলাইয়াছেন "গুরুদত্ত মহামন্ত্রই আত্মার অন্নজল।" এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে, "গুরু না পাইলে ধর্ম হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন, অঙ্ক ভূগোল জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন। × × কেবল ধর্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহা পর আশ্চর্য্যের কথা আর নাই।" পরে ছাপা হইলেও যে অধ্যায়ও আলোচ্য কালেই লেখা হয় তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার অগণিত ভক্ত দিগের নিকট এই নূতন সত্য আলোচ্য সময়েই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। ১লা চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশটিও বিজয়কৃষ্ণের এই সময়কা

মনের অবস্থারই আভাস দেয়। অনেকের নিকট ধর্ম জীবনের আর আর ব্যবসায়ের মধ্যে একটি। বিজয়কৃষ্ণের নিকট ধর্মই মানবের একমাত্র ব্যবসায় অন্ততঃ প্রধান ব্যবসায়। সাধারণ্যে ধর্মের অনাদর দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, "আমাদের দেশে এখন সেই পূর্বের ন্যায় অবস্থা নাই, কাল নাই, কিছুই নাই। আমরা যদিও সেই দেবতাদিগের, আর্য্যদিগের বংশোদ্ভব, তথাপি এক্ষণে আমাদের বংশকে আর্য্য বংশ বলিলে ভাল দেখায় না,—আমাদের দেশকে সেই দেবতাদিগের দেশ বলা উচিত হয় না; এক্ষণে আমরা কি দেখিতেছি? × × আমাদের দেশে যেরূপ পাপ সকল প্রবেশ করিয়াছে, এখন আর রক্ষা নাই, এবার দেবাসুরের ঘোর সংগ্রাম বাধিয়াছে। আমাদের এক্ষণে দয়াময় পরব্রহ্মের নিকট গিয়া তাহার স্তব স্তুতি করিতে হইবে তিনি অবশ্যই পাপ অসুরকে বধ করিবার উপায় বলিয়া দিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন দধীচির আবশ্যক, এমন একজন নিঃস্বার্থ লোক চাই, যিনি আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারিবেন, যিনি যথার্থই ধর্মকে জীবনে দেখাইতে পারিবেন। এ দেশের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। ধর্ম—জীবন্ত ধর্ম চাই।" এই আবেদনের অন্তরালে ধর্মকে তাহার সম্মানিত সুউচ্চ বেদীতে স্থাপন করিবার জন্য আপনার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিবার সুদৃঢ় সংকল্প লুক্কায়িত রহিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্ম দেশে তাহার ন্যায্য স্থান আজও পায় নাই—তাই দেশের দুর্দশা বাড়িয়াই চলিয়াছে। উক্ত উপদেশটিতেই বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "এ সকল কথা প্রকাশ্যরূপে বলি তাহার কারণ এই যে দেশকে উদ্ধার করা চাই, কিন্তু ধর্ম না পাইলে বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার হইবে না। যেরূপ বৃক্ষের ধর্ম ফল পুষ্প উৎপন্ন করা, অগ্নির ধর্ম দাহিকা শক্তি, সেইরূপ আত্মার প্রকৃতিই ধর্ম, এই ধর্ম চাই, ইহা বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। ইহা দ্বারা পাপ অসুরকে বধ করিতে হইবে। উপাসনালয়ে ধর্ম, গৃহে ধর্ম, কর্মস্থলে ধর্ম, সর্বত্রই ধর্ম।" আমরা এখন যেমন total war এর কথা শুনি, বিজয়কৃষ্ণ সেইরূপ total ধর্ম অর্থাৎ ধর্মময় জীবনের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অদের্শ তাঁহার আপনার কালেও সকলের নিকট প্রীতিকর হয় নাই, আজ ত হইবেই না। কারণ সাধারণ সংসারী ব্যক্তির নিকট ধর্মের স্বল্পই সংসার যাত্রার পক্ষে নিরাপদ—বাড়াবাড়ি করিলে অনেক কিছু লোভনীয় জিনিস ছাড়িতে হয়। স্বভাবতই অতি অল্প লোকই ইহার জন্য প্রস্তুত হইবে মানি কিন্তু আদর্শ হিসাবে ইহাকে মানিতে পারিলেও সমাজের কল্যাণ। অন্যথায় সমাজের কি দশা হয় তাহা বর্তমানে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। ধর্ম কথা আজ পাগলের প্রলাপ মাত্র।

আর একটি নূতন কথা এই উপদেশে দেখি—বিজয়কৃষ্ণ এখন মতবাদের বিশ্বাসের ধর্ম ছাড়িয়া উপলব্ধির ধর্ম, জীবনগত ধর্মের কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "এখন আর কথায় চলিবে না, গান করিলে চলিবে না, এখন ধর্ম জীবনে দেখিতে হইবে। সেই ঈশ্বর যিনি ইহলোক পরলোকের আশ্রয়, প্রাণের প্রাণ, সত্যস্বরূপ, তিনি আছেন এ কথা বিশ্বাস করি কিনা, তিনি আমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন ইহা উপলব্ধি করি কিনা, এ সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হইবে × × যেখানে কেহ জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছেন, কেহ পরোপকার করিতেছেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছেন। যিনি সত্য প্রচার করিতেছেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রসাদে এই বিশুদ্ধ জীবন্ত ধর্মলাভ করিয়া আমরা উদ্ধার পাইব।" উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায় যে বিজয়কৃষ্ণের ভাবনায় ধর্ম এখন নূতন সংজ্ঞা, অন্ততঃ একটা নূতন ঝোঁক লাভ করিয়াছে। সমর্থী গুরুর নিকট হইতে তিনি বুঝিয়াছেন, যে ধর্ম আচরণীয় বস্তু—পরীক্ষণীয় বস্তু। আশাবতীর উপাখ্যানেও তিনি এই কথাই লিখিলেন, ধর্ম একটি প্রণালী নহে, মত নহে, দল বা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধর্ম। ধর্ম বাক্য নহে—শক্তি। ধর্ম মত নহে কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি পরাশক্তিকে দেখাইয়া অন্তরে জানাইয়া দেন তিনিই গুরু।" উদ্ধৃত অংশে 'দেখাইয়া' 'জানাইয়া' কথাগুলি লক্ষণীয়। ধর্ম বিজয়কৃষ্ণের নিকট এখন আর অনুমানের বস্তু নয়, উহা এখন প্রত্যক্ষ বস্তু। তিনি দেখিয়াছেন, গাণিতিক নিয়মে যেমন দুই আর দুএ চার হয়—ধর্ম জগতেও সেইরূপ অবিসংবাদিত সত্য সকল রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ এবং demonstrable বা প্রদর্শনীয়। এখন হইতে তিনি বাঙ্গালী যুবকদিগকে সেই পরীক্ষায় নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি ধর্মলাভ করিবার প্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—theoretical বা মতবাদের ধর্ম ছাড়িয়া applied বা ফলিত ধর্মের ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। দীক্ষাদান ও যোগ সাধন শিক্ষা দেশকে ধর্মে প্রবুদ্ধ করিবার পথে বিজয়কৃষ্ণের নবতম অবদান। এ যেন বিজয়কৃষ্ণের ফলিত ধর্মের Practical Class খোলা। ব্রাহ্মধর্ম ইহাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

সাতাশ

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কার্য নির্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে সমাজমন্দিরের নিয়মিত উপাসনাকার্য প্রধানতঃ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারা নির্বাহিত হইয়াছে। উপাসনা ব্যতীত তিনি সাপুর, কোন্নগর, বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রচারক মণ্ডলীতে স্থিরীকৃত হয় যে তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া স্থানীয় সমাজ ও লোকদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিবেন। এইবারের সাপুর উৎসব সম্বন্ধেই বরিশালের ব্রাহ্ম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এইরূপ লিখিয়াছেন, "বক্তৃতার পর কীর্ত্তনের দল কালীঘাট হইয়া সাপুর চলিল। × × সন্ধ্যাবেলা উপাসনা হইল, গোঁসাইজী উপাসনা করিলেন, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই গদ্‌গদচিত্ত এবং অনেকে অশ্রুজলে প্লাবিত হইলেন। রাত্রিতে গোঁসাইজী যে ঘরে শয়ন করিবেন, আমি ও আমার কয়েকটি বন্ধু সেই ঘরে আশ্রয় লইলাম। সেদিন যে কারণেই হোক, আমাদের ভাল ঘুম হয় নাই। যে যখন জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি গোঁসাইজী বিছানায় আসন করিয়া এককোণে বসিয়া আছেন, মনে হইল যেন একটি প্রস্তর মূর্ত্তিকে ঘরের কোণে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তিনি সারারাত্রি শয়ন করেন নাই; পরে জানিলাম, তিনি অধিকাংশ দিনই এইরূপ ধ্যানে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন, শয়নের জন্য বিছানা ঠিকঠাক করিয়া শয়ন করিবেন ভাবিয়া নাম করিতে বসেন, সেইভাবেই রাত্রি কাটিয়া যায়।"

২৫শে মে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের প্রথমার্ধে বিজয়কৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পঞ্চবটীতলে বসিয়া থাকিতে দেখি। বিজয়বন্ধু কেদার চট্টোও উপস্থিত। মায়ায় বদ্ধ সংসারী জীবদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যাকে ভূতে পায় সে জানতে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সেভাবে আমি বেশ আছি।" বিজয়কৃষ্ণ ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলিলেন, "রোজা মিলে গেলে রোজা ছাড়িয়ে দেন। স্পষ্টতই তিনি আপনার সদ্‌গুরুলাভের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ভূত তাঁহার ত্রিসীমানায় নাই। ইহার পর গৌর সন্ন্যাসের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বিজয়, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কে বলিতেছেন বাবু, তুমিও কি বেহুঁস হয়েছ? বিজয় বিনীতভাবে বলিলেন, আজ্ঞা

না। যে বিজয়কৃষ্ণ পরবর্তী জীবনে ভাবে বিভোর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিবেন, তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

৩০শে মে নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হয়। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। দয়াময়ের কৃপায় উৎসবে এরূপ একটি আশ্চর্য ভাব হইয়াছিল যে তাহাতে অনেক হিন্দুরা পর্যন্ত জাগ্রত হইয়াছেন।

১লা জুন রবিবার চন্দননগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রাতঃকাল, বিকাল ও রাত্রিকালে উপাসনার কার্য করিয়াছিলেন। ১৭ই জুন (২৮শে জ্যৈষ্ঠ) গুরুচরণ মহলানবীশ ও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বিজয়কৃষ্ণ তমলুক ও কাঁথি অঞ্চলে প্রচার করিয়া ২১শে জুন কলিকাতা ফিরেন। এই বারের ভ্রমণেই এক পদ্মফুলে শোভিত পুষ্করিণীতে তিনি বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন বলিয়া অনুমতি হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই তিনি গাজিপুর, কাশী, লক্ষ্ণৌ, মথুরা প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীয় স্থান গিয়া থাকিবেন। ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখা যায় তিনি গাজিপুর ও কাশীতে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন এবং কানপুর, মথুরা লক্ষ্ণৌ যাইবেন। পরে ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যায় বলা হয়, "কিয়দ্দিন হইল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লক্ষ্ণৌ গমন করিয়াছেন। তথায় কয়েকজন নববিধানী ও ব্রাহ্ম বাস করেন। সমাজের সম্পাদক নববিধানী। বিজয়বাবু নববিধান অগ্রাহ্য করেন এই অপরাধে সম্পাদক তাঁহাকে মন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা দিতে দেন নাই। তথাকার মন্দির নির্মাণ কমিটির সভ্য ও আরও কয়েকজন সভ্য সম্পাদককে মন্দির দিবার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু সম্পাদক কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না।। কিন্তু বিশাল বিশ্বে ক্ষুদ্র মন্দির ভিন্ন কি ঈশ্বরের নাম প্রচারের স্থান নাই। বিজয়বাবু কৈশারবাগ বারদুয়ারী নামক বিস্তৃত স্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।" পশ্চিমাঞ্চলের এই ভ্রমণের প্রত্যক্ষ সুদীর্ঘ বিবরণ নবকুমার বাগচী (বিশ্বাস) মহাশয় তাঁহার বিজয় কথামৃত গ্রন্থে দিয়াছেন. তিনি এই ভ্রমণে বিজয়কৃষ্ণের সহযাত্রী ছিলেন। ভ্রমণের বিস্তৃত তালিকা হইতেছে—বাঁকিপুর, জরাসিন্দুর, গয়ায় গম্ভীরানাথজীর সহিত সাক্ষাৎ, বাঁকিপুর, গাজীপুরে পওহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ, প্রয়াগ, কাশীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ এবং ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে পুনরায় দর্শন, অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, শ্রীবৃন্দাবনে গৌরশিরোমণির সহিত সাক্ষাৎ, বাঁকিপুর, কলিকাতা। কলিকাতা তিনি ৩১শে শ্রাবণের পূর্বেই ফিরিয়া থাকিবেন কারণ অজিত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনীতে রাজনারায়ণ বসুর ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত

করিয়া দেখাইয়াছেন যে ঐ তারিখে "বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপন জন্য প্রধান আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে (চুঁচুড়ায়) সাক্ষাৎ করেন। গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথনের সময় প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, যে, ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ হইবার প্রকৃষ্ট উপায় আপনাকে সর্বদা নিরাশ্রয় ভাবা ও তজ্জন্য ভয়ের ও ব্যাকুলতার উপস্থিতি।" গয়া হইতে দীক্ষা লইয়া ফিরিয়া এই প্রথম তিনি মহর্ষির সাহিত দেখা করিলেন কিনা বলিতে পারি না—তবে প্রকাশ যে গৈরিক বেশে, অন্তরালোকে ভাস্বর বিজয়কৃষ্ণকে * প্রথমে দেখিয়া মহর্ষি সোৎসাহে বলিয়া উঠেন, "তোমাতে যে নূতন মানুষ দেখছি, নিশ্চয় কোন অমূল্য বস্তু পেয়েছ, কোথায় পেলে?" গয়ায় দীক্ষালাভের সংবাদ শুনিয়া মহর্ষি বলেন "তুমি ধন্য, এর জন্য হয়ত ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হবে না, ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে হয় করবে তথাপি এই দেব দুর্লভ বস্তু কদাচ ত্যাগ করো না।"

২৫শে আগস্ট কলিকাতায় তিনি সমাজ উপাসনালয়ে হিন্দুশাস্ত্র হইতে পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে উপকৃত হইয়াছেন। এর পর তিনি সৈদপুর গমন করেন সৈদপুর উৎসব সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে আছে, 'বিগত ১৫ই ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যার সময় উৎসব আরম্ভ হইয়া ২৪শে ভাদ্র সোমবার পর্য্যন্ত মহোৎসাহ ও আনন্দের সহিত বন্ধুগণ ব্রহ্মোৎসবে মত্ত ছিলেন। কলিকাতা হইতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আর চারিজন বন্ধু সমভিব্যাহারে উৎসবে আসিয়াছিলেন।" বিজয়কৃষ্ণ এই উৎসবে উপাসনার কার্য করেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, এবং সংকীর্তনে যোগ দেন। "২৪শে ভাদ্র সোমবার রাত্রিতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রহ্মপূজার ব্যাখ্যা করেন।" গোস্বামী ভক্ত শ্রীধর এই উৎসবে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে

* দীক্ষোত্তর বিজয়কৃষ্ণের আত্মিক রূপান্তর যে বাহির হইতেও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাইত, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী, একান্ত যুক্তিবাদী বিপিনচন্দ্র পাল এইরূপ লিখিয়াছেন, 'এই সমাধি অবস্থায় তিনি তাঁহার ঈপ্সিত জ্ঞানালোক লাভ করিলেন, সারাজীবন তিনি যে আলোর সন্ধান করিতেছিলেন। এই আলো কি তাহা বলা, এমন কি কল্পনা বা অনুমান করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই শুধু বলিতে পারেন 'ইহা কি"? তাঁহারাও এই গূঢ় উপলব্ধির বিষয় ভাষার সাহায্যে অন্যের কাছে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। আমরা শুধু বাহিরে বিজয়কৃষ্ণের দেহ ও মনের পরিবর্তন দর্শনে ইহা কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছিলাম।"—লেখক

ফিরিয়া তিনি ঢাকায় যান শারদীয় উৎসবে* যোগদান করিবার জন্য। তাহার পর কুমারখালি যান। এ সম্বন্ধে ১৫ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদ এইরূপ— "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শারদীয় উৎসব উপলক্ষে ঢাকা গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কুমারখালি গিয়াছিলেন।" ঢাকা ভ্রমণ সম্বন্ধে কর মহাশয়ের পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে পাই "বাং ১২৯১ সনে শারদীয় উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় আসিয়া উৎসাহের সহিত উৎসবের নিয়মিত কার্য্য নির্বাহ করেন। শারদীয় উৎসবে 'প্রকৃত উপাসনা কি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।" কুমারখালির উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ "বিজয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষায় "আচার্য্য দেবের (বিজয়কৃষ্ণের) সরল প্রাণস্পর্শী ভাবের সংমিশ্রণে সকলেই পরিতৃপ্ত হন। উপাসনান্তে গোস্বামীদেব আসিয়া সঙ্গীতের মধুর ভাবরসে প্রমত্ত হইয়া প্রেমানন্দে বিকল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। প্রাণ মনোমুগ্ধকর সে এক অপূর্ব ব্যাপার।" বলিতে কি এখন হইতে বিজয়কৃষ্ণের সমুদায় ব্যাপারই আশ্চর্য; আমরা যাহারা এ সকল ব্যাপাব দেখি নাই— তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে সমসাময়িক লিখিত বিবরণ হইতেই একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে হইবে। এই সম্বন্ধে পুনঃ পুঃ বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ উক্তি হইতেই জানা যাইবে সেই সময়ের লোকেরা বিজয়কৃষ্ণের আচরণে কতদূর বিমোহিত হইয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১লা আশ্বিন তারিখে বিজয়কৃষ্ণের অনুপস্থিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রাধিকা গোস্বামীকে বলিতেছেন, "বিজয় এখন বেশ হয়েছে। হরি হরি বলতে বলতে মাটিতে পড়ে যায়। চারটে রাত পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাঙ্গ। গদাধরের পাটবাড়ীতে আমার সঙ্গে গেছলো, আমি বললাম এখানে তিনি ধ্যান করিতেন, সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ।" তখনও সাধারণ্যে বিজয়কৃষ্ণ, ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ,—তাই রাধিকা গোস্বামী মহাশয় অবাক হইয়া বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণে মূর্ত্তির সম্মুখে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাষ্টাঙ্গ! আর আচারি খুব।

গোস্বামী। এখন সমাজে নিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে লোকে কি বলবে তা অত চায় না।

গোস্বামী। না, সমাজ তা হ'লে কৃতার্থ হয় অমন লোককে পেলে।

শ্রীবামকৃষ্ণ। আমায় খুব মানে। তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায়

---

* এই উৎসব আশ্বিনের প্রথম দিকেই হইত।—লেখক

ডাক, কাল আর একজায়গায় ডাক। সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাদের সমাজে বড় গোল উঠেছে।

গোস্বামী। আজ্ঞা, কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাকে বলছে তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো। তুমি পৌত্তলিক। × × আর অতি সরল। সরল না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

উদ্ধৃত কথোপকথনটি হইতে বুঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণকে কত ভালবাসিতেন। তা ছাড়া বিজয়কৃষ্ণের কর্মব্যস্ত জীবনের ইহা একটি সুন্দর snapshot. ব্রাহ্মধর্মের সহিত বিজয়কৃষ্ণের মত বিরোধ ও কেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাও শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়। বিজয়কৃষ্ণের রূপান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন স্পষ্টতঃ উৎফুল্ল, ব্রাহ্ম কর্মকর্তারা যে সেইরূপ শঙ্কিত তাহা অনুমান করা শক্ত নয়।

বিজয়কৃষ্ণ যে ঢাকা কুমারখালির সফর ৯।১০ আশ্বিনের পূর্বেই শেষ করিয়া কলিকাতায় ফেরেন তাহার প্রমাণ এই যে রামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখা যায় যে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২৮শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর কলিকাতায় তাঁহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হইয়াছে। কথামৃতে বিবৃত রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ মিলনগুলি সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক। বিজয়কৃষ্ণের ঐ সময়ের মতামত বা অভিব্যক্তির স্তর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিবার পক্ষে এগুলি মূল্যবান। ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথকে দেখিবার জন্য আসেন। শিবনাথ বাড়ি নাই, কি হইবে ভাবিতেছেন, এমন সময় বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষেরা অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে মন্দিরে লইয়া গেলেন। সমস্ত কথাবার্তা বিজয়কৃষ্ণের সহিতই হইতেছিল, অবশ্য উদ্দেশ্য আর সকলে শুনুক। বিজয়কৃষ্ণের মতামত ও কার্যকলাপ যে কর্তৃপক্ষের বেশ রুচিকর হইতেছিল না তাহার আভাস এই কথোপকথন হইতেও পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণকে সহাস্যে বলিতেছেন, "তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে। যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎ লোক তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে।" বিজয়কৃষ্ণ এ উপদেশের তাৎপর্য নিজের জীবনে খুব ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন তথাপি বয়োজ্যেষ্ঠ মহাত্মার সহানুভূতি ও সমর্থন যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিত তাহা স্বীকার করিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে বাঙ্গালী বীর সত্য ও ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, সমকালীন বা

পরবর্তী বাঙ্গালীদের নিকট তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক লাঞ্ছিত অথবা অবহেলিত। বিজয়কৃষ্ণ আপন জীবন কালে সকল নিন্দা, অপমান, অবজ্ঞা নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন, এ সকলের দিকে ফিরেও তাকান নাই।

দুই দিন পরেই রাম মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ও কেদার চট্টোপাধ্যায় সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ও কেদারকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আজ বেশ মিলেছে, দুজনেই এক ভাবের ভাবী" তারপব শিবনাথের সহিত যে পূর্বদিন দেখা হয় নাই সেই সংবাদ শিবনাথ জানেন কিনা বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাঁহাকে জানান হইয়াছে। পরে অন্যান্য উপদেশের পর বিজয়কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমাদের দুইই আছে, যোগ ও ভোগ। জনক রাজার যোগও ছিল ভোগও ছিল। তাই জনক রাজর্ষি, রাজা ঋষি দুইই" এ মন্তব্য-টুকু সম্বন্ধে এইটুকু বলিবার যে শ্রীরামকৃষ্ণ আজ স্বেচ্ছায় জনক রাজার সহিত বিজয়কৃষ্ণের তুলনা করিলেন কিন্তু জনক রাজার সহিত তুলনা তিনি শীঘ্র করিতেন না। তাঁরই কথায় "কেশব সেন, প্রতাপ এঁরা বলেছিলেন, মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত, আমি বল্লুম জনক রাজা অমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনক রাজা আগে হেটমুণ্ড হয়ে, নির্জনে বসে কত তপস্যা করে ছিল। তোমরা কিছু কর, তবেত জনক রাজা হবে।"

আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই ঈশ্বর বিষয়ক গান বা কীর্তনে বিজয়কৃষ্ণ ভাবে বাহ্য হারাইয়া ফেলিতে ছিলেন। আজও "শ্রীরামকৃষ্ণ যখন 'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী' গাহিতে ছিলেন, তখন হঠাৎ হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে বিজয়কৃষ্ণ দণ্ডায়মান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবোন্মত্ত হইয়া বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।" আমরা যে বিজয়কৃষ্ণকে চিনি, ভাবে মাতোয়ারা সেই বিজয়কৃষ্ণ অল্প দূর।

১লা আক্টোবর আবার উভয়ের দেখা অধর সেন মহাশয়ের কলিকাতার বাটীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নারাণ ও বাবুরামকে তাঁহাদের প্রণাম করিতে বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ ও কেদারকে বলিলেন আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন এদের ভক্তি হয়। অন্যান্য কথাবার্তার পর অধর বলিলেন, "শিবনাথবাবু সাকার মানেন না।" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "সেটা তাঁর বুঝার ভুল। ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী, কখনও এ রং, কখনও সে রং। যে গাছ তলায় বসে থাকে সে ঠিক জানতে পারে। আমি ধ্যান করতে করতে দেখতে পেলাম চালচিত্র, কত দেবতা, তাঁরা কত কি

বললেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার ঠিক দেখা হয়েছে, বিজয় বলিলেন, তিনি অনন্তশক্তি, আর এক রূপে দেখা দিতে পারেন না? কি আশ্চর্য্য! সব রেণুর রেণু, এরা সব কিনা এই সব ঠিক করতে যায়।" বিজয়কৃষ্ণ নিশ্চয় বুঝিতেন এই সকল কথা বলায় বিপদ আছে, তবু সত্য লুকাইয়া রাখিতে তিনি জানিতেন না—তা সে ফল যাহাই হোক।

বিজয়কৃষ্ণের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই মনে করিতেন। পর দিন (২রা অক্টোবর) মণিলাল কেশববাবুর পিতামহ রাম কমল সেন ও পিতা প্যারীমোহন সেনের সুখ্যাতি করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন হয় না। ছাখো না বিজয়ের অবস্থা। বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে হরি হরি বলে উঠে পড়ে। আজকাল বিজয় সব দর্শন ঠিক ঠিক করছে। সাকার নিরাকারের কথা বিজয় বল্লে যেমন বহুরূপীর রং লাল নীল সবুজও হচ্ছে আবার কোন রং নাই। কখনও সগুন কখনও নির্গুণ। বিজয় বেশ সরল খুব উদার। সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ী গিয়েছিল, তা যেন আপনার বাড়ী, সবাই যেন আপনার। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না।" এই উদার সরল সাধারণ পরিচিত অর্থে তিনি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার নিকট এই কথা দুটি অতি ব্যাপক ও গভীর অর্থ বহন করিত; তিনি বলিতেন, "ছাখো না, যেখানে অবতার সেখানেই সরল × × শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাকলে উদার সরল হয় না।"

শ্রীম লিখিত পরবর্তী মিলন হইতেছে ১৯শে অক্টোবর। সিঁথিতে বেণীমাধব পাল মহাশয়ের বাগানবাটীতে, ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন। বিজয়কৃষ্ণই বেদী হইতে উপদেশ দিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত—সকলেই তাঁহার উপদেশামৃত সাগ্রহে পান করিতেছেন। তিনি একান্ত ঈশ্বর পরায়ণতার প্রসঙ্গে বলিলেন, কালকের জন্য না ভাবলে, ঈশ্বর ভাবেন! জ্ঞানোদয় হলে তোমার পরিবারের জন্য তিনি ভাববেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মারা যান, তখন অছি, সেই নাবালকের ভার লয়।" এই ধরনের ঈশ্বর বিশ্বাস বিজয়কৃষ্ণ ইতিপূর্বেই বহুবার দেখাইয়াছেন, তবে সম্পূর্ণ আকাশ বৃত্তি অবলম্বনের তখনও কিছু বিলম্ব আছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি সানন্দে সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আহা কবে সেই অবস্থা হবে।" গোস্বামী চরিত যাঁহারা সামান্যও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার সে অবস্থা ষোল আনাই আসিয়াছিল তবে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই

দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। বেণী পাল মহাশয় এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণকে বেদীতে যাইতে অনুরোধ করিলে বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, মহাশয় আর উপাসনার কি দরকার। আপনাদের এখানে প্রথম পায়সের ব্যবস্থা তারপর কড়াইর ডাল, অন্যান্য ব্যবস্থা। এই বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া বেদীতে গিয়া উপাসনা করিলেন। প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বিজয়কৃষ্ণ মাতৃ সম্বোধন করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি যে মা, মা, বলে প্রার্থনা করছিলে এ খুব ভাল।" মা সম্বোধন অবশ্য বিজয়কৃষ্ণ বহুদিন হতেই করিতেছেন, তখনও সমাজে নিশ্চয় উহা খুব চলে নাই। এই সিঁথির উৎসব সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদটি এইরূপ, বিগত ৩রা ৪ঠা কার্তিক সিঁথি উত্তরপাড়া ব্রাহ্মসমাজের ষান্মাষিক উৎসব বাবু বেণীমাধব পাল মহাশয়ের উদ্যানে সম্পন্ন হইয়াছে। বৈকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্য করেন।

৯ই নভেম্বর আবার বিজয়কৃষ্ণ কয়েকটি ব্রাহ্মভক্তের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। আলোচ্য দিনে বিজয়কৃষ্ণের সহিত অনেক কথাবার্তা হইল, ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতার কথা উঠিলে বিজয়কৃষ্ণ গয়ায় সাধুদের কথা বলিয়া ভক্তমালের এই বিষয়ক একটি গল্পের উল্লেখ করিলেন। পরে কীর্তন আরম্ভ হইলে, কীর্তনের সত্যকার উপলব্ধা ভক্ত হিসাবে বিজয়কৃষ্ণকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "তুমি অমন জায়গায় বসলে কেন, এ দিকে সরে এস।" এই সকল ছোট ছোট কথায় উভয়ের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা সুন্দর প্রকাশ পায়। সংকীর্তনে খুব মাতামাতি হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিলেন, বিজয়কৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন, হুঁস নাই। কীর্তনান্তে বিজয় চাবি খুঁজিতেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, এখানেও একটা হরিবোল খায়। তারপর বলিলেন, এ সব আর কেন? অবশ্য ইহার উত্তরে বিজয়কৃষ্ণ বলিতে পারিতেন সংসারের সহিত তাঁহার যোগ একান্তই বাহিরের, তবে কর্তব্য যতদিন আছে ততদিন তাহা নিষ্কামভাবে সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। বলা বাহুল্য নিরহঙ্কার বিজয়কৃষ্ণ ইহার কোন উত্তর দিলেন না। বাগচী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কলিকাতায় অবস্থিতি কালে ২।৩ বৎসর, সপ্তাহের মধ্যে ন্যূন কল্পে ৩।৪ দিবস বিজয়কৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমীপে উপস্থিত হইতেন। দুঃখের বিষয় এই সকল মিলনের বিবরণ প্রকাশিত নাই—সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে লিখিত বিবরণগুলি এত মূল্যবান। তারিখ সমন্বিত থাকায় সময়ের ক্রমটি মিলাইয়া লওয়া যায়।

অগ্রহায়ণের শেষ দিকে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকার উৎসবে যোগদান করিবার জন্য

তথায় গমন করেন। তত্ত্বকৌমুদীর ১লা পৌষের খবর হইতেছে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে আহূত হইয়া ঢাকা গমন করিয়াছেন। তিনি সত্বর কলিকাতা আগমন করিবেন এবং পুনরায় বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করিবেন। এই ঢাকার উৎসব সম্বন্ধে বঙ্ক কর মহাশয় তাঁহার পূর্ব বঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে এইরূপ লিখিয়াছেন, "বাং ১২৯১ সনে সাম্বৎসরিক উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় আসিয়া উৎসাহের সহিত উৎসবের নিয়ম মত কার্য করেন। এই উৎসবে তিনি 'ধর্মে সম্প্রদায় নাই' 'যোগতত্ত্ব ও ধর্মজীবন গঠন' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন সহরের শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য দেশীয় এবং বিদেশীয় বহুলোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলে প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনা ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পাঠ করেন। পরে গোস্বামী মহাশয় ও শাস্ত্রী মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনান্তে পূর্বাহ্ণের কার্য্য শেষ হয় এবং সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হয়।" রামপুর বোয়ালিয়া উৎসবের বিবরণ বাগচী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন, জলধর সেন মহাশয়ের "কাঙ্গাল হরিনাথ" গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে কারণ হরিনাথ মজুমদার অর্থাৎ কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইহার পরই মাঘোৎসব। তত্ত্বকৌমুদী ধরিয়াই ইহার বর্ণনা করা যাক। এই মাঘ উৎসবের উদ্বোধনে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আচার্যের কার্য করেন। ৮ই মাঘ মঙ্গলবার এদিকে সিটি কলেজ ভবনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী বন্ধু সমবেত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন। ওদিকে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে * ভক্তির প্রবল তরঙ্গ বহিতেছে। কতকগুলি বন্ধু তাঁহার সামান্য কুটীরে সমবেত হইয়া নাম গানে মত্ত হইয়াছেন। কীর্তন প্রার্থনা সঙ্গীত, সঙ্গীত প্রার্থনা কীর্তন অবিচ্ছিন্ন ধারাতে চলিতেছে, ভক্তদল ক্ষণে ক্ষণে হাসিতেছেন, ক্ষণে অচেতন হইয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। ক্রমে বেলা ১টা

* বিজয়কৃষ্ণ এই সময় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পশ্চাদভাগস্থ প্রচারক ভবনে অবস্থান করিতেন। ইহা কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অবস্থিত। প্রত্যক্ষদর্শী বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন। "এই গৃহের নিম্নতলে তাঁহার পারিবারিক দেবালয়ে প্রায় সারাদিন সাধনভজন, কীর্তন ও শাস্ত্রপাঠ হইত। ভক্তগণ আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে সেখানে আসিতে লাগিলেন। সুতরাং দিনের পর দিন বিজয়কৃষ্ণের আবাস ভবনে অবিরাম উৎসব চলিতে লাগিল।"—লেখক।

বাজিয়া গেল। প্রাতে ৭টায় তাঁহাদের বৈঠক বসিয়াছে, তখনও হুঁস নাই। মধুভাণ্ড হইতে মধুমক্ষিকাকে স্বতন্ত্র করা যেমন দুষ্কর,, সেই ভক্তমণ্ডলীকে স্নান আহারার্থে ধরিয়া আনাও তেমনি দুষ্কর।" এই মধুভাণ্ড যে গয়া প্রত্যাগত অগ্নিস্পৃষ্ট বিজয়কৃষ্ণ তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সত্যকার মধুলোভীরা তাঁহাকে যেন আর ছাড়িতে চাহিতেছেন না, কিন্তু সংসারে সকলেই ত আর মধুলোভী নন্। উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে সমাজে আর আর সকল হইতে বিজয়কৃষ্ণের অন্তরঙ্গগণ যেন একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছেন, এই স্বাতন্ত্র্য কিছুদিনের মধ্যেই প্রকট হইয়া পড়িতে দেখা যাইবে। ১১ই মাঘের উৎসবের বিবরণ দিতে গিয়া তত্ত্বকৌমুদী লিখিতেছে, "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদিতে আরোহণ করিয়া উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। উদ্বোধন শেষ হইল, আরাধনা শেষ হইল, ধ্যানের সময় অতীত হইল, সমস্বরে প্রার্থনা হইয়া গেল, উপাসকদিগের মনে আর ধৈর্য্য ধরে না। অবশেষে উপদেশের সময় প্রাণ ফাটিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। পাষাণ গলিয়া গেল, নরনারীর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া চলিল; সে দৃশ্য, সে স্বর্গীয় দৃশ্য, কে বর্ণন করিবে? রমণীয় উদ্যানে একেবারে শত স্ফটিক ফোয়ারা উন্মুক্ত হইলে যে শোভা হয়, আজ তাহাও ভক্তির শত প্রস্রবণের নিকট পরাজিত হইল। নরনারীর প্রাণভেদ করিয়া ভক্তিবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাঠক আর নয়, সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার প্রয়াস বৃথা। যদি সহৃদয় হও, কল্পনা চক্ষে সে চিত্র অঙ্কিত করিয়া কথঞ্চিৎ বুঝিলেও বুঝিতে পার।" ঐ দিনের উপাসনার কথা তত্ত্বকৌমুদীতে অন্যত্র লেখা হইয়াছে, "এই ভক্তির উচ্ছ্বাসের মধ্যে উপাসনা আরম্ভ হইল। আজ আর গোস্বামী মহাশয় প্রণালীবদ্ধ উপাসনা করিতে পারিলেন না, আজ আর নিয়ম থাকিল না, আজ আর উপদেশ হইল না। পূর্ব্বাবধি শেষ পর্যন্ত কেবল প্রার্থনা, কেবল অশ্রুপাত ও ভক্তগণের আনন্দ মিশ্রিত রোদন ধ্বনি, আজ সন্তানগণের মা মা ধ্বনিতে বিশ্বজননীর ঘর ফাটিয়া গেল। আজ আমরা কি শুনিলাম ও কি দেখিলাম তাহার আর ঠিক থাকিল না, মন্দিরে আসর ভাঙ্গিল, গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আবার আসর বসিল। সেখানে নৃত্যগীত ও হাস্যরোদন মূর্চ্ছা চলিতেছে। এদিকে মন্দিরে কেহ কেহ পড়িয়া আছেন। তাঁহারা আর উঠিলেন না, সমস্ত দিন তাঁহাদের সেই সুখভোগেই গেল।"

বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী অযথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে তাহা ভাবা শক্ত। ঘটনা কতদূর বিস্ময়কর হইলে তত্ত্বকৌমুদী ঐরূপ লিখিতে পারে পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। বিশেষ করিয়া ঐ ঘটনাকে স্মরণ করিয়াই নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরে লিখিয়া থাকিবেন, "বিজয়কৃষ্ণ বেদীর উপর বসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া

সাশ্রুনয়নে "মা মা" ধ্বনি করিতেছেন আর তাহার সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে "মা" "মা" ধ্বনি বিনিসৃত হইয়া উপাসনা মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সে দৃশ্য কখনও ভুলিব না। মর্ত্তে সেই যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিব না।" যে বিরাট ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নগর কলিকাতার অতি শিক্ষিত সমাজ একযোগে অনেকে মর্ত্তে কৈবল্যধাম দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছিল, তাঁহারই কলিকাতায় স্থান হইতেছিল না। ধর্মের প্রবল বন্যায় যে কলিকাতা ডুবু ডুবু, যদি উহা ভাসিয়া যায়, তবে সমাজের কর্তৃপক্ষগণ থাকেন কোথায়? তাই এই প্রশংসার মধ্যে হয়ত একটা গভীর আশঙ্কাও ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদে এই উৎসব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে সময় কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীর কার্য্যনির্বাহ করেন, সেই সময় এইরূপ একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকেই "মা মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে মহম্মদ নানকের হাত ধরিয়া, নানক আবার অন্য ভক্তজনের সঙ্গে গলাগলি হইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন।" তত্ত্বকৌমুদী এই সংবাদটুকু দিতে ভরসা করে নাই এবং যাঁহারা অতিলৌকিক বিশ্বাস করিতে চান না, তাঁহারা কাঙ্গালের দর্শনকে তাঁর মনের অধ্যাস মনে করিতে পারেন। তবে জলধর সেন মহাশয় কাঙ্গালের ডায়েরী হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ একই দৃশ্য ঐ দিন অনেকে দেখিয়াছিলেন। তত্রাচ অতিলৌকিককে যদি কেহ আমল দিতে না চান তবে তাঁহার সহিত আমি বিবাদ করিব না। উদ্ধৃত বিভিন্ন বিবরণগুলি হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রতীয়মান হইবে যে বিজয়কৃষ্ণের উপসনায় ঐ দিন অভাবনীয় একটা কিছু ঘটিয়াছিল। ঈশ্বরীয় ভাব তাঁহার মধ্যে ঐ সময় এতই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল যে সেই উপচীয়মান ভাবের সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিতেন তাঁহাদের মধ্যেই একযোগে সেইভাব কতকাংশে সঞ্চারিত হইয়া পড়িত। বিজয়কৃষ্ণ গয়া হইতে এমন কোন বস্তু আনিয়াছেন যে তাহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ তথা সারা বাংলাদেশ প্রবলভাবে আলোড়িত হইতে চলিয়াছে।

১২ই মাঘের বিবরণটি এইরূপ, "অদ্য শনিবার প্রাতে গোস্বামীমহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। উপাসনাটি অতি মধুর হইয়াছিল। তদুপলক্ষে তিনি যে উপদেশটি দিয়াছিলেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। উপাসনা শেষ হইল। কিন্তু ভক্তদলের প্রাণের পিপাসা মেটে নাই। তাঁহারা বেশ কয়জন মন্দিরে

পড়িয়া দলবদ্ধ হইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। গভীর কল্লোল স্রোত বহিতে লাগিল, সে ভাবের বাতাস লাগিলে মানুষের মন জাগিয়া উঠে।" ১৩ই মাঘও বিজয়কৃষ্ণ বেদী হইতে উপদেশ দেন। ঐ উপদেশ বিশেষ করিয়া তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করিয়া প্রদত্ত হয়, কারণ ঐ দিন নগেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে সারারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষিক্ত হন। এই উপদেশে তিনি বলিয়াছেন, "বাস্তবিক ধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদা।" কেবল নিজে ধর্ম-লাভ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ সুখী নন, তিনি এই ধর্ম বিলাইতে চান, এবং তাহাও অযাচিতভাবে। তিনি বলিতেছেন, "কোথা হইতে সম্বৎসর পরে উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিবে, তবে প্রচার করিতে যাইব, এভাবে প্রচার করিতে যাইলে চলিবে না। আমার ভাই জলে ডুবে গেল, আমাকে ডাকিল না বলিয়া আমি কি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি? ডুবলো, ডুবলো বলিয়া চীৎকার করিয়া গিয়া ধরিতে হয়। সেইরূপ পাপভারে কাহাকেও ডুবিতে দেখিলে ছুটিয়া গিয়া ধরিব। ভগবান আপনাকে সেইরূপ ভার দিন, আমরা দেখিয়া ধন্য হই।"

ইহার পরের কয়েক মাসের ঘটনা ১৮০৭ শকের ১লা বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত এই বিবরণটুকু হইতে প্রতিভাত হইবে। তত্ত্বকৌমুদি লিখিতেছে, "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৎসরের প্রথম ভাগে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য কলিকাতায় থাকেন। মাঘোৎসবের পর শান্তিপুর গমন করিয়া তথায় একটি বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং একদিন নগর সংকীর্ত্তনের সময় প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে কালনা সমাজের উৎসবে গমন করেন। তথা হইতে কলিকাতা আগমন করিয়া মন্দিরের নিয়মিত উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেখানে হইতে থৈপাড়া গ্রামে একটি বিবাহের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য গমন করেন। তৎপরে বোলপুর হইয়া রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে গমন করেন। * সেখানকার উৎসব শেষ করিয়া আগমনকালে 'সিউড়ি

* এই উৎসবের কথা হরিদাস বসুমহাশয় তাঁহার সদ্গুরু লীলা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বেদীর কার্য্য করিবার কথা, তিনি অসুস্থতার জন্য আসিতে পারিবেন না লিখিয়াছেন; সকলে চিন্তাকুল কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, ভাবিবার কারণ নাই—তিনি আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে টিকিট কিনিতে ও ট্রেনে চড়িতে দেখিলাম। সকলকে বিস্মিত করিয়া সত্যই তিনি আসিলেন এবং বেদীর কার্য্য করিলেন। একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির সাখ্যে ইহা প্রমাণিত। স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।— লেখক।

যাইয়া বক্তৃতাদি দ্বারা সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া মন্দিরের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর কুমারখালি হইয়া ঢাকা গমন করিয়াছেন।"

বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে এইরূপ আছে, "এবার বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রকৃত উৎসব ৮ই ফাল্গুন বুধবার হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার পূবে কয়েকদিন অবধি সমাজে ও কোন কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতার বাসায় প্রাতঃ-সন্ধ্যা উপাসনা চলিতেছিল। উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ৮ই ফাল্গুন সন্ধ্যার পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ৯ই প্রাতে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ও সন্ধ্যার পর বাবু বীরেশ্বর সেনের বাসায় উপাসনা হয়। দুই বেলায় গোস্বামীমহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ১১ই শনিবার গোস্বামীমহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ১২ই রবিবার প্রাতে সমাজগৃহে গোস্বামীমহাশয় উপাসনা করেন। নটার পর নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। × × রামপুরহাটের শ্রদ্ধেয় রাজকুমারবাবু প্রমত্ত অবস্থায় একটি গান ধরিয়া বাহির হইলেন এবং × × গোস্বামীমহাশয় নৃত্য করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কখনওবা ধুলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনটী বাস্তবিকই বড় সুন্দর হইয়াছিল। ১৩ই সোমবার প্রাতঃকালে গোস্বামীমহাশয় সমাজগৃহে উপাসনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৭টার পর বিজয়বাবু জীবন-গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।" এই উৎসবের সময় গোস্বামীপুত্র যোগজীবন পিতার নিকট হইতে যোগদীক্ষা লাভ করেন বলিয়া অনুমিত হয়। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দীক্ষা লাভ করেন। বিজয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে সদগুরু রূপে আবির্ভূত হইতে চলিয়াছেন।

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিজয়কৃষ্ণের কার্য্যকলাপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের যে রুচিকর হইতেছিল না এবং তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান ভাবুকতায় যে তাঁহারা আশঙ্কিত হইতেছিলেন তাহার আভাস আমরা দিয়াছি। এসম্বন্ধে বাগচী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে চিন্তাশীল বিজ্ঞ জনগণ মনে করিলেন, গোস্বামীমহাশয়কে পরমহংসদেব প্রভৃতির সংসর্গ হইতে স্থানান্তরে না রাখিতে পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণ বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর নহে। গোস্বামীমহাশয়ের বর্ত্তমান ব্যবহার ও দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুকঠিন হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা গোস্বামীমহাশয়কে

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজেই রাখিতে কৃতসংকল্প হইয়া নিজেদের মধ্যে গোপন পরামর্শ স্থির করিলেন।"* সে যাহাই হোক বাং ১২৯১ সালের চৈত্রের শেষে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় উপস্থিত হইলেন।

আটাশ

ঢাকায় আসিয়া তিনি 'রাজচন্দ্র ব্রাহ্ম প্রচারক নিবাসে' বাস করিতে থাকেন। বঙ্ক কর মহাশয়ের ভাষায়, "তাঁহার পুনরাগমনে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণ অত্যন্ত উৎফুল্ল ও উৎসাহান্বিত হইলেন।" এই সময় বিজয়কৃষ্ণের কার্য্যাবলীর বিবরণ তত্ত্বকৌমুদীতে বিশেষ পাঠান হইত না বলিয়া মনে হয় কারণ ১ল আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে এই সংক্ষিপ্ত সংবাদটুকু মাত্র দেখা যায়, "ঢাকার নববিধানী বন্ধুদিগের কাগজ 'নিউলাইট' পাঠে অবগত হওয়া গেল যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বন্ধুর সমভিব্যাহারে এই বন্ধোপলক্ষে বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন।" কলিকাতা কর্তৃপক্ষের সহিত বিজয়কৃষ্ণের যে বেশ বনিতেছিল না তাহা ইহা হইতে স্প অনুমিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যমণি বিজয়কৃষ্ণের সংবাদ নববিধানী কাগজ হইতে লইতে হইতেছে, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

কর মহাশয় তাঁহার 'পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে' এই প্রচারভ্রম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "গোস্বামীমহাশয় এই সময়ে (বাং ১২৯২) কতিপ উৎসাহী ব্রাহ্মের সহিত বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচারে গিয়া পশ্চিমপাড়া, বীরতার কোলা, জৈনসার প্রভৃতি গ্রামে কীর্ত্তন, উপাসনা, বক্তৃতা ও আলোচনা যোগে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করেন। × × কলাকোপা গ্রামে গোস্বামীমহাশয় মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে এই বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করান যে, নিরাকার ব্রহ্মোপাস হিন্দুশাস্ত্র সম্মতই বটে।" ১২৯২ বাংলা সনের আষাঢ় মাসে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের পুত্র কর্তৃক আহূত হইয়া মিত্র মহাশয়ের সমা

* বিগত মাঘোৎসবের সময়েই স্থির হইয়াছিল যে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকার ভার গ্র করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, "প্রচারকগণ উৎসবের প্রথমেই নিম্নলিখি রূপে আপনাদের বর্ত্তমান বৎসরের (ব্রাহ্ম বৎসর) কার্য্য প্রণালী স্থির করে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় পূর্ব বাংলার ভার লইয়া অধিকাংশ সময় অবস্থি করিবেন।"—লেখক

স্থানে ব্রহ্মোপাসনার জন্য নবাবগঞ্জ গমন করেন, এবং কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তন, আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার ধর্মভাবে গ্রামবাসীগণ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন।" *

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণীতেও বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি অল্পই নূতন খবর আছে। সেখানে মাত্র এইটুকু আছে, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরেই অবস্থান করত তত্রত্য সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্বাহ করেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কোন সভ্যের বাসাতে উপাসনাদির দ্বারা এবং সমাজের লোকদের সহিত আলাপাদির দ্বারা ধর্মপ্রচারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কিছুদিন হয় তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য কতিপয় বন্ধুর সহিত ঢাকা হইতে বাহির হইয়া বিক্রমপুর গমন করিয়াছিলেন। পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখানে কার্য্য করিতেছিলেন। কর মহাশয় তাঁহার পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন, "প্রচারকনিবাসবাসী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সংস্পর্শ লাভের জন্য এবং তাঁহার ধর্মালোচনা ও কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিবার জন্য ঐসময় প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রচারক নিবাসের নীচের বড় ঘরে ধর্মপ্রাণ অনেক লোকের সমাগম হইত এবং তাঁহাদের ব্যাকুলতা হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া একটি পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি ও মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হইত।" যেখানে বিজয়কৃষ্ণ সেইখানেই মহামহোৎসব।

বিজয়কৃষ্ণ যেমন পূর্ণ উদ্যমে ধর্ম বিকীরণ করিতেছিলেন সেইরূপ সমান উৎসাহে ধর্মের অনধিগত সত্য সকল আহরণে যত্ন পাইতেছিলেন। ঢাকা অবস্থান

* এই সময়ে অর্থাৎ ১২৯২ বাংলা সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৮৫ জুন) বিজয়কৃষ্ণ কামাখ্যা তীর্থ গিয়া থাকিবেন। বিজয়কৃষ্ণের কোন জীবনীকারই এই কামাখ্যা ভ্রমণটির যথাযথ কালের ইঙ্গিত দেন নাই। অমৃত গুপ্ত মহাশয় ইহাকে ১২৯৩ বাংলা সালের কাকিনা উৎসবের অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদ-ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা বলিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই কাকিনা উৎসব ১৯শে বৈশাখ আরম্ভ হইয়া ২৩শে শেষ হয় এবং বিজয়কৃষ্ণ উৎসবান্তেই কলিকাতায় পৌছান ২৫শে বৈশাখ সুতরাং সে যাত্রায় কামাখ্যা ভ্রমণের সময় নাই। তা ছাড়া বিজয়কৃষ্ণ যদি অম্বুবাচীর সময় তীর্থ দর্শন করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে আষাঢ় মাসে কামাখ্যা যাইতে হয়। কোন কোন গ্রন্থে পাই গোস্বামী জায়া যোগমায়া কামাখ্যা দর্শনের পর দীক্ষাপ্রার্থী হন। সেইদিক দিয়াও ১২৯২ এর আষাঢ়ই সম্ভাব্য সময়। —লেখক

কালে তিনি অনেক সময় গেণ্ডেরিয়ার এক বৃক্ষতলে নির্জন সাধনে যাপন করিতেন। কঠোর সাধন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণে একটা দারুণ শুষ্কতা আসিল। সাধন-পথে ইহা নাকি একটা অবশ্যম্ভাবী স্তর—ইহাকে 'পঞ্চতপা' কহে। নামাগ্নিতে অন্তরের বাসনা সকল যখন নিঃশেষে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন এই শুষ্কতা ও জ্বালা অনুভূত হয়। বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা সুকঠিন, বোধ হয় যেন শরীরের চারিপাশ হইতে কাঁটা বেঁধে। এইরূপ শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ দ্বারা বর্ত্তমান পাপরাশি জ্বলিয়া গেলেই তাঁহার দর্শন লাভ করা যায়। কিন্তু এই পাপরাশি বা বাসনারাশি জ্বলিবার সময় যে জ্বালা ও শুষ্কতা আসে সেই সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সাধনের সময় বিবিধ অবস্থা ভোগ করিতে হয় বলিয়াই ধর্মের এত সৌন্দর্য্য। নানাপ্রকার নিরাশা, শুষ্কতা না আসিলে ধর্মের এতটা শোভা হইত না। ধর্মের মূল্য বুঝিবার জন্যই এই সকল অবস্থায় পড়িতে হয়। নানা বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া যখন ধর্মপথের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিবে তখনই চিরশান্তি। এই শান্তি একবার লাভ হইলে আর কষ্ট হয় না।" ইহা অবশ্য তিনি ধর্মের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়া বলিয়াছিলেন। আলোচ্য সময়ে তিনি এই শুষ্কতা অনুভব করিয়া আপন গুরুদেবের স্মরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে জ্বালামুখী যাইতে উপদেশ দেন। বোধহয় সেই উপদেশ অনুসারেই বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। ঠিক কবে তিনি ভ্রমণে বাহির হন এবং এই যাত্রায় তিনি কোথায় কোথায় গমন করেন এবং কোন সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহা জানিবার উপায় নাই। অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন কি না তাহা জানি না, এবং তাঁহার চরিতকারগণ এই যাত্রার কেহই বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত দুই একটা সংবাদ হইতেই আমাদের এই ভ্রমণ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় আসিবার পূর্বেই দুই একজনকে যোগ দীক্ষা দিয়াছেন। ঢাকায় আসিয়া দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। কামিনীমোহন বসু মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী শরৎকামিনী বসু মহোদয়ার 'সৎপ্রসঙ্গ' হইতে জানা যায় যে এই বৎসর জন্মাষ্টমীর কয়েক দিন পরে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে কামিনী মোহনের দীক্ষা হয়, তাহার পূর্বে শরৎকামিনীর দীক্ষা হয়, এবং তাহারও পূর্বে বিজয় জায়া যোগমায়া এবং অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের দীক্ষা হয়। শান্তি সুধা, কুতু প্রভৃতি গোস্বামী তনয়াদের দীক্ষাও এই সময় বরাবরই হয়। যোগমায়া গুহের "নরদেবতা গোঁসাইজী" হইতে জানি যে তাঁহার স্বামী সত্যকুমার গুহ বাং ১২৯২ সনের আশ্বিনে দীক্ষা লাভ করেন। সুতরাং পঁচিশ বৎসর পূর্বে যে

বিজয়কৃষ্ণ বংশানুক্রমিক কুলগুরু সুবাদে কোন কাতরা বৃদ্ধা শিষ্যাকে জ্ঞানাঞ্জন দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আজ ২৫ বৎসরের অক্লান্ত সাধনার পর নিজে যেমন কৃতার্থ হইয়াছেন অপরকেও পথ বাৎলাইবার যথেষ্ট সামর্থ্য অর্জন করিয়াছেন। পুরাদস্তর সামর্থ্যবোধ না করিলে যে তিনি এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। এই সময়ে ভক্তের চোখে বিজয়কৃষ্ণ কিরূপ প্রতিভাত হইতেন তাহার পরিচয় পাই শরৎকামিনী দেবীর সৎপ্রসঙ্গে। তিনি লিখিতেছেন, "ঠাকুরের জ্যোতির্ময় রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইলাম। কক্ষ-ধূপ গুগগুল চন্দন ও পুষ্পে সুরভিত, তাহার মাঝে দীক্ষিত হইলাম। জীবনধন্য হইয়া গেল, সে আনন্দ ভাষায় বোঝান অসম্ভব।" সেই সময়ের শত শত কৃতবিদ্য ব্যক্তি অনুরূপ ভাষায় আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং ইহাকে অনুরাগী ভক্তের অতি-রঞ্জিত উচ্ছ্বাস ভাবিলে ভুল করা হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১লা কার্ত্তিকে প্রকাশিত তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ হইতে জানা যায় যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় ঢাকা নগরেই অবস্থান করিয়া তত্রত্য সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন উপাসনা, কীর্ত্তনাদি দ্বারা ধর্মপ্রচারের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি ভ্রমণার্থ পশ্চিমাঞ্চল গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি অর্থে দিন পনের পূর্বে হইলে, বিজয়কৃষ্ণ আশ্বিনের গোড়ার দিকে ভ্রমণে বাহির হইয়া থাকিবেন। সত্যকুমারের দীক্ষা আশ্বিনে হইলে, বিজয়কৃষ্ণ আশ্বিনের কয়েকদিন ঢাকায় ছিলেন ধরিয়া লইতে হয়। এই সময়েই তাঁহার লেখা 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে পরীক্ষিত বিষয়'এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অনুমতি দেন। অবশ্য পরবৎসর (১৮৮৬) অগ্রহায়ণের পূর্বে তাহা প্রকাশিত হয় নাই, তবে ইহার শেষ কয় লাইন নিশ্চয় এই সময়ের যোজনা। বিজয়কৃষ্ণ এই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া, "বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা সাধনভজন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ পরোক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত ধর্মলাভ করতে হইলে, উপাসনা, সাধনভজনও প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া যথার্থ ধর্মের জন্য ব্যাকুল হন তাহা হইলে দুঃখীর কথা বাসী হইলে ভাল লাগিবে।" এই প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত ধর্মের পথ দেখাইতেছিলেন তিনি সত্যকার আগ্রহী এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের। আমি এই উদ্ধৃত অংশে তাঁহার যোগ দীক্ষা দানের প্রচ্ছন্ন সমর্থন অনুমান করি। বামাবোধিনী পত্রিকাতে 'আশাবতীর উপাখ্যান'এর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় তিনি এই সময়েই প্রকাশ করাইতে যত্নবান হন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও শক্তি সঞ্চারের কথা আছে। বিজয়কৃষ্ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের বিরূপতা সত্বেও যে সত্য তিনি জানিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবেনই।

১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদীতে এই সংবাদটুকু প্রকাশিত হয়,"কাশী হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কর্মকার মহাশয় লিখিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে আসিয়া একদিন আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারমহাশয়ের বাসায় উপাসনা করেন, তত্রত্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ ও স্থানীয় অনেক লোক উপাসনায় যোগ দিয়া বড়ই উপকার পাইয়াছেন। তৎপরে "ধর্ম কোথায়?" এই বিষয়ে তত্রত্য বাঙ্গালীটোলার প্রিপ্যারেটারী স্কুল গৃহে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটি বড়ই সরল ও মধুর হইয়াছিল এবং এই বক্তৃতা শুনিতে অনেক রাজকর্মচারী ও স্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেনারস ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা হইতে পুনরায় ঢাকা গমন করিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি ১৬ই কার্তিকের কয়েকদিন পূর্বেই ঢাকা ফিরিয়া গিয়া থাকিবেন। যদিও তত্ত্বকৌমুদীতে তাঁহার কাশী যাওয়ার কথাই বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে তবুও 'ইত্যাদি' শব্দের দ্বারা মনে হয় যে তিনি অন্য স্থানেও গিয়াছিলেন। সুতরাং এই যাত্রায় তাঁহার জ্বালা নিবারণের জন্য গুরু নির্দেশমত জ্বালামুখী যাওয়া অসম্ভব নয়। পরের প্যারাতেই দেখিব তিনি "অনেক তীর্থ" ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবারে।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে বিজয়কৃষ্ণ ২৫শে অক্টোবর অর্থাৎ ১০ই কার্তিক শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য শ্যামপুকুর গমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গলার পীড়া চিকিৎসা করাইতে শ্যামপুকুরের বাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। এ বিষয়ে "শ্রীম" লিখিতেছেন, "কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংস দেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় পৌছাইয়াছেন। মহিম চক্রবর্ত্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন। উত্তরে বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, কি বলবো। দেখছি, যেখানে বসে আছি এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এরই এক আনা কি দু আনা, কোথাও চার আনা এই পর্য্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) দেখ, বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে। লক্ষণ

সব বদলে গেছে, যেন সব আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি, পরমহংস কি না।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ, পঞ্চম খণ্ডে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু লেখা আছে, একবার ঠাকুর (বিজয়কৃষ্ণ) পশ্চিমাঞ্চলে বহুস্থান ঘুরিয়া কলিকাতা আসিলেন। একদিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর গেলেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "এত ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখলি বল দেখি।" ঠাকুর কহিলেন, "কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা, কোথাও বার আনা, চৌদ্দ আনাও দেখেছি কিন্তু ষোল আনা এখানে।" দুই বিবরণের মধ্যে যে বৈষম্য তাহা প্রধানতঃ বচন ভঙ্গির বৈষম্য সুতরাং ধর্ত্তব্য নয়। শ্রীম বিবৃত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, আলোচ্য তারিখে বাংলার দুই মহাপুরুষ উভয়ে উভয়কে ব্যক্ত করিলেন। পরমহংসদেবের কথা কয়টি হইতে বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বেই বিজয়কৃষ্ণের সিদ্ধিলাভ হইয়া গিয়াছে, এবং পরমহংসদেবের অন্তর্দৃষ্টি বিজয়কৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা ধরিয়া ফেলিয়াছে। এ যেন বাংলার অন্তগামী ধর্মগুরু আগামী ধর্মগুরুকে অভিবাদন ও আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের ইহাই বিশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি। মনে রাখিতে হইবে যে বিজয়কৃষ্ণ ইহার পর আরও চোদ্দ বৎসর দেহে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অভিব্যক্তির এখানেও শেষ নয়।

ঐ দিন, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে গান করিতে বলিলেন। গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত। "বিজয় সর্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস নাই—ডাক্তারেরও হুঁস নাই, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই স্থির নিস্পন্দ। ভাব উপশম হইলে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে। যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।" এখন প্রশ্ন হইতেছে এইভাবে মাতাল প্রেমিক বিজয়কৃষ্ণকে ব্রাহ্ম-সমাজ আর কতদিন সহ্য করিবে!

উনত্রিংশ

১৬ই কার্ত্তিকের পূর্বেই ঢাকায় যাত্রা করিলেও বিজয়কৃষ্ণ অগ্রহায়ণের পূর্বে কোন সমাজ উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার পুত্র যোগজীবন গোস্বামীমহাশয় বক্তৃতা ও উপদেশের প্রথম ভাগ যাহা

প্রকাশ করেন তাহার প্রথম উপদেশের তারিখ হইতেছে ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সন (বাং)। ইহার পূর্বে কোন উপদেশ দিলে তাহাও গ্রন্থজাত থাকিত হয়ত। এই সময় বরাবরই বিজয়কৃষ্ণ বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন। বরিশালের বিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক গোস্বামী শিষ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় তাঁহার "মনোরমার জীবন চিত্র" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "গোস্বামীমহাশয়কে দেখিবার ইচ্ছায় আমি ব্যস্ত হইয়া ঢাকায় গেলাম, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া জানিলাম, বারদী গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন ঠিক কেহ বলিতে পারিলেন না।" পরে তৃতীয় দিবসে ঢাকা ফিরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই দিনই বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় ফিরিয়াছেন। মনোরঞ্জনবাবু গ্রন্থে তারিখ দেন নাই তবে ঘটনা যে বাগেরহাট বরিশাল মাদারিপুর মানিকদহ কাকিনা ভ্রমণের কয়েকমাস মাত্র পূর্বে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে গ্রন্থে। এই সময়ের বিজয়কৃষ্ণের যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা অপূর্ব। কৌতূহলী পাঠক তাহা ঐ গ্রন্থে পাঠ করিতে পারেন। আমরা তাহার উপসংহারটুকু মাত্র তুলিয়া দিলাম। তিনি লিখিতেছেন, "গোঁসাইজির আচার ব্যবহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হইল তাঁহার অন্তরে একটানা স্রোত সর্বদা ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরের কার্যগুলি উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি পর্বতবাহিনী নদী আপনার মনে আপনি নিরবচ্ছিন্নভাবে একই স্রোতে সাগরের দিকে গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে. বিচিত্র বীচিমালা, নানাবিধ দৃশ্য ও তরুশ্রেণী উপরে নাচিতেছে, খেলিতেছে, ভাসিতেছে, কিন্তু ভিতরে সেই একই স্রোত একই টানে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত, বাহিরের বিচিত্র কার্য্যকলাপ সেই একনিষ্ঠ ভাব-স্রোতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিতেছে না। এরূপ দোতলা মানুষ আমি এই প্রথম দেখিলাম।" এই সময়ের এই বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়াই আর একদল ব্রাহ্ম কিরূপ ভাবিতেছিলেন তাহা গগন হোম মহাশয়ের পত্রে দেখা যাইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি এই সময়ে তত্ত্বকৌমুদীতে বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে খবর তৎপরতার সহিত বাহির হইত না। ১লা মাঘে প্রকাশিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৪র্থ-ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণে মাত্র এইটুকু আছে, "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন পশ্চিমে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন, তখন কাশীনগরে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপর ঢাকা গমন করিয়া তত্রত্য সমাজের সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবার সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সেই উৎসবে ব্রাহ্মধর্মের মত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।" এমন কি ঢাকার মাঘোৎসবের সম্বন্ধেও বিশেষ কোনও খবর নাই।

পরবর্ত্তী ১লা বৈশাখে মুদ্রিত ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণীতে মাত্র আছে "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে না থাকায় তাঁহার কার্য্যপ্রণালী জানা যায় নাই। তিনি সম্ভবত পূর্ববাংলার ভার লইয়া থাকিবেন।" ঐ বিবরণীতেই পরে আছে, "তিনি মাঘোৎসবের সময় ঢাকায় থাকিয়া তথাকার উৎসব কার্য্যের সহায়তা করেন। তৎপরে দ্বারভাঙ্গায় গমন করিয়া তথাকার উৎসবে যোগদান করেন।"

এই মাঘোৎসবের বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমরা বঙ্ক কর মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সনে (বাং ১২৯২) মাঘোৎসবে তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন এবং তাঁহার আহ্বানে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ (হরিনাথ মজুমদার) তাঁহার কীর্ত্তনের দল সহ ঢাকায় আসিয়া গোস্বামীমহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হন। ফিকিরচাঁদের সুমধুর ভাবসঙ্গীতে এবং গোস্বামীমহাশয়ের জীবন্ত উপাসনায় এবার ঢাকায় ভক্তির এক প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। যাহারা এই বৎসর মাঘোৎসবে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সে বৎসর যে দৃশ্য দেখিয়াছি আজীবন তাহা ভুলিতে পারিব না। ফিকিরচাঁদের কীর্তনে সমাজ-মন্দিরে যেন ঢাকা সহর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মন্দিরের ভিতর, বারান্দা, প্রাঙ্গণ অসংখ্য লোকের জনতায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, প্রবেশের পথ ছিল না, বসিবার স্থান তিলার্দ্ধও ছিল না, সর্বত্র লোকে পরিপূর্ণ। দর্শক, শ্রোতা, উপাসক সকলেরই মুখমণ্ডল এক অপূর্ব আগ্রহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। কি দেখিবার জন্য, কি শুনিবার জন্য যেন সকলেই উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে উপাসনার ঘণ্টা পড়িল; অসংখ্য লোকের মধ্যে গোস্বামীমহাশয় বেদী হইতে উপাসনা আরম্ভ করিলেন, মুহূর্তে স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা কত দীনতায় পূর্ণ হইয়া, কত আশা উৎসাহের কারণ হইয়া সকলকে মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। সে কথা যে না শুনিয়াছে সে কিরূপে বুঝিবে? সেরূপ করুণা মাখা, হৃদয় দ্রবকারী কথা আর কোথায় শুনিব? সেই পাষাণ-দ্রবকারী কথা যে শুনিয়াছে তাহার হৃদয় গলিয়াছে।"

"তৎপর যখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন এক প্রবল ভাবতরঙ্গে মন্দিরের অসংখ্য লোক কাঁদিয়া অধীর হইল। অশ্রুধারায় আচার্য্য, উপাসক, দর্শক সকলের বুক ভাসিয়া গেল। বৃদ্ধ কাঁদিতেছে, যুবা কাঁদিতেছে, পুরুষ নারী সকলে মিলিয়া কি এক মধুর কথা শুনিয়া, কি এক স্বর্গের সমাচার শুনিয়া কাঁদিয়া আত্মহারা হইয়াছে; সেদিন সমাজমন্দিরে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কাহার সাধ্য সে দৃশ্য দেখিয়াও মনকে কঠিন করিয়া রাখিতে পারে? সেদিন পাষাণ প্রাণও

গলিয়া গিয়াছিল, পাপাসক্ত চিত্ততে ইহলোকেই স্বর্গ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। ধন্য ধন্য ধন্য।" উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে ভাবের কি প্রবল জোয়ার উঠিয়াছিল সেই দিন বিজয়কৃষ্ণের উপাসনায় আর কাঙ্গালের গানে কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদে এই উৎসবের সামান্য উল্লেখ আছে; তাঁহার কথায়, "১২৯২ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় যখন ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপাসনা করিতেছিলেন, তখন ঐ প্রকার (পূর্ব বৎসর কলিকাতার মাঘোৎসবের ন্যায়) একটি আধ্যাত্মিক দৃশ্যও প্রকাশিত হয়।"

ঢাকার উৎসবের পর গোস্বামীমহাশয় কলিকাতা হইয়া যে দ্বারভাঙ্গা উৎসবে গমন করেন তাহা উদ্ধৃত তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদ হইতে প্রকাশ পাইবে। শরৎ-কামিনী দেবীর কথামত কলিকাতা আসিলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় বিজয়কৃষ্ণকে সপরিবারে সমাজ বাড়িতে স্থান দেন। কলিকাতা-তেও দীক্ষাকার্য্য চলিতে থাকে, তবে তাহা কামিনীমোহন বসু (শরৎ কামিনী বসু মহোদয়ার স্বামী) মহাশয়ের চোরবাগানের বাসায় হয়। যথার্থ ব্যাকুলাত্মারা এই সময়ে এতই আগ্রহী হইয়াছিলেন যে স্বয়ং শিবনাথের স্ত্রীও এই দীক্ষার প্রার্থী হন, কিন্তু শিবনাথের অনুমতি না পাওয়ায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই।

দ্বারভাঙ্গায় এইবার তাঁহার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বিজয়কৃষ্ণ গুরুদেবকে তাঁহার সাধনার অবস্থা জানাইলে তিনি হঠযোগ প্রদীপিকা এবং বেদান্ত ব্যাখ্যামূলক আর একখানা পুস্তক (বিচারসাগর) পাঠ করিতে বলেন। পুস্তক দুইখানি কোথায় মিলিবে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার গুরুদেব দ্বারভাঙ্গার কোন এক দোকানের নাম করেন এবং আশ্চর্যের বিষয় গুরুদেব কথিত দোকানে পুস্তকদ্বয়ের এক এক খণ্ড মাত্র পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকদ্বয় পাঠ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ দেখেন যে তাঁহার যে যে অবস্থা ঘটিতেছে পুস্তকদ্বয়ে সে সমস্ত বিশদভাবে বর্ণিত আছে। পূর্বে ঐ পুস্তকদ্বয় পড়িতে বলেন নাই কেন জিজ্ঞাসা করায় গুরুদেব বলেন যে আগে হইতে পড়িলে তিনি উহাদিগকে আপনার মনের আরোপ মনে করিতে পারিতেন। যোগসাধনার পথ যে মোটেই uncharted নয়, ইহার গতিপথের প্রতিটি স্তর যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের শাস্ত্রসমূহে বিবৃত, এই ঘটনাটির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তত্ত্বকৌমুদী অনুসারে দ্বারভাঙ্গা হইতে বিজয়কৃষ্ণ মতিহারী গিয়া তথায় উৎসবে সাহায্য করেন। মতিহারী যাইবার পথে মজঃফরপুরে উপাসনা ও বক্তৃতার দ্বারা ধর্মপ্রচার করেন এবং মতিহারী হইতে আসিবার সময় মুঙ্গের ও জামালপুরে উপাসনা ও উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম প্রচার করেন। মজঃফরপুরে আর্য্যধর্ম এবং জামালপুরে ধর্ম কি বিষয়ে বক্তৃতা

করেন। সহযাত্রী নবকুমার বাগচীমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে মজঃফরপুরে গমনের তারিখের উল্লেখ পাই এইরূপ, "অতঃপর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ১২৯২ বাংলা সালের ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘটক মহাশয়ের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা দ্বারভাঙ্গা * হইতে মজঃফরপুর গমন করি। ×× তাহার পর পাণ্ডুয়া স্টেশনের অনতিদূরে খৈপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ি গেলাম। ××পরদিন ভোরে গোস্বামীমহাশয় শৌচে যাইয়া তথা হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "পরমহংসজী আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, তুমি কোন্নগরে যাবে না কেন? তথায় কাজ আছে তোমাকে যাইতে হইবে।" তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদ মত কলিকাতা ফিরিয়া তিনি কলিকাতা উপাসনালয়ে উপাসনা করেন। তারপর কোন্নগর উৎসবে যোগ দান করেন হয়ত ফাল্গুনের দুই একদিন থাকিতে কারণ আমরা দেখিয়াছি ১২৯০ বাং সালের উৎসব ফাল্গুন মাসের মধ্যেই হইয়াছিল। এ বৎসরেও ঐ সময়ে হওয়াই স্বাভাবিক।

এই কোন্নগর উৎসব যে অত্যন্ত জমজমাট হইয়াছিল, তাহা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত ১২৯৩ বাং বৎসরের ১লা বৈশাখের এই সংবাদটুকু হইতে বুঝা যাইবে। —"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কোন্নগর অবস্থান কালে ক্রমাগত ১০।১২ দিন ধরিয়া সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি হইয়াছিল। বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু দুর্গা দাস বসু ও জয়কৃষ্ণের বাটীতে উপাসনা হইয়াছিল। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং আরও আরও বহু ব্রাহ্মবন্ধু তথায় গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় ও রামকুমারবাবু উপাসনার কার্য করেন। সুকবি গায়ক শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্নগর উৎসবে মধুর সঙ্গীতে উপাসকদিগের মন মুগ্ধ করেন।" এই কোন্নগর উৎসব বিজয়কৃষ্ণের জীবনেতিহাসে তথা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে একটি অতি প্রধান ঘটনা, এক প্রকার climax বা শীর্ষবিন্দু বিশেষ। ব্রাহ্মমহলে, বিশেষ ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষীয়গণের বিজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান বিক্ষোভ কোন্নগর উৎসবের পরেই চরম সীমায় উঠে।

এই কোন্নগর উৎসব সম্বন্ধে গোস্বামী শিষ্যা শরৎকামিনী বসু তাঁহার সৎপ্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন, "সে সময় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কোন্নগরে ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধে ঠাকুর সশিষ্য কোন্নগরে যাওয়া স্থির করিলেন। ××আমরা গাড়ী হইতে নৌকায় উঠিয়া দেখিলাম ওপারে

*অজপা সাধনগ্রন্থ রচয়িতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের দীক্ষা দ্বারভাঙ্গায় এই সময় হয়। নবকুমারবাবুর দীক্ষা ইহার কিছু পূর্ব্বে হইয়া থকিবে —লেখক

কয়েকটি গুরুভাই খোলকরতাল লইয়া মহা আনন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন। ×× নগেনবাবুর বাড়ি পৌছিলে তাঁহার স্ত্রী মাতঙ্গিনী দিদি ভাবে গদ্‌গদ হইয়া গলবস্ত্রে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া উঠিবার শক্তি হারাইলেন, তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে হইল।

সেদিন পূর্ণিমা। উপরে অনন্ত বিস্তৃত গগনে সুনীলিমার মাঝে রজতকান্তি শশধর, নিম্নে দৈবকান্তি ঠাকুর তাঁহার সর্বদেহে জ্যোৎস্নাধারা লুটিয়া পড়িতেছে, আর পার্শ্বে পুণ্যতোয়া গঙ্গা কুলকুল তালে নাচিয়া চলিয়াছে, সে কি আনন্দ। কয়েকটি স্ত্রীলোক পিতলের ঘড়া লইয়া গঙ্গায় আসিয়াছিলেন; তাঁহারা ঠাকুরের দেবকান্তি দেখিয়া ও মধুর উপদেশ শুনিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। ×× সেদিন রাত্রি বারোটা অবধি আমরা ঠাকুরের উপদেশ শুনিলাম। পরে গুরুভগ্নীরা সদালাপে রাত্রি কাটাইলাম। আনন্দে আহার নিদ্রা আমাদের দূর হইয়াছিল।

পরদিন ঠাকুর শৈবলিনীকে (কন্যা) দীক্ষা দান করিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোক শিবুবাবু (শিবচন্দ্র দেব মহাশয়) সশিষ্য ঠাকুরকে তাঁহার বাড়ি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ×× পরদিন গুরুভাই মন্মথবাবুর * ভগ্নীর বাড়ি নিমন্ত্রণ হইল। সেখানে কীর্ত্তন খুব জমাট বাঁধিল। কীর্ত্তন শেষে কয়েক ব্যক্তি সাধন পাইলেন। দলে দলে দীক্ষাপ্রার্থী লোক জুটিতে লাগিল। ঠাকুর আচণ্ডালে নাম বিলাইলেন। পরদিন ঠাকুর কলিকাতা ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে সকলে ব্রাহ্মসমাজ বাড়িতে গেলাম। সেদিন সেখানে থাকিয়া পরদিন চোরবাগানে ফিরিলাম।”

উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যায় যে বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমাজের অভ্যন্তরে গোস্বামী শিষ্যদিগের মধ্যে একটি বিশেষ হৃদ্যতাও হয়ত বা গড়িয়া উঠিতেছে। এই কোন্নগর উৎসবে একটি ঝিয়েরও দীক্ষা হয়। এই ঝি-এর দীক্ষা লইয়া অনেক বিতণ্ডা হয় সুতরাং সে সম্বন্ধে নবকুমারবাবু যাহা লিখিয়াছেন জানিয়া রাখা ভাল। নবকুমারবাবু বলেন, “নগেন্দ্রবাবুর বাসায় একটি ঝি ছিল, নাম যশোদার মা। তাহার চরিত্র দোষ হেতু আত্মীয়গণ তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দেয়। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী দয়া করিয়া তাহাকে আশ্রয় দেন। সে জাতিতে নাপিত ছিল। সে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া নগেন্দ্র-বাবুর স্ত্রীর শরণাপন্ন হয়। ‘আমার মত পাপীয়সীকে কি ইনি মন্ত্র দিবেন?’ ইহা তিনি গোস্বামীমহাশয়কে বলিলে, তিনি বলিলেন ‘হাঁ, উহারও হইবে, আপনি

* মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গোস্বামী শিষ্য এবং পরে গোস্বামী সমালোচক, “যোগসাধন” নামে প্রশ্নোত্তর গ্রন্থ তাঁহার দ্বারাই গ্রথিত হয়—লেখক।

তাহাকে লইয়া আসুন।' সেদিন আরও অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষের দীক্ষা হয়। তন্মধ্যে ইহার ভিতরে শক্তির এমন উজ্জ্বলভাবে বিকাশ হইয়া ছিল যে গোস্বামীমহাশয় তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, পাপী তাপীর প্রতিই গুরুজীর বিশেষ দয়া।"

কোন্নগর উৎসবের পর যে বিক্ষোভ এতদিন ধূমায়িত ছিল তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যে প্রতিবাদ গুঞ্জনে দমিত ছিল তাহা এখন সোচ্চার হইয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ণের বর্ত্তমান মতবাদ ও আচরণ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ দিগের নিকট প্রতিবাদ পত্র আসিতে লাগিল এবং কলিকাতার ব্রাহ্মরা এমনও ইঙ্গিত করিলেন যে তিনি যে এখনও ব্রাহ্মসমাজে আছেন সে কেবল পঞ্চাশটি টাকা পান বলিয়া। এই হীন ইঙ্গিত বিজয়কৃষ্ণের কানে যাওয়া মাত্র তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হিসাবে কার্য্যনির্বাহক সভার নিকট পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিলেন ১০ই চৈত্র। কার্য্য-নির্বাহক সভার সভ্যগণের সহিত কথোপকথনের পর এক প্রকার তাঁহাদেরই অনুরোধে তিনি সেই পত্র প্রত্যাহার করিতে সম্মত হন এবং সেই জন্যই তাঁহার পদত্যাগ সংবাদ তত্ত্বকৌমুদীর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই। ব্যাপারটি সাময়িকভাবে চাপা পড়িল, বিজয়কৃষ্ণ আপনার কাজ করিয়া চলিলেন।

এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য একবার কাশীপুর গমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গলার ক্ষত রোগে শয্যাগত এবং চিকিৎসার সুবিধার জন্য কাশীপুরে আনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অসুখের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। এই মিলনের সংবাদ রামকৃষ্ণ কথামৃতে নাই, তবে বাগচী মহাশয়ের "বিজয় কথামৃতে" আছে। শরৎকামিনী দেবীও এই মিলন কালে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার সদ্গুরু কথামৃতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ অধিকতর বিস্তৃত এবং তাঁহার গ্রন্থখানিও সহজ প্রাপ্য নহে বলিয়া আমরা তাঁহার বর্ণনার উদ্ধৃত করিলাম। তিনি এই সাক্ষাৎ কোন্নগরের উৎসবের পূর্বে না পরে স্মরণ করিতে পারেন নাই, তবে আমাদের নিকট ইহা কোন্নগরের উৎসবের অব্যবহিত পরে বলিয়াই অনুমিত হয়, কারণ ঘোষপাড়া হইতে ব্যস্ত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ কোন্নগরে আসিয়াছেন, কাজেই কোন্নগরের ব্যাপারেই তাঁহার কয়েক দিনের জন্য ব্যস্ত থাকা সম্ভব। পূর্বে-উদ্ধৃত তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদ হইতেও মনে হয় উৎসবকালে অন্ততঃ অধিকাংশ দিন কোন্নগরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কোন্নগর উৎসবের পর তাঁহার জীবনের একটি বড় বাঁকের সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ প্রথম পদত্যাগ পত্র পাঠাইবার পর তাঁহার পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়াও অধিক সম্ভব। সে যাহাই হোক, শরৎকামিনী দেবী

মিলনটির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাদের কলিকাতা বাস কালে ঠাকুর একদিন গুটি কয়েক শিষ্য সহ কাশীপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দেখিতে গেলেন। সংবাদ পাইয়া আমিও তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিলাম। গাড়ী দ্রুত চলিয়া ছিল, কিন্তু দর্শন-অধীর ঠাকুরের যেন বিলম্ব সহিতে ছিল না। × × বাগানবাড়ীতে গাড়ী থামিলে ডগমগ ঠাকুর পরমহংসদেবের সাক্ষাতের জন্য ছুটিয়া চলিলেন। × × পরমহংসদেব তখন কণ্ঠনালীর ক্ষতপীড়ায় শয্যাগত, কথা বলা নিষেধ। তাঁহার শিষ্যেরা তাই প্রথমে পরমহংসদেবের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ করাইতে ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব তাঁহার সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাঁহাকে ডাকাইয়া গৃহটি নির্জন করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহাদের নির্জন আলাপ হইবার পর ঠাকুর জানাইলেন যে তাঁহার পত্নী ও অপর একটি শিষ্যাও দর্শনপ্রার্থী। পরমহংসদেব অনুমতি করিলেন, ঠাকুর আমাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। আমরা নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে তিনি তাঁহার তুলতুলে পা দুখানি আমাদের মাথায় তুলিয়া দিলেন। সে কোমল স্পর্শে দেহ জুড়াইয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা আজ ধন্য হইলেন।" ঠাকুর আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনারা কতদিন হইল দীক্ষালাভ করিয়াছেন পরমহংসদেব জানিতে চাহেন এবং তিনি বলিতেছেন আপনাদের দেখিয়া তাঁহার খুব আনন্দ হইয়াছে। পরমহংসদেব ঠাকুরের শিষ্যদের সেবার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে জানিতে চাহিলে ঠাকুর বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, সে সব আয়োজন হইতেছে। × × আমরা মায়ের সহিত কক্ষান্তরে যাইয়া বসিলাম এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁহার নিকট পরমহংসদেবের কথা শুনিতে লাগিলাম। নীচে ভক্তেরা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। গান খুব জমাট বাঁধিল, মৃদঙ্গ ও করতাল যোগে প্রাণমাতান কীর্ত্তন চলিল। গাহিতে গাহিতে উন্মত্তভাবে গায়কেরা পরমহংসদেবের কক্ষের দিকে ছুটিলেন। এমন সময় ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, "আপনারা থামুন, এদিকে আসিবেন না। পরমহংসদেব কাতর, ভাবের উত্তেজনায় তাঁহার দেহত্যাগ ঘটতে পারে * বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ স্নানাহার করিলেন, সৎপ্রসঙ্গে বেলা কাটিয়া গেল, বিমল আনন্দ লইয়া গৃহে ফিরিলাম।"

১৬ই চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখি, "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু ব্রজলাল গাঙ্গুলী ও বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া প্রচারার্থ শান্তিপুর গমন করিয়াছেন। ইঁহারা তথা হইতে বাগেরহাট বরিশাল গমন করিবেন এইরূপ কথা আছে।" বাগেরহাটে গিয়া তিনি "মানুষের প্রাণ অনন্তকেই চায়" এই বিষয় এক

* পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট—লেখক

বক্তৃতা দেন, তাহার পর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কীর্তন ও আলোচনা করেন; ইহাতে স্থানীয় লোকের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের নিকট যোগ দীক্ষার জন্য ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলের মধ্যে যে কিরূপ আগ্রহ দেখা দেয় তাহার আভাস মিলে ব্রাহ্মপ্রচারক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বাগেরহাট হইতে বরিশাল ছুটিয়া আসেন। রাত্রির উপাসনার পর তিনি গোসাইজীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না।" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "কাল বরিশালে গিয়ে হবে।" বাগেরহাট হইতে বরিশাল চলিয়াছে ষ্টীমার। মনোরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন—"ষ্টীমারের সমস্ত লোক সারাটা দিন গোসাইজীর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তখন চক্ষু বুজিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, ষ্টীমারের একজন ফিরিঙ্গী (কাপ্তেন) অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'এ সাধু, কেত্তা দারু পিয়া?" গোসাইজী চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, 'তুম্‌হারা যিশুখ্রীষ্টভি এসি দারু পিতা থা।' বড় হাসির রগড় উঠিল, ফিরিঙ্গীটি বক্র দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।"

বরিশালে গিয়া বিজয়কৃষ্ণ দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন। প্রতিদিন দুই বেলা উপাসনা, আলোচনা ও কীর্তন হয়। ১২৯৩ বাং সনের ১লা বৈশাখ তারিখেও বিজয়কৃষ্ণ বরিশালেই ছিলেন, কারণ ঐ দিনের উৎসবে তিনি উপাসনা করেন এবং "ভারতে ধর্মান্দোলন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। বলিতে কি বিজয়কৃষ্ণের মাধ্যমে বাংলায় যেন এক নব ধর্মান্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বরিশালে পৌঁছিয়া সেই রাতেই মনোরঞ্জনবাবুর দীক্ষা হইল এবং তাহার পর অল্পদিন মধ্যেই বরিশালের স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, ভক্ত জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং রাখালবাবুর এক কন্যা, প্রসিদ্ধ উকীল নির্মল-চরিত্র স্বর্গীয় গোরাচাঁদ দাস, ভক্তবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণ গুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন।"

বরিশাল হইতে মাদারিপুর, মাদারিপুর হইতে মানিকদহে স্থানীয় জমিদার বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের * আহ্বানে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে তিনি যোগদান করেন।

* বিপিনবিহারী রায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০৪ শকে (১৮৮২ জুন) তত্ত্বকৌমুদী লিখে—"ফরিদপুরের অন্তর্গত মানিকদহের জমিদার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মন্দিরের ঋণ

বিপিনবাবুও এই সময়েই দীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়, কারণ আমরা পরে দেখিব বরিশালের ন্যায় মানিকদহের কার্যকলাপেও কার্যনির্বাহক সভা অসন্তুষ্ট। মানিকদহের পর, বিজয়কৃষ্ণ কাকিনার জমিদার মহিমারঞ্জন রায় মহাশয়ের সাগ্রহ আহ্বানে তথাকার মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে গমন করেন। কথিত আছে এই উৎসবে বিজয়কৃষ্ণকে আনিবার জন্য জমিদার মহাশয়ের লোক কলিকাতা হইতে তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার সমুদয় যাত্রাপথ তল্লাস করিয়া পরিশেষে মানিকদহে তাঁহাকে পান। বঙ্ক কর মহাশয় লিখিয়াছেন, কাকিনার উৎসব জমাটভাবে সম্পন্ন হয়। ১৬ই আষাঢ় ১৮০৮ শকের তত্ত্বকৌমুদীতে কাকিনার উৎসব সম্বন্ধে সংবাদ এইরূপ, "১৯শে বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণে বৈঠকখানায় কাঙ্গাল ফিকিরের সংগীত, তৎপর উপাসনা। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ২০শে বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় পুরাতন সমাজগৃহে উপাসনা, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। কাঙ্গাল ফিকিরের গান। অপরাহ্ণ ২টার সময় ঐ স্থানে ধর্মালোচনা, পাঠ ও ব্যাখ্যা। ঐ সকল কার্য্য বিজয়বাবু সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কাছারি প্রাঙ্গণ হইতে নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নূতন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা। উপাসনা ও প্রতিষ্ঠা কার্য গোস্বামীমহাশয় করেন।" "২৩শে বৈশাখ অবধি এখানে মহাসমারোহে উৎসব চলে। কাকিনার উৎসব সম্বন্ধে কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদে এই সামান্য উল্লেখ আছে, "১২৯৩ সাল (বাং) বৈশাখ মাসে রঙ্গপুর কাকিনার ভূম্যধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায় যে সময় তত্রত্য ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যে দিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় প্রাতঃকালে বেদীর কার্য্য নির্বাহ করেন, সেই দিনও ঐ প্রকার (কলিকাতার ১২৯১ সালের মাঘোৎসবের ন্যায়) আর একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।" বিজয়কৃষ্ণ শিষ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও লেখক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা অসুস্থাবস্থায় শক্তি সঞ্চারিতের ন্যায় আশ্চর্য এক বক্তৃতায় সমবেত সকলকে বিমুগ্ধ করেন। স্বয়ং রাজা মহিমারঞ্জন, রাজপণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তাঁহার পুত্র কোকিলেশ্বর (পরে শাস্ত্রী ও বিখ্যাত অধ্যাপক)

পরিশোধার্থে ২০০্ টাকা এবং প্রচার বিভাগে মাসিক ৫্ টাকা প্রদান করিয়াছেন। বিপিনবাবু একজন শিক্ষিত জমিদার। তিনি প্রজাদিগের উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন এবং একটি ব্রাহ্মণসমাজও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। × × দরিদ্র ব্রাহ্মসমাজকে অর্থ দান করিয়া বিপিনবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।" —লেখক

এবং আরও অনেকে বিজয়কৃষ্ণের অপূর্ব ভাবসমৃদ্ধ জীবনচর্যায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। কাকিনা রাজস্টেটের কর্মচারী সাধু-প্রকৃতি রাধিকানাথ রায় মহাশয়ও ঐ সময় দীক্ষা পান। এই ভ্রমণটির সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে মনোরঞ্জনবাবুর কয়েকটি লাইনে। তিনি লিখিয়াছেন, "দীক্ষা গ্রহণের পরে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে বরিশাল হইতে মাদারিপুর, মানিকদহ ও কাকিনায় গিয়াছিলাম। কিরূপ প্রেমের তরঙ্গ ছড়াইয়া, বিষয়াসক্ত নরনারীগণের চিত্তকে ধর্মের দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, তিনি এই সকল দেশকে ভগবৎ প্রেমে ভাসাইয়া ছিলেন, আজিও মানসক্ষেত্রে সেই প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া ডুবিয়া হৃদয় কিরূপ আনন্দে অভিভূত হয়, সে সকল পুণ্য কথা বলিতে এখানে আমাকে নিরস্ত হইতে হইল। যদি ভাগ্যে থাকে আর তাঁহার কৃপা হয় তবে ভবিষ্যতে সে সকল যথাসাধ্য লিখিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা রহিল।"

কলিকাতার ব্রাহ্মমহলে বিক্ষোভ দেখিয়া আসিয়া বিজয়কৃষ্ণ কোথায় তাঁহার মতামত ও আচরণকে সামান্য অন্যথা করিবেন, তা না, তিনি যেথায় যাইতেছেন সেইখানেই তাঁহার নূতন লব্ধ সত্যের দুর্নিবার আকর্ষণে সকলকে আকৃষ্ট ও উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ যে এই সকল ধর্ম-প্লাবনের এবং ভূমিক্ষয়ের সংবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত কার্য-নির্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্যবিবরণীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়— "তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের সময় এখানে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া বরিশাল প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সেখানে এবং মানিকদহ প্রভৃতি স্থানে যে ভাবে তিনি প্রচার করেন, তাহাতে কার্য্য নির্বাহক সভা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিশেষ করিয়া বড়বেলুনের পুণ্যদা সরকার ও গগন হোম মহাশয়ের লিখিত পত্র দুইখানি বিষয়ে তাঁহার সহিত সত্বর বিশেষভাবে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য অনুরোধ করেন।' ১০ই মে অর্থাৎ বৈশাখের ২৫।২৬ তারিখে (১২৯৩ বাং) তিনি তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া "ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি নিবেদন" লিখেন, এবং নানা আলাপ আলোচনার পর ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৭ই মে তারিখে দ্বিতীয় পদত্যাগ পত্র স্বাক্ষর করিয়া কার্যকরী কমিটীর নিকট প্রেরণ করেন। ২০শে মে ৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কার্য্য নির্বাহক সভার দ্বারা "৭॥ হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত অনেক চিন্তা ও বিতর্কের পর অধিকাংশের মতে" তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা স্থিরীকৃত হয়। ঐ তারিখের পূর্বেই বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়েছেন কারণ ঐ তারিখের অধিবেশনের বিবরণ দিতে গিয়া তত্ত্বকৌমুদী লিখিতেছে, "× × × গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র

গৃহীত হইবে কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইল। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে যদি আরও কিঞ্চিত কাল বিলম্ব করা হয় এবং তাঁহাকে প্রথমোক্ত প্রস্তাবটি জানাইয়া তাঁহার নিষিদ্ধ মতও কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদপূর্বক বিলম্ব করা কর্ত্তব্য।" বঙ্ক কর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে এইরূপ পাই, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের পদ ত্যাগ করিবার পর তিনি ঢাকাতে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে মনোনীত হন এবং তথাকার প্রচারক আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা ও আলোচনা সহকারে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।" প্রশ্ন হইতেছে—তিনি সরাসরি ঢাকায় চলিয়া আসেন, না অন্য কোথাও প্রথমে যান। বঙ্ক কর মহাশয়ের পুস্তক পাঠে মনে হয় তিনি মানিকদহ হইয়া ঢাকায় আসেন এবং এই বারেই মানিকদহে যোগ সাধন 'পুস্তক অনুলিখিত হয় ও ছাপানর ব্যবস্থা' হয়। সে যাহাই হোক, তিনি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ এর অর্থাৎ ৭।৮ জুন ১৮৮৬ মধ্যে ঢাকায় পৌছিয়া থাকিবেন কারণ বক্তৃতা ও উপদেশে মুদ্রিত ঢাকায় প্রদত্ত প্রথম উপদেশের তারিখ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ এবং ঐ তারিখেই তিনি "সাধারণের নিকট নিবেদন" সংজ্ঞায় তাঁহার সেই সময়ের ধর্মমতের সংক্ষেপে এক বিবৃতি স্বাক্ষরিত করিয়া প্রচার করেন। আমরা বিজয়ায়নের প্রথম খণ্ডে বিজয়কৃষ্ণের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ পর্যন্ত লিখিয়াই শেষ করিলাম। সুতরাং পরবর্তী ঘটনা আমাদের বর্তমান এলাকার বাহিরে। তবে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিজয়কৃষ্ণের বিদায় গ্রহণ কি বিজয় জীবনে, কি ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে, কি বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে নিশ্চয় একটি অতি বড় ঘটনা। আমরা এই ব্যাপারটির বিস্তৃত আলোচনা করিব পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে এবং তাহার জন্য আমাদিগকে কালের সীমানা সামান্য অতিক্রম করিতে হইবে।

ত্রিশ

কোন্নগর উৎসবের সমকালে যে দুইখানি পত্র ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহক কমিটির হস্তগত হয় এবং মূলতঃ যাহাদের ভিত্তি করিয়াই পরের ঘটনাগুলি সংঘটিত হয় সেই পত্র দুইখানি বিস্তারিত তুলিয়া দেওয়া গেল।

১। পুণ্যাদাবাবুর পত্র

জগদীশ্বর সহায়, ১৬ই মার্চ, ১৮৮৬
কালনা

মহাশয়,

বলিতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে। শুনিয়াই প্রাণে কেমন একরূপ ভাব উদয়

হইতেছে। সাধারণ সমাজরূপ কল্পবৃক্ষে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ভগবানের শক্তিতে ঈশ্বরের মহান অনন্তভাব, প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের উদ্ধারের মুক্তিফল লাভ হইবে। এখনও অনেক প্রচারক ও সমাজ হিতৈষীর জীবনে তাহার আভাস দেখিয়া আনন্দিত হই। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে প্রচারকদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা প্রচারক তাঁহাদের জীবন ও কার্য্য কি সাধারণ লোকের আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত নয়? আর যদি কোন কারণে কোন মহৎ লোক নিজের বিশ্বাস ভক্তিতে এমন স্থানে গিয়া পৌছান, যে স্থানের তত্ত্ব সাধারণ লোকের বিশ্বাসের অতীত, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রেণীতে না রাখিলে ক্ষতি কি? তিনি কেন যোগী হইয়া যোগসাধনার দ্বারা নিজের আত্মার উৎকর্ষ সাধন করুন না। তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রচারক পদে বরণ করিয়া রাখিবেন কেন?

আমার বিশ্বস্ত এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে ভক্তিভাজন গোস্বামীমহাশয় ও ঐ রূপ নূতন ভাবা ব্যবহার করিতেছেন এবং বন্ধুকে তিনি নিজে বলিয়াছেন যে মানুষ যখন মধ্যবিন্দুতে উপস্থিত হয় তখন সে সকল দিক সমান দেখে। তাঁহার পায় পড়িয়া ভক্তবৃন্দ কতকক্ষণ শির লুণ্ঠন করিতেছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত লইয়া অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মিশিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। এসব কি? ইহার কি কোন তত্ত্ব লওয়া হইতেছে না? গোস্বামীমহাশয় আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন সত্য। তাই বলিয়া তিনি সাধারণ প্রচারক পদে না থাকিয়া যোগী হইয়া যদি জীবন যাপন করেন, তবে কি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ এককালে অচল হইবে। তাই যদি না হয়? তবে তাঁহাকে অবসর দেওয়া হইতেছে না কেন?

× × × × ×

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি ইহাদিগকে ইহাদের ত্রুটি দেখাইয়া দেন, সমাজের নেতৃত্ব না দেন, তবে কি ঈশ্বরের ধর্ম আর প্রচার হইবে না? অথবা প্রচারকদের মুখের পানে তাকাইয়া ধর্মের ভিত্তিভূমিকে আলোড়িত করিতে হইবে? উৎসবের পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে কিন্তু আলোচনা হইল কিনা তাহা আমাদের ন্যায় হতভাগ্যদের জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা অনেক আশা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। দোষ গুণ বিচার যদি আজ হইতে কোন সমাজে উঠিয়া যায় তবে যে সে সমাজ অল্প কাল মধ্যেই নানা আবর্জনায় পূর্ণ হইবে ইহা স্বতঃই মনমধ্যে উদিত হয়। আমরা বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্মে

নিতান্ত হীন কিন্তু আশা করি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য উপাসকমণ্ডলী লইয়া এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হয়। তাহার ফল তত্ত্বকৌমুদীতে সাঙ্কেতিকভাবে বাহির হয়। একদিকে হঠযোগী সম্প্রদায় অন্যদিকে নববিধানীগণ এই কথা বলিতেছেন যে ওরূপ ব্রাহ্মধর্মে জীবের উদ্ধার হইবে না। আমরা কি ইহার মূল আছে বলিয়া মনে করিব? না কাতরপ্রাণে পরমেশ্বরকে ডাকিলে সবাই মুক্তি পাইবে এই মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া অচল থাকিব? ক্রমে ক্রমে নানা ভয় আমাদিগকে ত্রস্ত (ত্রাসিত?) করিতেছে, দয়াময় জানেন যে ইহার পরিণাম কি হইবে। বড়বেলুনে ইহার উত্তর দিলে কৃতার্থ হইব। Sd পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার।

২। গগনবাবুর পত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়, যাঁহারা এক সময় ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহা কোনরূপে কলঙ্কিত বা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ না হয় তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের তাৎকালিক নেতাদিগের সহিত ঘোরতর বাদ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের কাহাকেও তৎপ্রতি উদাসীন বা অনিষ্ট-জনক আচরণে প্রশ্রয় দিতে দেখিয়া বড়ই মর্মাহত হইতেছি; তাই আজ আপনাকে এই চিঠিখানি কার্য্যনির্বাহক সভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া বাধিত করিবেন।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয়ের সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথাই বলিতেছেন। কেহ বা তিনি "কানে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিয়াছেন" বলিতেছেন, কেহ বা তাঁহাকে গুরু-পূজার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ইহার কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বক্তব্য আছে।

আমি যখন বিগত পূজার বন্ধোপলক্ষে* ঢাকা গিয়াছিলাম, তখন একদিন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন তথায় যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা একদিকে প্রাণানন্দকর, অন্যদিকে আশঙ্কাজনক। তাঁহার গৃহে সর্বদা ভগবানের নাম ও গুণানুকীর্তন হইতে থাকে, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ভেদ নাই, সকলেই আসিয়া

তাহাতে যোগ দেয়; বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলা বিষয়ক গান হইতেছে, শাক্তের শক্তি বিষয়ক গীত-গান হইতেছে, ব্রহ্ম মহিমাও কীর্ত্তন হইতেছে। তিনিও সেই সমুদয়ের মধ্যে অচল অটল, সমুদায়ের মধ্য হইতেই তিনি তাঁহার গ্রহণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় বাছিয়া লইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহের আঙ্গিনায়, প্রচারাশ্রমে বসিয়া এইরূপ পৌত্তলিকতাপূর্ণ, ব্রাহ্মসমাজের মতের বিরোধী কোন সঙ্গীত সংকীর্ত্তন, বা আলোচনাদি হওয়া উচিত কিনা? তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীডের বিরোধী কাজ করা হয় কিনা? তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত জন্মে কিনা? আমি ঢাকায় অনেক ব্রাহ্মযুবকের সঙ্গে এসম্বন্ধে আলাপাদি করিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, শুধু বিশ্বাস করেন না, প্রমাণও পাঠাইয়াছেন, যে তাঁহার এইরূপ আচরণ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতেছে। যুবক সম্প্রদায় আর ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইতেছে না, তাহারা নাকি বলে, "এই তা তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের নেতা গোস্বামীমহাশয়ের গৃহে রাতদিন পৌত্তলিক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানাদি হইতেছে; তোমরা কৃষ্ণলীলা বিষয় অশ্লীল বল, তাহার ছবি পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে টাঙ্গান রহিয়াছে।" বাস্তবিক তাঁহার গৃহে এমন কতকগুলি ছবি আছে যাহারা সুরুচি বিরোধী-অষ্ট সখী যোড়া, নরনারী-কুঞ্জর ইত্যাদি। অবশ্য তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে কোন সঙ্গীত করিতে বা যে কোন গ্রন্থ পড়িতে পারেন, যার তার নিকট যাইতে পারেন, কিন্তু তদ্দারা যদি ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, তবে প্রচারক থাকিয়া তাঁহার তদ্রূপ আচরণ উচিত কিনা? তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদিগের "কৃষ্ণ ধর্ম" প্রচারের প্রকারান্তরে সাহায্য হইতেছে কিনা? বিশ্বস্ত লোকের মুখে এরূপও শুনিয়াছি, যে সকল কৃতবিদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক একসময়ে জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া-ছিলেন, এরূপ আশা করা গিয়াছিল, যাঁহারা ক্রমে ক্রমে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, তাঁহারা তাঁহার এরূপ compromising (মিল-মিশের ভাব) দেখিয়া হিন্দুসমাজের দিকে গড়াইতেছেন। কেবল তাহাই নহে বাবু—চট্টোপাধ্যায় (নবকান্ত?) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি তাঁহাদের সম্মুখে বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক গোস্বামীমহাশয়ের জনৈক সহচর সেই প্রচারাশ্রমে বসিয়া তাঁহার সমক্ষে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী কত মত প্রচার করেন ও ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে কতকথা উপস্থিত লোকদিগকে উপদেশছলে বলেন, অথচ গোস্বামীমহাশয় তখন সম্পূর্ণ নির্বাক থাকেন, ব্রাহ্মসমাজের মত সমর্থনার্থ একটি কথাও বলেন না। শুনিয়াছি এই কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নাকি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের একজন সাধক-

ভক্ত এবং ঢাকাস্থ হরিসভায় ইনি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যতদূর সম্ভব কঠোর ভাষায় নিন্দা করিতে ছাড়েন না। ইহাকে একদিন ভাবে মাতিয়া কোন ব্রাহ্মের মাথায় পর্য্যন্ত কর ঘুরাইয়া আশীর্বাদ করিতেও দেখিয়াছি। তারপর কানে মন্ত্র দেওয়ার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে কানে মন্ত্র দেওয়া হয় কিনা জানি না কিন্তু ইহা জানি তিনি কাহাকে কাহাকেও এইরূপ "করনে" সাধনভজনের প্রণালীতে দীক্ষিত করেন। এমন কি কেহ কেহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ঢাকা যাইয়া দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা ব্রাহ্মসাধারণের নিকট অপ্রকাশ রাখা হয়। ব্রাহ্মধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নহে, তাহার মত উদার, যাহা ভাল বোধ করিবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যদি তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের এই সাধন-প্রণালী আধ্যাত্মিকতা লাভের নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্যাবলম্বনীয় তবে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত অপরাপর সাধনভজনপ্রণালীর ন্যায়, তাহা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রচার করেন না কেন? ব্রাহ্মগণ অপরাপর বিষয়ের ন্যায় ইহাও বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। যাহা গোপনীয়, সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য, তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশ্বাস বা প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ যাহারা এরূপ সাধনভজন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ক্রমে ক্রমে কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা উপাসনা ও উপদেশকালে একরূপ বলেন, কাজের সময় অন্যরূপ করেন। আমরা উহাদের কোনটি গ্রহণ করিব? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহারা ব্রাহ্ম-সমাজকে অস্বাভাবিকতায় ও সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিতেছেন,—এরূপ গুহ্য রহস্য (mysticism) প্রবর্ত্তিত করিয়া উদার বিশ্বজনীন ধর্মকে সাধারণের অনবলম্বনীয় করিয়া তুলিতেছেন, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহার আভাস ও লক্ষণ এখনই কতকটা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অজ্ঞাতসারে অপরিস্ফুট রূপে নববিধান সমাজের ন্যায় সাধু মহাত্মাগণ যেন ঈশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছেন। কারণ "গোস্বামী-মহাশয়ের চরণ মাথায় করিয়া রাখিলেই আমার উপকার হয়" পর্য্যন্ত জনৈক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মকে বলিতে শুনা গিয়াছে। কেবল শুনা গিয়াছে তা নয়, এই বিজয়বাবুর চরণ ধূলি নিয়া কত কাণ্ডই হইতেছে। এই ত সেদিন কোন্নগরের উৎসব উপলক্ষে— বাবুর (নগেন্দ্র ?) বাসগৃহে তাঁহার স্ত্রী গোস্বামীমহাশয়ের চরণধূলি নিয়া একটি পাগলা স্ত্রীলোকের বুকে মাথায় মাখিতে লাগিলেন,—বোধ হয়, যদি ইহাতে সুস্থ হয় বা তাহার ধর্মজ্ঞান বাড়ে এই বিশ্বাসে। ইহা ভিন্ন তাঁহার এরূপ

আচরণের আর কি অর্থ বুঝিব? কেবল যে কোন্নগরেই গোস্বামীমহাশয়ের চরণধূলি লইয়া এরূপ কাণ্ড হইয়াছে, এমন নহে। ঢাকাতে প্রায় প্রতিদিন দুবেলা এরূপ ব্যাপার হইয়া থাকে। কত কৃতবিদ্য ব্রাহ্মকে পর্য্যন্ত তাঁহার "চরণ তলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দেখিয়াছি, অব্রাহ্মের বা অশিক্ষিতের ত কথাই নাই। তাঁহার চৈতন্যাবস্থায় তিনি যে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য এরূপ চরণধূলি কাহাকেও দেন, আমার এরূপ মনে হয় না। কাহারও এরূপ মনে করা উচিত হইবে না। ব্রাহ্মদিগের অনেকেই হয়ত জানেন তিনি অনেক সময়েই ধ্যান বা নামগানে মুহ্যমান থাকেন; তখন তাঁহার "শিষ্যবর্গ," চরণ এবং চরণধূলি নিয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকেন। "শিষ্যবর্গ" এই জন্য বলিলাম, যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট নব প্রবর্ত্তিত গুহ্য সাধনপ্রণালীতে দীক্ষিত হইয়াছেন। বিজয়বাবু অবশ্য চেতনা পাইয়া তাঁহার পা গুটাইয়া লয়েন এবং সময়ে সময়ে সঙ্কোচ প্রকাশ ও সকল সময়ে তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার করেন। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহাদের এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে তেমন তীব্র প্রতিবাদ করিতে কেহ কখনও শুনে নাই। আমরা জানি, তাঁহার ভিতরে এমন তেজ আছে, যদি তিনি একবার প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে কেহ এরূপ করিতে সাহসী হইত না। তিনি স্বয়ং যে রূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির পদ বক্ষে ধারণ করিয়া বা তাঁহাদের চরণধূলি লইয়া নিজেকে কৃতার্থ ও উপকৃত মনে করেন, (তাঁহারা বোধ হয় কখনও তাঁহার চরণধূলি নেন নি) এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি বোধ করেন না, তদ্রূপ অন্যে যে তাঁহার চরণ বা চরণধূলি লইয়া এরূপ করে, তাহাতে তাঁহাদের উপকার বই অপকার হয় না মনে করেন বলিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের মূলে যে অজ্ঞাতসারে কুঠারাঘাত করা হইতেছে মনে করেন না বলিয়াই ইহার বিরুদ্ধে তেমন কঠোর ভাব অবলম্বন করিতেছেন না। কিন্তু এই বিজয়বাবুকেই আমরা এক সময়ে মুঙ্গেরে পা পূজার আন্দোলনে এবং কুচবিহার বিবাহের পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজগৃহে এবংবিধ কত বিষয়ে কঠোরতম ভাষায় প্রতিবাদ করিতে দেখিয়াছি। × × × ×

আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত না হয় এখন হইতে তাহার উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত এই ঘটনাগুলি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আশা করি আপনারা এ সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে আমার এই চিঠিখানি আমূল তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিতে দিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা ১২৯২, ১০ ই চৈত্র } অনুগত (Sd) শ্রীগগনচন্দ্র হোম

উপরে উদ্ধৃত পত্র দুইখানিতে বিবৃত অভিযোগের উত্তর প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের পরে বলিতে হইবে, কারণ এই দুই পত্রকে ভিত্তি করিয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ ফালাও করিয়া বিজয়কৃষ্ণের বিচার করিবে দেখিতে পাইব। সেই সকল উত্তর প্রত্যুত্তরের অবতারণা করিবার পূর্বেই অতি সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুণ্যদা সরকার মহাশয়ের চিঠিখানি ধরা যাক। বিজয়কৃষ্ণের চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ধর্মরাজ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় এবং অত্যুগ্র সাধনার ফলে তিনি যখন ঈপ্সিত উচ্চতায় গিয়া পৌছাইলেন তখন অভিযোগ আসিল তুমি বড় উঁচুতে উঠিয়াছ, তোমাতে আমাদের প্রয়োজনেরও ইতি হইয়াছে। তুমি চারিদিক সমান দেখিতেছ, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আর তোমার লক্ষ্যে আসিতেছে না, তোমার ঐ অসাধারণ অভিজ্ঞতা লইয়া তুমি সাধারণ মানুষকে কোন পথ দেখাইবে? পুণ্যদা সরকার মহাশয়ের পত্রে প্রধানতঃ এই প্রকার অভিযোগই ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "যদি কোন কারণে কোন মহৎ লোক নিজের বিশ্বাস ভক্তিতে এমন স্থানে গিয়া পৌছান যে স্থানের তত্ত্ব সাধারণ লোকের বিশ্বাসের অতীত—তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রেণীতে না রাখিলেই ক্ষতি কি? × × × তিনি নিজে বলিয়াছেন যে মানুষ যখন মধ্যবিন্দুতে উপস্থিত হয় তখন সে সকল দিক সমান দেখে। × × গোস্বামীমহাশয় আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন সত্য। তাই বলিয়া তিনি সাধারণ প্রচারক পদে না থাকিয়া যোগী হইয়া যদি জীবন যাপন করেন তবে কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এককালে অচল হইবে?" সুতরাং তিনি যে অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা স্বীকৃত; জিজ্ঞাস্য যদি ঐ স্থান ধর্মার্থীদের কাম্য হয় তবে তাঁহার প্রদর্শিত পথ গ্রহণযোগ্য নয় কেন? এ যেন, "গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়"—বিজয়কৃষ্ণের অসাধারণত্বই তীব্র সমালোচনার বিষয় হইল। এই পত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে তাঁহাকে প্রচারক পদ হইতে অপসৃত করিতে সমাজের কোন ক্ষতি যদি না হয় তবেই তাঁহাকে অবসৃত করার প্রস্তাব হইয়াছে। মতেরই যদি মৌলিক বিরোধ হয় তবে এই ফলাফল গণনা কেন?

গগন হোমমহাশয়ের আবেদন এ নয় যে বিনা বিচারে গোস্বামীমহাশয়ের কার্যকলাপ ও মতবাদকে সরাসরিভাবে ব্রাহ্মধর্ম বিগর্হিত বলিয়া স্থিরীকৃত করা। বিচারে যদি সাব্যস্ত হয় যে বিজয়কৃষ্ণ প্রবর্তিত সাধনপ্রণালী আধ্যাত্মিকতা লাভের নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্যাবলম্বনীয় তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। তাঁহার ভাষায়, "ব্রাহ্মধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ

সীমায় বদ্ধ নহে, তাহার মত উদার, যাহা ভাল বোধ করিবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যদি তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদিগের এই সাধনপ্রণালী আধ্যাত্মিকতা লাভের একান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্যাবলম্বনীয় তবে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত অপরাপর সাধনভজনপ্রণালীর ন্যায় তাহা প্রকাশ্যভাবে ও ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রচার করেন না কেন? ব্রাহ্মগণ অপরাপর বিষয়ের ন্যায় ইহাও বিচার-পূর্বক গ্রহণ করিবেন।" বিজয়কৃষ্ণের মতামত ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-সাধারণ বিশেষ কিছু জানিত না তাহা ঠিক নহে, কারণ না জানিলে এই সকল অভিযোগেরও অর্থ হয় না এবং তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনেরও কারণ থাকে না। তাহা ছাড়া বন্ধুভাবে বিশদরূপে কেহ জানিতে চাহিলে বিজয়কৃষ্ণ সে কৌতূহল মিটাইতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তবে ব্যক্তিগত ধর্মানুশীলন, আত্মপ্রস্তুতি একান্তেই করিতে হয় অন্যকে বঞ্চিত করিবার জন্য নয় – অধিক ফল লাভের জন্য। হোম মহাশয়ের "যাহা গোপনীয়, সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশ্বাস বা প্রবৃত্তি হয় না, –" এই উক্তির যুক্তিকতা অল্প। অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ের ন্যায় ধর্মও যে অনন্তপার সুতরাং তাহার স্তরভেদ আছে। সকলেই সকল বিষয়ে একস্তরে উঠিতে চায় না— কাহারও প্রধান কামনা অর্থলাভ, কাহারও বা জ্ঞানলাভ আবার কাহারও বা ধর্মলাভ। অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ প্রভৃতি যাঁহাদের প্রধান কামনা তাঁহারা অল্প ধর্মে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, ধর্মের শেষ দেখিবার জন্য জীবন শেষ করিতে কৃত-সংকল্প না হইতে পারেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ আসিয়াই পড়ে,— এবং অধিকারী ভেদ না করিয়া সকলের জন্য ধর্মের একই পাঠ রচনা করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়! শ্রদ্ধাবান, প্রকৃত জিজ্ঞাসু কোন ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণের নিকট হইতে ধর্মলাভের পথের ইঙ্গিত যদি না পাইয়া থাকেন তবেই হোমমহাশয়ের অভিযোগের ন্যায্যতা থাকিতে পারে। অভিযোগ যে সত্য নয় তাহার প্রমাণ তাঁহার বহু ব্রাহ্ম শিষ্য। সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়াই কোন কিছু গর্হিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানের কোন আচার্যদেব যখন তাঁহার সন্ধানী ছাত্রদের হাটের হট্টগোল হইতে দূরে কোন নিভৃত নিরালায় বসিয়া শিক্ষা দেন তখন কোন প্রশ্ন উঠে না, আর ধর্ম শিক্ষার বেলাতেই এই কথা উঠে কেন তাহা বুঝা যায় না। সকল জ্ঞানের ন্যায় ধর্মেও সকলের সমান অধিকার স্বীকার করি, তবে প্রবণতা ও বোধ-ক্ষমতা সকলের একরূপ নহে সুতরাং ধর্মের সকল তত্ত্ব সকলের গ্রাহ্য নহে, সর্বত্র প্রকাশ্যও নহে। গোপনীয়তা দোষ যদি মায়াত্মক না হইয়া থাকে— তবে বাকী প্রশ্ন থাকে বিজয়কৃষ্ণের মতামত বা কার্যপ্রণালী প্রকৃত ধর্মলাভের

পক্ষে সহায়ক অথবা পরিপন্থী। যে কোন বিচার ব্যবস্থায় সমর্থী ব্যক্তিদ্বারা এই প্রশ্নের একটি সুষ্ঠু মীমাংসার প্রয়োজন ছিল। আমরা "সমর্থী" বিশেষণটি বুঝিয়া সুঝিয়া ব্যবহার করিলাম। যে কোন ব্যাপারে বিচার করিতে গেলে তৎতৎবিষয়ে বিচারকদিগের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আইনগত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যেমন আইনের বিশেষজ্ঞগণই করিতে পারেন, সেইরূপ ধর্মের জটিল মীমাংসা ধর্মসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণই করিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বিচারে বিচারক সভ্য সমর্থী ছিল কিনা তাহা পরে প্রকাশ পাইবে, তবে বিচারে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির যথোচিত আলোচনাই হয় নাই এবং সেই অনুযোগ যে সেই সময়কার বহু ব্রাহ্মই করিয়া ছিলেন তাহা আমরা পরে দেখিব।

একত্রিংশ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের তত্ত্বকৌমুদীতে বিজয়কৃষ্ণের পদত্যাগের বিবরণ এইরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়,—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় উক্ত সমাজের প্রচারক পদ ত্যাগ করিয়াছেন। × × তাঁহার মত ও কার্য্যপ্রণালী গত কয়েক মাস হইতে কার্য্যনির্বাহক সভার বিচারাধীন ছিল। ইহার সবিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। গোস্বামীমহাশয়ের প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার ধর্মভাব, ব্যাকুলতা, প্রেম ও বিশ্বাস এ সকল আমাদের অনেকের পক্ষে আদর্শস্থল। কিন্তু অপরপক্ষে তাঁহার অবলম্বিত কতকগুলি মত ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অনেকের মনে এই প্রবল আশঙ্কা জাগিয়াছে যে তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুমহৎ ব্যাঘাত ঘটিবে। এই প্রবল আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্যনির্বাহক সভার সভ্যগণ অতীব দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ নিশ্চয়ই অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। অতএব ১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদী অতি সত্বর প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে এই বিষয়েই প্রধানতঃ থাকিবে। যতদিন সমস্ত বিবরণ তাঁহাদের হস্তগত না হয়, ততদিন ব্রাহ্মবন্ধুগণ নিজ নিজ চিত্তকে বিচলিত হইতে দিবেন না।"

বিজয়কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে চাহিলেও তাঁহার পদত্যাগ পত্র সরাসরি গ্রহণ না করিয়া দীর্ঘায়ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অন্ততঃ অন্যতম কারণ উপরি উদ্ধৃত অংশে প্রকাশ পাইতেছে। হঠাৎ 'বিজয়কৃষ্ণ পদত্যাগ করিয়াছেন' এই সংবাদে ব্রাহ্মসাধারণের মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হইবে সুতরাং

তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট পদত্যাগের একটা গ্রহণযোগ্য কারণ উপস্থিত করার প্রয়োজন, যাহাতে কর্মকর্তাগণ দোষাবহ না হন এবং সেই জন্যই অসাধারণ হইলেও এই বিচারকাণ্ডের প্রয়োজন। তত্ত্বকৌমুদীর পরবর্তী সংখ্যায় এই বিচারকাণ্ডের বিবরণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্রাহ্মসাধারণকে আশ্বস্ত করা হইল, আষাঢ় সংখ্যায় এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হইয়াছিল।

এই সংখ্যাতেই বিজয়কৃষ্ণের 'ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন' প্রকাশিত হয়। কালানুক্রমে উহাই প্রথম বলিয়া অগ্রে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম। ইহাতে দল নাই। এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগের সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ, খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সকল সম্প্রদায় আমার। যেখানে যতটুকু সত্য সেইটুকু আমার ব্রাহ্মধর্ম। এখন হইতে এই সার সত্য, সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব। আমার মতের আভাস নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দ শান্তি মঙ্গলস্বরূপ, অজর অমর নিত্য একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্রস্বরূপ। তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা, কোন সৃষ্টবস্তুর মত নহেন; তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই, তিনজনও নাই, অথবা অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে?

পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটি নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ বলেন, লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে। এ কথাও ঠিক নহে কারণ হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর এবং পাপ-হরণকর্তা পরমেশ্বর এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি

ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিয়া গদ্‌গদভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে, তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে এ লোকটি বানর প্রভৃতি পশুগুলাকে ডাকিয়া কাঁদিতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা মনুষ্য নহেন। আমাদের দেবতা অন্তর্য্যামী, তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কি?

পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। যাহা জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়। যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞানকর্ণ আছে, জ্ঞাননাসিকা, জ্ঞানরসনা ইত্যাদি আছে, যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদনে অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহলোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধনদ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত করা হয়। যাঁহার শরীর আত্মা নির্মল তাঁহার আপনা-আপনি জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে, অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য ধর্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মানুষের ভ্রমপ্রমাদে দলাদলির সৃষ্টি হয়; প্রকৃত ধর্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করা, তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে তবে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা যায়। আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসি তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার পূজা অর্চনা করেন, তিনিই আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু। এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চনা হয় সেই স্থানেই গমন করি, যেখানে তাঁহার নামকীর্ত্তন হয়, সেইস্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, আমার প্রভুর নামকীর্ত্তন করিতেছে, কত আনন্দ, আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খৃষ্টান মুসলমান সকলস্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি। কত বৃক্ষতলে, কত পর্বতে নদী-গর্ভে দেবমন্দিরে মসজিদে গীর্জায় আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটি আধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক, প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনা কালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু,

অগ্নি, বৃক্ষ লতা, নদী, পর্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য,—সকলের মধ্যে দিয়া সেই জগদগুরু শিক্ষা দিতেছেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই সেই বস্তুকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা মাতা উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা প্রয়োজন; তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে কি তাঁহার অবতার, কি মধ্যবর্ত্তী রূপে প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারী মাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করা, বিশেষ উপায়।

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেম, শক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে, মনুষ্যের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই করতলন্যস্ত আমলকবৎ বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এ জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন,

'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে'

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
প্রচারক নিবাস
৩১শে বৈশাখ, ১৮০৮ শক

নিবেদক,
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে সমস্ত ব্যাপারটির বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়—

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কি কি কারণে উক্ত সমাজের প্রচারকের পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং কেনই বা তাঁহার পদত্যাগ পত্র কার্য্যনির্বাহক সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে উৎসুক আছেন। এই কারণে উক্ত পদত্যাগের আনুপূর্বিক বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ঢাকা নগরে অবস্থিতি কালে শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামীমহাশয়ের মত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে গোপনে কিছু কিছু আপত্তিজনক কথা কমিটির অনেক সভ্যের কর্ণগোচর হইয়াছিল। ঐ সকল বিষয় লইয়া ঢাকাতে এবং কলিকাতাতে ব্রাহ্মদলে অনেকদিন গোপনে আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকাতে কেহ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই কিংবা তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর উপর হস্তার্পণ করেন নাই। অবশেষে বিগত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে গোস্বামীমহাশয় যখন

কলিকাতাতে আগমন করেন, তাহার কিছুদিন পূর্বে বা সেই সময়ে কালনা হইতে শ্রীযুক্ত পুণ্যদাপ্রসাদ সরকারের প্রেরিত এক পত্র কমিটির হস্তগত হয়। তৎকালেই শ্রীযুক্তবাবু গগনচন্দ্র হোমের লিখিত আর এক পত্র কমিটির হস্তগত হয়। (উভয় পত্র আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি।) উক্ত উভয় পত্রের একখানি কলিকাতাতে লিখিত আর একখানি মফঃস্বল হইতে প্রেরিত। পত্রদ্বয়ে যে অংশে অপরের কথা ছিল, তাহা মুদ্রিত করা হইল না। পত্র পাঠ করিলে পাঠকগণের প্রতীতি হইবে যে গোস্বামীমহাশয়ের মত ও কার্যপ্রণালী দেখিয়া তৎপূর্বেই কলিকাতা ও মফঃস্বল উভয় স্থানেই ব্রাহ্মদের মনে আশঙ্কা জন্মিয়া ছিল। যে দিবস বাবু গগনচন্দ্র হোম কমিটিকে পত্র লিখেন সেই দিবসেই অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে গোস্বামী-মহাশয়ও প্রচারক পদ ত্যাগ করিয়া কার্যনির্বাহক সভাকে প্রথম পত্র লেখেন।

ঐ পদত্যাগ পত্র প্রাপ্ত হইয়া কার্যনির্বাহক সভার সভ্যগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গোস্বামীমহাশয়ের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে তৎপরবর্তী বুধবার সিটি কলেজ ভবনে তাঁহার সহিত তাঁহার মত ও কার্যপ্রণালী বিষয়ে যে কথোপকথন হয়, সে স্থলে কমিটির অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সকল কথা হইল না। গোস্বামীমহাশয়কে দুই একদিন অপেক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল। তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য আমাদিগকে অনুমতি দিয়া গেলেন। তদনুসারে তাঁহার পূর্বোক্ত পত্র প্রত্যাহৃত বলিয়া গণ্য করা হইল।

তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করার পর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও পুণ্যদাপ্রসাদ সরকারের পত্র কার্যনির্বাহক সভায় উপস্থিত হয়। তখন অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করা ও গোস্বামীমহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা আবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। ওদিকে মফঃস্বলে যে যে স্থানে তিনি প্রচারার্থ গমন করিতে লাগিলেন, তৎ তৎ স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার মত ও কার্যপ্রণালী দেখিয়া আশঙ্কিত হইয়া কলিকাতাস্থ বন্ধুদিগকে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। অনেকে বলিতে লাগিলেন যে গগনবাবুর পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া ত্বরায় তাঁহার উত্তর আনয়ন কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকাতে কার্যনির্বাহক সভা কলিকাতায় তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করা উচিত বোধে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য স্থান হইতে তাঁহার মত ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় গোপনে কার্য-নির্বাহক সভার সভ্যদিগের নিকট আসিতে লাগিল। অবশেষে অনেকের আশঙ্কা ও আপত্তি এত প্রবল ভাব ধারণ করিল যে ১১শে বৈশাখ কার্যনির্বাহক সভার চারিজন সভ্যের আর এক পত্র সভার হস্তগত হইল, তাহাতে তাঁহারা এই প্রার্থনা

জানাইলেন যে কার্য্যনির্বাহক সভা গোস্বামীমহাশয়কে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করুন। তদনুসারে গোস্বামীমহাশয়কে ত্বরায় কলিকাতায় আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১০ই মে সোমবার তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ১১ই মে মঙ্গলবার কার্য্যনির্বাহক সভার তিনজন সভ্য গোপনে বন্ধুভাবে তাঁহার মত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইবার চেষ্টা করেন। সেদিন অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু একটি সাবকমিটি নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে রীতিমত অনুসন্ধানের ভার দিলে ভাল হয় এই বিবেচনায় সাবকমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করাতে গোস্বামী-মহাশয় তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তদনুসারে ১২ই মে বুধবার [illegible] অবিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে একটি সাবকমিটি রূপে নিযুক্ত করা হয়। এবং তাঁহাদের উপর গোস্বামীমহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়া নিজ নিজ মত সহ কার্য্যনির্বাহক সভার গোচর করিবার ভার দেওয়া হয়—শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু

„ শিবনাথ শাস্ত্রী
„ নবদ্বীপচন্দ্র দাস
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র
„ আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

১৩ই মে বৃহস্পতিবার উক্ত সাবকমিটির একজন সভ্য গোস্বামীমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে সায়ংকালে সিটি কলেজ ভবনে সাবকমিটির অধিবেশন করা স্থির করেন। তিনি সরলভাবে সাবকমিটির প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে উক্ত দিবস সায়ংকালে সিটি কলেজ ভবনে উক্ত সাব কমিটির অধিবেশন হয়। অধিবেশনস্থলে সমাজের আরও কয়েকজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামীমহাশয় উপস্থিত হইলেন বটে কিন্তু বলিলেন তিনি কমিটি, সাব কমিটি এ সকল স্বীকার করেন না। বন্ধুভাবে বাসাতে গিয়া যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত কিন্তু কোন কমিটি, কি কোন সাবকমিটির কোন প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। উক্ত সাবকমিটির সভ্যগণ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সভাভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তৎপর তাঁহারা বন্ধুভাবে গোস্বামী-মহাশয়ের প্রমুখাৎ ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা কিছু অবগত হইয়াছিলেন সেই সমুদয় এক রিপোর্টে নিবদ্ধ করিয়া আপনাদের অভিপ্রায় সহ কার্য্যনির্বাহক-সভার নিকট প্রেরণ করেন।

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

বৃহস্পতিবারের রাত্রিতে সিটি কলেজ ভবনে সাবকমিটির যে অধিবেশন হয় তৎপূর্বেই গোস্বামীমহাশয় প্রচারকপদ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন ও পদত্যাগ ঘোষণা করিয়া "ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" বলিয়া এক নিবেদন পত্র মুদ্রিত করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র মুদ্রিত করিয়া অবিলম্বে সকল সমাজে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় ছিল। "যদি পদত্যাগ করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, পদত্যাগ করুন ইহা লইয়া একটা বিরোধ উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য নহে"—এই রূপ বুঝাইয়া বলাতে সে সংকল্প তখন পরিত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঘোষণা পত্র প্রচার করিতেছেন জানিয়াও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী তাঁহাকে জন্মোৎসবে উপাসনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। গোস্বামীমহাশয় আমাদের অনেকের অনুরোধে অবশেষে আলবার্ট হলের বক্তৃতার পূর্ব সংকল্প ত্যাগ করিয়া কেবল ব্রাহ্মদিগকে একটি সভাতে সমবেত করিয়া তাঁহার মত ও কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে বক্তৃতা করিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে ১৭ই মে সোমবার সিটি কলেজ ভবনে ব্রাহ্মদিগের এক সভা হয়, সেখানে তিনি আপনার মত ও কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে অনেক কথা বলেন। সেদিন তিনি যেমন সদ্ভাবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া যাঁহারা আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাঁহারাও নিজের মতের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা এতদুদ্দেশ্যে পরস্পর বিরোধী দুই দলে এমন সদ্ভাবের সহিত কথা কহিতে কখনও দেখিয়াছি কিনা স্মরণ হয় না। সে সভাতে কেহ কেহ তাঁহাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তৎপরেও তাঁহার প্রেরিত দ্বিতীয় পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন নাই।

১৯ মে বুধবার কার্য্যনির্বাহক সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে গোস্বামী-মহাশয়ের প্রেরিত নিম্নলিখিত পদত্যাগ পত্র উপস্থিত করা হয়।

পদত্যাগ পত্র

সত্য স্বরূপ, জ্ঞান প্রেম মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায় তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়ত তাঁহার সত্তা-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম করা ও জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ।

(১) এইরূপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না।

সম্পূর্ণ তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সাধনভজন করিলে যথা সময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্মজীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত যোগসাধনপথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎসর চলিয়া আসিতেছি। পরমহংস বাবাজীর উপদেশ অনুসারে যোগপিপাসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধনপথ তাঁহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। (২) এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংস্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক, আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছু দিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশ্যে অনেককে প্রাণায়াম করিতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে। (৩) এই জন্য সাধকমণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাঁহারা ইহার ভিতরের তত্ত্ব কথা কিছুই বুঝিবেন না, কেবল বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে, তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। (৪) কোনরূপ অহঙ্কার বা পাপাচার, পাপচিন্তা, পাপ-কল্পনা পর্য্যন্ত দ্বারাও এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। আমরা কোন সম্প্রদায় বিশেষ মানি না ; হিন্দু, পৌত্তলিক, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃস্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মসমাজের লোক, যে কেহ আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হন, তিনিই সাধন পাইতে পারেন ; এবং সাধন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, পাপ, নীচতা ও কুসংস্কার ব্রহ্মকৃপায় দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন।

(৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার গুরু, আর সকলেই ইহার উপদেষ্টা ও তন্নিযুক্ত পথ প্রদর্শক মাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ উপগ্রহ ও পর্বত প্রভৃতি উপায় দ্বারা নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মানুষ রূপ উপায় দ্বারা কর্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জন্য আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্যের আবশ্যক ; এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলে ও অন্যান্য অবস্থা ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতি বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটি পড়ে, তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না।

(৬) পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করা ধর্মসঙ্গত। পদধূলি লওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দর

ও উপকারী। এই জন্য অন্যের উপকার হইতেছে দেখিলে আমার পদধূলি লইতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি।

(৭) আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে নানা শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতিও হয় এ কথা সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। তবে পিতা মাতা গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা আহার করিলে হানি নাই বরং উপকারই হইয়া থাকে। এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের ধার্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাকি।

(৮) দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আমার ব্রহ্মস্ফূর্তি হয় তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই, ও আমার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া ও হয়ত সেখানে গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই সেইখানেই মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে না।

(৯) কালী, দুর্গা, সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয়, তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময়ে কোথাও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না।

(১০) রাধাকৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, পরমেশ্বর; এ জন্য সর্বপ্রযত্নে আমি এই ভাব সাধনের চেষ্টা করি ও যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধাকৃষ্ণের গান করিয়া থাকি। তবে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখনও ঐ নাম গ্রহণ করি নাই; এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ করা উচিত মনে করি না।

এই আমাদের যোগসাধনপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব তাহাই অবনত মস্তকে অনুসরণ করিব, এই জন্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক

সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। কেবল প্রচারক পদ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম, এখন অবধি ধর্ম প্রচারের সমস্ত কার্য্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটি কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক।

আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম, এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্মকে সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাঁহার ধর্মও এক; মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানা প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছি, এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্যসমাজের দাসানুদাস কিন্তু কোনও দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্বাদ করুন, এই সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

কলিকাতা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
প্রচার আশ্রম

নিবেদক—
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮

"বিষয়টি অতি গুরুতর অতএব তৎপর দিন আবার ঐ বিষয় বিচারিত হইবে" বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারে ২০শে মে বৃহস্পতিবার গোস্বামীমহাশয়ের পত্র ও সাবকমিটির রিপোর্ট, উক্ত উভয় পত্র বিচারার্থ গৃহীত হয়। সে দিন কার্য্য-নির্বাহক সভার সভ্য ভিন্ন আরও অনেককে কার্য্যনির্বাহক সভার বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিবার জন্য ও স্বীয় মত প্রকাশের দ্বারা কার্য্যনির্বাহক সভার সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরে সাবকমিটির রিপোর্ট উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা রিপোর্টটি উদ্ধৃত করিবার পূর্বে সমস্ত ব্যাপারটির নিরপেক্ষ বোধের জন্য সামান্য মন্তব্য প্রয়োজন মনে করি।

উদ্ধৃত বিবরণের প্রথম দিকেই লেখা হইয়াছে যে পুণ্যদা সরকারের পত্র কোন্নগর উৎসব সারিয়া বিজয়কৃষ্ণের কলিকাতা আসিবার পূর্বেই "কমিটির হস্তগত হয়"। গগন হোমের পত্রের তারিখ ১০ই চৈত্র এবং কলিকাতাতেই লেখা। উহাও যে "তৎকালেই কমিটির হস্তগত হয়" উদ্ধৃত বিবরণে তাহা স্বীকৃত, এবং ইহাও স্বীকৃত যে ঐ দিবসই অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে গোস্বামীমহাশয়ও প্রচারক পদত্যাগ করিয়া কার্য্যনির্বাহক সভাকে প্রথম পত্র লেখেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে

বিজয়কৃষ্ণের পদত্যাগ পত্র পাইবার পূর্বেই কার্য্যনির্বাহক সভা পুণ্যদাবাবু এবং গগনবাবু উভয়ের পত্রই প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তাই যদি হয় তবে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেই সমস্ত বিবাদের অবসান হইত। তাহা করা হইল না কেন? পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণকে অনুরোধ করিবার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। ইহার ব্যাখ্যা দিবার জন্য বলা হইয়াছে, "তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করার পর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও পুণ্যদাপ্রসাদ সরকারের পত্র কার্য্যনির্বাহক সভায় উপস্থিত হয়।" ইহা পূর্ব্বে বিবরণের সহিত একান্তই সামঞ্জস্যহীন। "হস্তগত" হওয়া এবং "উপস্থিত" হওয়ায় কোন আইনগত পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না, তবে পদত্যাগের পূর্বে কার্য্যনির্বাহক সভা এই দুই পত্র সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিল, ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। কারণ প্রতিবাদের অনুপস্থিতিতে পদত্যাগের প্রশ্নই উঠে না। অপর পক্ষে যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে কার্য্যনির্বাহক সভা এই দুই প্রতিবাদ পত্র সম্বন্ধে পদত্যাগ পত্র প্রাপ্তির সময় অজ্ঞ ছিলেন, তবে প্রশ্ন উঠে যে কার্য্যনির্বাহক সভা বিজয়কৃষ্ণকে পত্র দুইখানি পাওয়ার সংবাদ দিয়া, তিনি পদত্যাগ করিতেই চাহেন কিনা তাহা জানিয়া লইল না কেন? অন্যথায় ঐ দুই প্রতিবাদ পত্র মীমাংসিত বলিয়া সাব্যস্ত হইল না কেন? যে দিক দিয়াই দেখা যায় কার্য্যনির্বাহক সভার আচরণকে কোনক্রমেই ঋজু বলা যায় না। ব্রাহ্মসাধারণের কাছে বিজয়কৃষ্ণকে ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন করিবার প্রথম সুযোগ উহার চাইই এবং উহা লাভের জন্যই কার্য্যনির্বাহক সভার এই অদ্ভুত আচরণ। উদ্ধৃত বিবরণে এরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে যে ব্রাহ্মসাধারণ পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ পত্র দ্বারা কার্য্যনির্বাহক সভাকে এই বিচারে প্ররোচিত করিয়াছে। তাই যদি হয় তবে বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হইল না কেন তাহা হইলে বুঝা যাইত ব্রাহ্মসাধারণের অধিকাংশ বিজয়কৃষ্ণের মতামতের সমর্থন করেন কিনা। কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে কেশব সেন মহাশয়ের বেলায় সেইরূপই হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের বেলায় দেখি, তিনি ব্যাপারটি ব্রাহ্মসাধারণের সামনে উপস্থিত করিতে চাহিলে কার্য্যনির্বাহক সভা সন্ত্রাসিত। এ সম্বন্ধে বিবরণের, "ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন বলিয়া এক পত্র মুদ্রিত করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র মুদ্রিত করিয়া অবিলম্বে সকল সমাজে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় ছিল। যদি পদত্যাগ করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে পদত্যাগ করুন, ইহা লইয়া একটা বিরোধ উৎপন্ন করা কর্তব্য নয়, এই রূপ বুঝাইয়া বলাতে সে সঙ্কল্প তখন পরিত্যাগ করেন"—প্রভৃতি স্মর্তব্য। অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণের তরফ হইতে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার কোন চেষ্টাই চলিতে পারিবে না কেবল মাত্র কার্য্যনির্বাহক সভা ব্রাহ্ম-

সাধারণকে যেমন ইচ্ছা বুঝাইবে। বিজয়কৃষ্ণ যে বন্ধুদিগের অনুরোধ নিজের পক্ষে হানিকর জানিয়াও রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার উদারতাই প্রকাশ পায়, কার্য্যনির্বাহক সভা এক অনাবশ্যক হাস্যকর বিচারের জের টানিয়া সমান উদারতা দেখাইতে পারে নাই।

বিবরণে বলা হইয়াছে যে ১১ই মে ঠিক হয় যে একটি সাবকমিটি নিয়োগ করিয়া তাহার উপরে রীতিমত অনুসন্ধানের ভার দিলে ভাল হয়, এই বিবেচনায় সাবকমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করাতে গোস্বামীমহাশয় তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। যিনি আপনার মতের বিরোধিতার আভাস পাওয়া মাত্র তাহার নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হইতে নির্বিবাদে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক, তিনি যে কোন সাবকমিটি দ্বারা তাঁহার মতামতের বিচারে রাজী হইবেন তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। এই বিষয়ে সাবকমিটির নিজের বিবৃতি এইরূপ "আমরা যে এতৎ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য কার্য্যনির্বাহক সভা হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা হইল।" সাবকমিটি গঠনে বিজয়কৃষ্ণের পূর্ব সম্মতি থাকিলে, সাবকমিটির বিবৃতির ভাষা অন্যরূপ হইত,—যে সাবকমিটি তাঁহার সম্মতি ক্রমে গঠিত হইয়াছে তাহার আবির্ভাবের কারণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন হইতে পারে না। কার্য্যনির্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণীতেও বিজয়কৃষ্ণের সাবকমিটি গঠনে পূর্ব সম্মতির আভাস নাই। তাহাতে মাত্র এইরূপ আছে "তিনি কলকাতায় আসিলে কার্য্যনির্বাহক সভা একটি সাবকমিটির গঠনপূর্বক তাঁহাদের উপর বিজয়বাবুর সহিত আলোচনা করিবার ভার দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজয়বাবু এই সাবকমিটির নিকট বিশেষ কিছুই বলিতে সম্মত হন নাই।" সাবকমিটির গঠনটিও মন্তব্য সাপেক্ষ— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, উমেশচন্দ্র দত্ত, সাবকমিটিতে ইহাদের অনুপস্থিতি নিরপেক্ষ বাছাই সূচিত করে না। সুতরাং ১৩ই মে তারিখে কমিটি সাবকমিটি স্বীকার করিতে না চাওয়ায় বিজয়কৃষ্ণের আচরণে তত্ত্বকৌমুদী যে অসঙ্গতির ইঙ্গিত করিয়াছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাহা লক্ষিত হইবে না। অপরপক্ষে "বন্ধুভাবে গোপনে" তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদ, তাঁহার দ্বারা অস্বীকৃত সাবকমিটি আপনার রিপোর্টে ব্যবহার করিয়া এবং সাধারণ্যে আলোচনা করিয়া নীতি বিগর্হিত কাজ করিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। বিজয়কৃষ্ণ যেমন বন্ধুগণের অনুরোধে সপক্ষ-সমর্থন করিয়া আলবার্ট হলের প্রকাশ্য বক্তৃতা দেওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করেন, সেই বন্ধুগণেরও উচিত ছিল কোন রূপ বিতণ্ডার অবতারণা না করিয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা। অন্যথায়

বিজয়কৃষ্ণের মতামত ব্রাহ্মসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা। শেষোক্ত পন্থা যে যুক্তিগ্রাহ্য তাহা কার্য্যনির্বাহক সভা তাহার আচরণের দ্বারা স্বীকার করিয়াছে, তাহা না হইলে ২০শে মে তারিখে যে দিন গোস্বামীমহাশয়ের পত্র ও সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়, সেই দিন কার্য্যনির্বাহক সভার সভ্য ভিন্ন আরও অনেককে কার্য্যনির্বাহক সভার বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিবার জন্য এবং স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া উহার সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হইত না। কিন্তু এই পন্থাটি দোষশূন্য নয়—কার্য্যনির্বাহক সভার সভ্য ভিন্ন "আরও অনেককে" ডাকার যদি প্রয়োজন স্বীকৃত হইল তবে সকলকে ডাকা হইল না কেন—এই বাছাইএর অধিকার কোথা হইতে মিলিল এবং বাছাইটা করিয়াছিল কে বা কাহারা এবং কোন সূত্র অনুসরণ করিয়া? তৎকালিক ব্রাহ্মসাধারণ্যে বিজয়কৃষ্ণের মতামত ও আচরণের সমর্থনকারী যে ছিল না তাহা ভাবিবার কোন কারণ নাই—তাঁহার সমর্থনকারী, এমন কি অনুগামীর দল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এই আশঙ্কাতেই যখন তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইতেছিল, তখন সে দাবী চলে না। কাজেই সন্দেহ আসিতে পারে যে বিজয়কৃষ্ণের পক্ষীয় ব্রাহ্মদের ঐ দিন সভায় উপস্থিত হইবার সমান সুযোগ দেওয়া হয় নাই—কারণ তত্ত্বকৌমুদীর বিবরণে বিশেষ কোন বিতণ্ডার উল্লেখ নাই। তাঁহার মত ও কার্য্য-প্রণালী যে নিষিদ্ধ, তত্ত্বকৌমুদী অনুসারে, তাহা প্রায় সকলেই অনুভব করিতে-ছিলেন, তবে কেহ কেহ চাহিয়া ছিলেন যে তাঁহার নিষিদ্ধ মত ও কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আসিবার জন্য ডাকা হউক। ইহাকে মূল বিষয়ে বিতণ্ডা বলা চলে না এবং সত্যই ইহাতে ফলের আশা কিছুই ছিল না, কাজেই 'অধিকাংশের মতে এরূপ অপেক্ষা করিতে বলা অপেক্ষা যে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করাই উচিত বোধ হইয়াছিল' তাহা ঠিকই হইয়াছিল। "অবশ্য সভাস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে সাবকমিটির রিপোর্ট প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়া মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিবার কিছু দিন পরে তাঁহার পদত্যাগ পত্রের বিচার হউক। ইহার উত্তরে এই তর্ক উপস্থিত হইল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিয়মাবলীতে কার্য্যনির্বাহক সভার উপর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার অর্পিত আছে। সুতরাং অন্যের মত যে রূপ হউক না কেন কার্য্যনির্বাহক সভার সভ্যগণ নিজ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে দায়ী।" শেষের এই প্রস্তাব যে রূপ তাচ্ছিল্যতার সঙ্গে অগ্রাহ্য করা হইল, তাহাতে অনুমিত হয় যে উহা যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত উত্থাপিত হয় নাই, এবং ন্যায্য বিচার সভার উদ্দেশ্য ছিল না। সে যাহা হোক, ঐ দিনের অধিবেশন যে প্রধানতঃ এক মতীয়দের অধিবেশন—অন্য

মতাবলম্বীদের স্থান যে সেখানে বড় একটা ছিল না তাহা সুস্পষ্ট। মনে রাখিতে হইবে যে বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ংই সেখানে অনুপস্থিত।

কার্য্যনির্বাহক সভার আচরণ ও সিদ্ধান্ত যে সেই সময়কার সকল ব্রাহ্মের মনঃপূত হয় নাই তাহা আমাদিগকে পরে দেখাইতে হইবে। সুতরাং এখন আর অধিক মন্তব্যের প্রয়োজন দেখি না।

বত্রিশ

বিজয়কৃষ্ণের মতামত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সাবকমিটির রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ: ১। তিনি এক নূতন সাধনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সাধন পন্থাবলম্বীগণ গোপনে সাধন করিয়া থাকেন এবং তাহার গূঢ়তত্ত্ব বাহিরের কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন না। গোস্বামীমহাশয় প্রমুখাৎ জানা গিয়াছে যে, এই সাধনে তিনটি বিষয় আছে যথা (ক) জপ করিবার নিমিত্ত একটি নাম দেওয়া হয়। (খ) একপ্রকার প্রাণায়াম বা শ্বাস প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হয়, তবে গোস্বামীমহাশয় ইহাকে সাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন না, কেবল ভূতশুদ্ধির জন্য কিছুদিন আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তবে ক্বচিৎ কাহারও পক্ষে ইহা একেবারেই অনাবশ্যক হইতে পারে। (গ) এতদ্ভিন্ন কি এক অব্যক্ত শক্তির সঞ্চার করা হয় যাহার স্বরূপ সাধন বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত। এই সাধনপ্রণালী নিম্নোক্ত কারণে আশঙ্কাজনক মনে হয়। এই সাধন বালক, অজ্ঞ এবং পৌত্তলিকদিগকেও দেওয়া হইতেছে। প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয় হইতেছে যে, যদি ইহা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট উপায় হয়, যদি ইহাতে বাস্তবিক মানবের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় ও ঈশ্বর লাভের একটি সুন্দর পথ উন্মুক্ত হয়, তবে ইহাকে গোপনে দেওয়া হয় কেন এবং ইহা গোপনে সাধিত হয় কেন? ইহার উত্তরে গোস্বামীমহাশয় বলেন যাঁহারা ঐ সাধনের গূঢ়তত্ত্ব জানেন, না তাঁহারা সাধনক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে কতকগুলি বাহ্যিক প্রক্রিয়া দেখিয়া উহাদিগকেই সাধনের গূঢ়তত্ত্ব মনে করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে ভ্রম হইতে বাঁচাইবার জন্যই গোপনীয়তার প্রয়োজন। × × একে ব্রাহ্মগণ অতি অল্প সংখ্যক, কোথায় তাঁহারা এক হৃদয় ও এক প্রাণ হইয়া কায়মন প্রাণে ধর্ম-সাধনে এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন, না তাঁহাদের মধ্যেই অনেক পরিমাণে পরস্পর বিরোধী দুই দল উৎপন্ন হইয়া পরস্পর

সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় করিতে থাকিবে। ইহা অবাঞ্ছনীয়। × × গোস্বামীমহাশয় যে প্রণালীতে সাধন দিতেছেন তাহা বহুল প্রচার হইলে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি তিষ্ঠিতে পারিবে না। ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে যে যখন মন্দিরে উপাসনাদি হইতেছে এমন কি সামাজিক উৎসবাদি চলিতেছে, তখন এই সাধন পথাবলম্বী অনেকে অতি নিকটে থাকিয়াও স্থানান্তরে এই সাধনে নিযুক্ত হইতেছেন।* এই সাধন পথাবলম্বীগণের চিত্তে আধ্যাত্মিক অহঙ্কার জন্মিবার সম্ভাবনা। × × এই সাধন দিবার সময় মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইতেছে না—পৌত্তলিকগণ পৌত্তলিকতা রক্ষা করিয়াও এই সাধন লইতেছে। ইহার ফলে মতের ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতার দিকে লোকের আর তীব্র দৃষ্টি থাকিবে না। গোস্বামীমহাশয়ের প্রদর্শিত পথাবলম্বী সাধকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। × ×এই সাধন অবলম্বনে চিন্তাহীন ও গুরুমুখাপেক্ষী হইবার সম্ভাবনা। ২। এই সাধন পথাবলম্বীদিগের একটি প্রধান অবলম্বনীয় নিয়ম, কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করা। উচ্ছিষ্ট গ্রহণের প্রতি ইহাদের কঠিন শাসন। গোস্বামীমহাশয় বলিয়াছেন যে এই নিয়ম কেবল শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য এবং শরীর সুস্থ থাকিলে সাধনের অনুকূলতা হয়। × × উচ্ছিষ্ট গ্রহণে এমনকি বিপদাশঙ্কা? এক হুঁকাতে গ্রামের অনেক লোক প্রতিদিন তামাকু খাইতেছে—প্রতিদিন শত শত লোক প্রণয় ও বন্ধুতার স্থলে এক পাত্র হইতে পানভোজন করিতেছে। কই, তন্নিবন্ধন কোন পীড়ার সঞ্চারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। × × গোস্বামীমহাশয় তৎপরে বলিয়াছেন যে অনেক সাধু মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন যে উচ্ছিষ্ট গ্রহণে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন করে, ইহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কিরূপ প্রমান পাওয়া গিয়াছে জানি না, তবে ইহা নিশ্চিত যে এই শুচিবায়ুর দিকে একবার মন ঝুঁকিলে দিন দিন এইরূপ বিচারের বৃদ্ধি হইবে এবং প্রকারান্তরে জাতিভেদের ন্যায় প্রেমবিরোধী ও সংকীর্ণ ভাব সকল সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

৩। এই সাধন পথাবলম্বীব প্রতি আর একটি আদেশ যে তিনি মৎস্য খাইলেও খাইতে পারেন কিন্তু মাংস আহার নিষেধ। গোস্বামীমহাশয়ের প্রবর্ত্তিত মত এই দেশের বৈষ্ণবদিগের প্রথার অনুকরণ কিনা জানি না। মৎস্য আহার করিতে পারা যায় অথচ মাংস বর্জনীয়, এই মত কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা বুঝিতে পারি না।

---

* সাবকমিটির সভ্যগণ ১২৯১ বাং সালের মাঘোৎসবের কথা তত্ত্বকৌমুদীর প্রশংসা সত্ত্বেও ভুলিতে পারেন নাই। ১৭৫-১৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। —লেখক।

৪। গোস্বামীমহাশয়ের মতে মানুষ গুরু নাই, গুরু একমাত্র পরমেশ্বর। সাক্ষাৎভাবে গুরুবাদ অবলম্বিত না হইলেও তাঁহার দীক্ষিত দলের মধ্যে প্রকারান্তরে গুরুবাদ প্রচার হইতেছে। আশাবতীর উপাখ্যানে তিনি গুরুবাদের সমর্থন করিতেছেন। ব্যাস ও বিপ্রের গল্প উল্লেখ করিয়া সেখানে দেখান হইতেছে যে সামান্য "ওঁ রামঃ" মন্ত্র যতদিন গুরুর হস্ত-লিখিত ছিল ততদিন তাহাতে শক্তি ছিল, কিন্তু সে নিজে যখন লিখিল তখন তাহাতে কার্য্য হইল না। ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে গুরুর কৃপা ও সাহায্য বিনা নিজে ঈশ্বরের নাম করিলে তাহাতে ফল নাই; গুরু ব্যতীত ধর্মলাভের চেষ্টাকে পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পুষ্করিণী খননের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অধিক অনিষ্টকর মত কি হইতে পাবে তাহা জানি না। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে যে গুরুবাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে তাহার প্রমাণ, যথা দীক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার যাবতীয় উপদেশকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহার সাধক দলভুক্ত কোন সম্মানিত মহিলা বলিয়াছেন, "ধর্মজগতের চাবি গুরুর হস্তে।" তাঁহার পদধূলির দ্বারা উপকার হয় এই ধারণায় একটি স্ত্রীলোক একদিন ব্যাকুলতাতে উন্মত্ত প্রায় হইলে পূর্বোক্ত মহিলা গোস্বামীমহাশয়ের পদধূলি লইয়া তাহার অঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। জানা গিয়াছে যে দীক্ষিতগণের কেহ কেহ গোস্বামীমহাশয়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

৫। তাঁহার সাধনার্থীদিগকে তর্কযুক্তি না করিয়া সাধন অবলম্বন করিতে বলেন এবং সে সম্বন্ধে অন্য কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে নিষেধ করেন। তাঁহার দীক্ষিতগণ তাঁহার বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে স্বাধীন চিন্তাশক্তি খর্ব হইবার সম্ভাবনা।

৬। তাঁহার দীক্ষিত সাধকগণ তাঁহার পদে পড়িয়া থাকেন, তাঁহার পদধূলি লইয়া অঙ্গে মাখিয়া থাকেন এবং অপরের অঙ্গে মাখাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহার আশাবতীর উপাখ্যানে যোগী বলিয়াছেন যে তুমি যে ভক্ত পদরজের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছ ইহা হইতে বোধ হইতেছে তোমার যোগ শিক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। × × তাঁহার অনুগত সাধকদিগের বিবেচনায় গোস্বামীমহাশয়ের পদধূলির এমন কোন আশ্চর্য মহিমা আছে যাহাতে তাহা একজন মূর্চ্ছিত ব্যক্তির দেহে মাখাইয়া দিলেও তাহার উপকার হইবে। আমাদের বিবেচনায় এই পদধূলি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হইতেছে এবং অল্পেঅল্পে অতি শোচনীয় কুসংস্কার প্রবেশ করিতেছে। তিনি শিষ্যগণকে মৃত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পদতলে পতিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সেই সকল

আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সেই স্রোত বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি চিরদিনের নিমিত্ত ব্রাহ্মসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন। দুঃখের বিষয় যে এক্ষণে নিজ দীক্ষিত দলের এই সকল বাড়াবাড়ি দেখিয়াও দমন করিবার কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন না।

৭। গোস্বামীমহাশয়ের সাধক দলের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও লীলা ঘটিত সঙ্গীত চলিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ঢাকাস্থিত বাসভবনে উক্ত লীলা সংক্রান্ত ছবি সকল (যথা মানভঞ্জন ও নরনারী কুঞ্জর, অষ্টসখী ঘোড়া প্রভৃতি) অনেকে দেখিয়াছেন। গোস্বামীমহাশয়ের মতে রাধাকৃষ্ণ একটি আধ্যাত্মিক রূপক। রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা মানভঞ্জন প্রভৃতির ন্যায় সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব আর আছে কিনা সন্দেহ। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য ঈশ্বর। ভগবান ভক্তসঙ্গে যে যে ভাবে বিহার করিয়া থাকেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সকল সঙ্গীত তরলমতি যুবক যুবতীদের পক্ষে ভয়ানক বিষাক্ত দ্রব্য স্বরূপ। × ×

৮। গোস্বামীমহাশয় বলেন ঈশ্বরের নাম নাই, তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা সম্বোধন করা যায়। তাঁহাকে ঈশ্বর বল, হরি বল, আল্লা বল, খোদা বল, কালী বল, দুর্গা বল কোন নামই নিষিদ্ধ নহে। ঈশ্বরকে কালী দুর্গা বলা যায় এই মতটি আমাদের ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। আমরা কোনরূপ একটা আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারে বলিয়া যে সকল নাম চিরদিন বিশেষ বিশেষ পৌত্তলিক মতের সহিত সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া মনে করি। ব্রাহ্ম প্রচারকের মুখে ঐ সকল নাম শুনিলে পৌত্তলিকগণ বিবেচনা করিবে যে ব্রাহ্মগণই তাঁহাদের দিকে যাইতেছেন, তাঁহাদের আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে। যখন ঈশ্বরের অসংখ্য নাম রহিয়াছে এবং ঐ সকল নাম ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এতদিন আদরের সহিত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তখন পৌত্তলিক দেব-দেবীর নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না অপর দিকে ঐ সকল নাম ব্যবহারে প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা।

৯। গোস্বামীমহাশয় বলেন, আমার যেখানে ব্রহ্ম স্ফূর্তি হয় আমি সেইখানেই প্রণাম করি। হিন্দুসমাজ মধ্যে কোন কোন তার্কিক বলেন যে ঈশ্বর যখন সর্বব্যাপী তখন আর আর স্থানের ন্যায় সম্মুখস্থ নারায়ণ শিলাতেও তিনি আছেন; অতএব তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নারায়ণ শিলার সমক্ষে প্রণাম করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। গোস্বামীমহাশয়ের আচরণ তাঁহাদের যুক্তিকে সমর্থন করিবে, ফলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুমহৎ বিঘ্ন ঘটিবে।

১০। গোস্বামীমহাশয়ের অদ্ভুত শক্তি বিষয়ে অনেক গল্প তাঁহার দীক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। পরলোকগত সাধুগণ তাঁহার নিকট সর্বদা আগমন করেন, জীবিত সাধুগণ সূক্ষ্ম দেহে যোগবলে সদেহে তাঁহার নিকট আসিয়া থাকেন। বরিশালের শ্রীযুক্ত রায় * মহাশয়ের বাটীতে একটি বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী-মহাশয় বলিয়াছেন, সেই বৃক্ষে একটি আত্মা আছে এবং বৃক্ষতলে সংকীর্ত্তন করিলে তাহার উদ্ধার হইতে পারে। তিনি আর একদিন বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু পরমহংসজী সেই দিন বরিশালে আসিয়াছিলেন। কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুর জন্মজড় পুত্রকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে একটি যোগিনী তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই যোগিনী ছাড়িলেই বালক আরোগ্য লাভ করিবে। গোস্বামীমহাশয়ের কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বশতঃ এইরূপ হয় কি না বলিতে পারি না, তবে এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে এই দ্বার দিয়া অনেক কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইতে পারে।

উপসংহারে সাবকমিটি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে সমাজের কোন একজন সামান্য সভ্য এই সকল মত ও কার্য্য অবলম্বন করিলে তত অনিষ্ট হইত না। গোস্বামীমহাশয়ের ন্যায় সাধারণের শ্রদ্ধা-ভাজন একজন প্রচারকের দ্বারা এই সকল মত প্রচারিত ও এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে আরও অধিক অনিষ্ট করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিবার সম্ভাবনা।

সাবকমিটির এই রিপোর্টে ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধতা-রক্ষার জন্য যে উৎসুক উৎসাহ দেখান হইয়াছে, জাতীয় মানসের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সেইরূপ সজ্ঞানতা দেখান হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। হিন্দুধর্মের প্রকৃত এবং কল্পিত যাবতীয় অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হইল রামমোহনের কাল হইতে, thesis-এর বিরুদ্ধে বাধিল antithesis-এর সংঘর্ষ। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির উত্তর-সাধক হিসাবে আলোচ্য কালের ব্রাহ্ম নেতাগণ ও এই সংঘর্ষে অল্পবিস্তর সাক্ষাৎ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিক নিয়ম বশেই তাঁহাদেরই শক্তিতে পুষ্ট এই antithesis-এর সহিত একটা আত্মীয়তা বোধ করায় তাঁহারা অনেকেই পরিষ্কার রূপে ধারণা করিতে পারিলেন না যে সংঘর্ষের ফলে ইতিপূর্বেই synthesis-এর আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। এইখানেই বিজয়কৃষ্ণের বিভিন্নতা এবং এই বিভিন্নতার জন্যই তিনি মাত্র ব্রাহ্ম নেতা নন, তিনি জাতীয় নেতাও। সমসাময়িকদের মধ্যে

* স্পষ্টই লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় (চৌধুরী) মহাশয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে—লেখক।

কেহই antithesis কে তাঁহার ন্যায় সাহস ও শক্তি যোগান নাই,—সাবকমিটির রিপোর্টেও তাহার সামান্য স্বীকৃতি রহিয়াছে। ১৮৬০ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ বাইশ বৎসর antithesis-এর তিনিই যেন মূর্ত্তিমান প্রতিভূ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে antithesis-এর পুরোধাদিগের মধ্যে তাঁহারই নিকট প্রথম ধরা পড়িল যে antithesis-এর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং synthesis-এর প্রয়োজন আসিয়া গিয়াছে। Antithesis-এর সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ সত্ত্বেও তাঁহার মনকে উহা আবিষ্ট করিতে পারে নাই, এই জন্য যে তিনি ছিলেন ষোল আনা সত্যানুসন্ধিৎসু। সত্যের জন্য তাঁহার মনের সমস্ত বাতায়ন সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। সত্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার পূর্ণ সুযোগ দিলেন তিনি antithesis-কে এবং তাঁহার মোহমুক্ত মানসে ক্রমে ক্রমে ধরা পড়িল antithesis-এর limitation বা সীমাবদ্ধতা। তাঁহার এই আবিষ্কারের কথা তিনি তাঁহার নানান বক্তৃতায় বা আচরণ দ্বারা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতেই এবং তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। তবে মতবাদের ধর্মের অপূর্ণতার স্পষ্ট অনুভব প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার 'যোগ সাধন' পুস্তিকায়, যাহা আলোচ্য বিচারের সামান্য কিছু পরে প্রকাশিত। Antithesis-এর পথে, অর্থাৎ thesis-এর পুরাপুরি বর্জনের পথে, তাঁহার প্রাণের পিপাসা যে মিটল না, পূর্বগামী বহু বক্তৃতা ও উপদেশেই তাহার আভাস তিনি দিয়াছেন। বাংলা ১২৯২ সনের ১০ই পৌষ ঢাকার এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, যতদিন সত্যকে পুস্তক ইত্যাদি হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, ততদিন সব বৃথা—সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই সত্য যখন উপলব্ধ হয় তখনই ধর্ম প্রত্যক্ষ হয়,—তখন যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্র হইয়া বলে,— তুমি যাহা বল, তাহা ভুল, আমি হুঙ্কার করিয়া বলিব, 'না আমি উপলব্ধি করিয়াছি।'

পরিতাপের কথা যে সাবকমিটির সভ্যগণ বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির, যাঁহার ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা ব্রাহ্মগণের মুখে কিম্বদন্তির মত প্রচলিত ছিল, তাঁহার ঘোষিত এই অভাব বোধকে যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত বিচার করিয়া উহার কারণ অনুসন্ধানে যত্নবান হইলেন না। গুরুবাদ, সাকার উপাসনা প্রভৃতি মতবাদ গুলির সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের অধুনাতন যুক্তিগুলির ধীর বিচার না করিয়া এ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের পূর্ব মতের উল্লেখ করিয়া সরাসরিভাবে বাতিল করা হইল। ভ্রমাত্মক সংস্কারের নিম্ন ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণ যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই—যুক্তি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উচ্চতর ক্ষেত্রে তিনি তাহাদের নূতন আলোকে দেখিলেন। সাবকমিটি তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিল না—এবং তাঁহার

যুক্তিকে গ্রহণ করিল না। করিতে পারিলে জাতীয় ধর্ম জীবনে synthesis বা সমন্বয় সাধনের সহায়ক হইতে পারিত—না পারায় ব্রাহ্মধর্ম দেশীয় কৃষ্টির মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের প্রসারের ক্ষেত্র ব্যাহত হইল কিনা তাহার সাক্ষ্য ইতিহাস দিতেছে। সাবকমিটির নেতাগণ মনে করিলেন বিজয়কৃষ্ণকে সমগ্রভাবে মানিয়া লইলে হিন্দুধর্মের সহিত আপোস করা হয়—ভাবিতে পারিলেন না সে আপোস করার যুগ আসিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন বিষয়ে নূতন চিন্তার আবশ্যক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবিতে না পারার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে এমন সকল মত প্রকাশ করিলেন যাহা বর্তমান পাঠকের নিকট একান্তই বিজাতীয় মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী এবং সংকীর্তন সম্বন্ধে উক্তিগুলি ধরা যাইতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলী এবং সংকীর্তনকে সারসরিভাবে যৌন ব্যভিচারের উদ্দীপক হিসাবে বাতিল করা আজিকার দিনে দেশীয় ভাবের সহিত সহানুভূতিশূন্য বিদেশী নিন্দুকের সতেজ প্রতিধ্বনির মত শুনায়। জগতে এমন কিছু নাই যাহার অপব্যবহার অসম্ভব, সুতরাং অপব্যবহারের আশঙ্কায় রাধাকৃষ্ণের ভাবকে এবং সেই ভাবের ফল স্বরূপ পদাবলী সাহিত্য ও সংকীর্তনকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা বন্যাভয়ে নদী বুজাইয়া দেওয়ার মত হাস্যকর। বিজয়কৃষ্ণের হাতে যে রাধাকৃষ্ণ ভাবের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইতেছিল না, এ অসম্ভব অভিযোগ কাহারও ছিল না।

ঈশ্বরকে হিন্দু দেবতার নামে ডাকা এবং হিন্দু দেব-দেউলের সম্মুখে ভক্তি প্রদর্শন সম্বন্ধে সাবকমিটি যে যুক্তি দিয়াছে, তাহাতে জিদের অংশই বেশী। হরি, কালী দুর্গাকে যদি ঈশ্বরের একার্থ বোধক ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ঈশ্বরের পরিবর্তে হরি উচ্চারণে কি দারুণ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ঈশ্বর এই কথাটিও একটি শব্দ প্রতীক (word symbol), "হরি" কথাটিও সেইরূপই একটি শব্দপ্রতীক। আমাদের মানসে উহাদের অর্থ যদি সমীকৃত হয় তবে একটির পরিবর্তে আর একটির ব্যবহারে কোন ন্যায্য বাধা থাকিতে পারে না। হিন্দুধর্মের সহিত association (অনুষঙ্গ) আছে বলিয়াই যদি হরি শব্দ অস্পৃশ্য হয় তবে অবশ্য কিছু বলিবার নাই। কিন্তু হিন্দু মানস ও হিন্দুকৃষ্টির সম্বন্ধে এই উৎকট বিরুদ্ধ ভাব ব্রাহ্মধর্মের আদি প্রবর্তকগণের মধ্যে ছিল না, বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে ত ছিলই না। হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থসমূহ হইতে বরাবরই তিনি প্রেরণা লাভ করিতেন, তবে তিনি তাহাদের সর্বদাই একটা যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ দিতেন। স্বীকার করিতেই হয় যে হিন্দুধর্মের যুক্তিযুক্ত সংস্কারের উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রবর্তন,—বর্তমান পরিভাষায় 'হিন্দুধর্মের মধ্যে উহা ginger group রূপে কাজ করিতেছিল।

প্রধানতঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম চিন্তাধারা অনুপ্রবিষ্ট করানই ছিল আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য, তাহা না হইলে প্রচারকের মানেই হয় না! সুতরাং এই উদ্দেশ্য কিরূপে অধিক সফল হইবে সাবকমিটির সদস্যগণ যদি ধীরভাবে তাহার বিচার করিতেন, তাহা হইলেও হিন্দুত্ব বর্জনের এইরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন না। হিন্দুধর্মের মধ্যেই যে একটা স্বাধীন চিন্তার ভাব আসিয়া গিয়াছে, তাহার আভাস সাবকমিটির রিপোর্টে রহিয়াছে, হিন্দুসমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণও আসিয়া গিয়াছেন। সমগ্র জাতির উপর এই দুই ব্যক্তির প্রভাব ইতিহাসের কথা—ইহাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যুগের চাকা ঘুরিয়াছে, অনুপ্রবিষ্ট স্বাধীন চিন্তা হিন্দুধর্মের বহু আবর্জনা দূরীভূত করিয়া উহাকে নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং ঐ সময়ে হিন্দু চিন্তাধারার সহিত একটা head-on clash বা সরাসরি সংঘাত ব্রাহ্মচিন্তার প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিলেও সমীচীন ছিল না। সেই যুক্তিতেও হিন্দু দেব-দেউলের সম্মুখে সম্মান প্রদর্শনকে মতের উদারতা বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। সর্বব্যাপী ঈশ্বর হিন্দু দেবস্থানগুলিতেই অনুপস্থিত কোন যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণ করাও ত এক দুরূহ ব্যাপার! সাবকমিটির রিপোর্টটি অতিমাত্রায় বাস্তববাদীর দৃষ্টিকোণ হইতে লেখা হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় যাবতীয় ব্যাপারকেই ইহাতে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইয়াছে। ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াতিরিক্তের সম্বন্ধে এই অবিশ্বাস কেমন যেন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই অলৌকিকের স্বীকৃতি আসিয়া পড়ে—কারণ ঈশ্বর লৌকিক কিছু নহে, এবং ঈশ্বর দর্শনও নিশ্চয় পরিচিত কোন ইন্দ্রিয় কার্য্য নহে। কোন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে অতীন্দ্রিয়, অলৌকিককে অস্বীকার করা সমীচীন হইয়াছে কিনা তাহা সুধীজন বিবেচ্য। এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যেমন ভুল, পরিদৃশ্যমান জগৎকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া ইহার বাহিরে কিছুই নাই মনে করাও সেইরূপ বা ততোধিক ভ্রমাত্মক। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Divine Life-এ এই দুই অস্বীকৃতি (The Two Negations) সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন, "If the materialist is justified in insisting on matter as reality ·· and the Beyond as wholly unknowable, if not-indeed non-existent, a dream of the mind...so also is the sanyasin, enamoured of the Beyond, justified...in insisting on pure spirit as the reality...and the relative as a creation of the mind and the senses, a dream... অর্থাৎ বাস্তববাদীদের বস্তুজগৎকে একমাত্র সত্যজ্ঞান করার যদি যুক্তি থাকে,

সন্ন্যাসীদের বস্তু জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ারও যথেষ্ট যুক্তি আছে। বস্তুতঃ উভয়ের স্বীকৃতিতেই সত্য দর্শন। বিজয়কৃষ্ণের শক্তি সঞ্চার প্রভৃতি ব্যাপার গুলিকে কমিটি সরাসরি অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—উহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকৃতির ফল বলিয়া শ্লেষ করিয়াছে।* এই নিষ্ঠুর শ্লেষের দ্বারা কমিটি ধর্ম ক্ষেত্রে আপনার অযোগ্যতারই প্রকাশ করে নাই—বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাহার প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষও প্রকাশ করিয়াছে। উভয় কারণেই উহা বিচারকের যোগ্যতার দাবী হারাইয়াছে।

যাহাই হোক—সাবকমিটির এই রিপোর্ট পাঠের পর "সর্ববাদী সম্মতিতে" নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইল, স্থির হইল যে কার্য নির্বাহক সভার বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :—

প্রথম প্রস্তাব

(১) গুরুর আবশ্যকীয়তা অর্থাৎ গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টা ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিলাভ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল—এই মত। (২) ঈশ্বরে চিত্ত অর্পিত থাকিলেও দেবমন্দিরে ও দেবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম ও গড়াগড়ি দেওয়া। (৩) নিজের উপাসনা কালে, অথবা অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রকাশ্য উপাসনা কালে কালী, দুর্গা, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর নাম গ্রহণ।

(৪) রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ও লীলা সংক্রান্ত গীত সকল ধর্ম সাধন স্থলে গান করা এবং রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদিগের লীলাবিহার সংক্রান্ত ছবি সকল উপাসনাস্থলে রক্ষা করা। কোন প্রকারে ঐ সকল গান, ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারিলেও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়।

---

* বৎসরাধিক পূর্বে ১২৯১ বাংলা বৎসরের মাঘোৎসবে সমগ্র উপাসকমণ্ডলী কিরূপ শক্তি প্রভাবিত হইয়াছিল সাবকমিটির তাহা না জানিবার কথা নয়। গোস্বামী অনুরাগী শ্রীচক্রবর্তী (মনে হয় শ্রীচরণ চক্রবর্তী) দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীকে বলিয়াছিলেন বিজয়বাবু এমন আশ্চর্য ব্যাপার দেখাইতে পারেন যাহার জন্য আপনারা লালায়িত। আপনার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া পরে তত্ত্বকৌমুদীতে তিনি লিখিয়াছিলেন, যাঁহারা বিজয়বাবুর বাক্যে ও কার্যে অবিশ্বাস করেন ও বুজরুকি বলিয়া উপহাস করেন তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই তিনি ঐ উক্তি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সাবকমিটির শীর্ষ স্থানীয় শিবনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি স্মরণীয়—শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়। বলে, জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হয়। বোধ স্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে; তাঁকে চিন্তা করে অবোধ!—লেখক

(৫) যে প্রণালীতে ও যে যে নিয়মে গোস্বামীমহাশয় দীক্ষা দিতেছেন, সেই প্রণালী—ও সেই সকল নিয়ম।

(৬) কোন কোন মত বা আচরণ, কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি বিশেষের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, এই মত।

(৭) কোন ব্যক্তি বিশেষের পদধূলির কিছু আশ্চর্য্য মহাত্ম্য আছে এরূপ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করা, কি তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হওয়া, কিম্বা পদধূলি দ্বারা অপরের আধ্যাত্মিক, কি শারীরিক যাতনা নিবারণের সাহায্য হইতে পারে, এই বিশ্বাসে অপরের অঙ্গে তাহা মাখাইয়া দেওয়া।—

অতীব আপত্তিযোগ্য এবং এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল মত বা আচরণ অবলম্বন করিয়াছেন, কার্য্য নির্বাহক সভা আগ্রহ ও সদ্ভাবের সহিত তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা একবার ঐ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখুন; এবং তদ্দ্বারা কত অনর্থ ঘটিবে ও ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত সকলের ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্য্যের কিরূপ উচ্ছেদ সাধন করিবে, তাহা অনুভব করিয়া এগুলিকে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য বাধা দিবার উপায় করুন।"

উক্ত প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে, অনেক চিন্তা ও তর্ক বিতর্কের পর অধিকাংশের মতে নিম্নলিখিত নির্ধারণটি স্থির হইল—

দ্বিতীয় প্রস্তাব

তাঁহাদের সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বিতীয়বার পদত্যাগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা কার্যনির্বাহক সভা গভীর দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। তিনি অনেক পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সেবা করিয়াছেন, সে সেবার মূল্য নাই,—তাহার জন্য উক্ত সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং আগ্রহ ও প্রীতির সহিত অনুরোধ করিতেছেন, যে তিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাঁহার বর্তমান মত ও কার্যের প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহার কিরূপ ফল দর্শিবে। পূর্বোক্ত যে প্রস্তাব কমিটি একবাক্যে নির্ধারণ করিয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া ঐ সকল বিষয়ে-চিন্তা করুন। সভ্যগণ ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের ভক্তিভাজন প্রচারক ভ্রাতা যেন ত্বরায় আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন এবং যে ব্রাহ্মধর্ম

প্রচারের জন্য তিনি স্বার্থ বিসর্জন দিয়া যাবজ্জীবন নিযুক্ত আছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নিমিত্ত যেন পুনরায় আপনার অগ্নিময় উৎসাহ, বল ও চরিত্রের সাধুতা নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা আরও আশা করেন যে তাঁহার সহিত প্রচারকের সম্বন্ধ রহিত হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ও ও ভালবাসা আছে তাহা চিরদিন প্রবল থাকিবে।"

বলিয়া রাখা কর্তব্য যে প্রস্তাব দুইটি মূলে ইংরাজিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং তত্ত্বকৌমুদীতে ইহার বাংলা অনুবাদও ছাপা হইয়াছিল। বাংলার বাহিরে তথা ভারতের বাহিরে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সুবিধার্থেই হয়ত প্রস্তাবগুলি ইংরাজিতে করা হয়। আমাদের এই বাংলা গ্রন্থে বাংলা অনুবাদই ছাপিলাম এবং স্থানাভাবে ইংরাজী রূপটি দিতে পারিলাম না।

তেত্রিশ

ঢাকা যেমন বিজয়কৃষ্ণকে মনোনীত করিয়া কার্যনির্বাহক সভার সিদ্ধান্তের প্রকারান্তরে প্রতিবাদ জানাইল, কলিকাতাস্থিত বহু ব্রাহ্মও ঐ সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল। ১৮০৮ শকের ১লা মাঘের (১৮৮৭) তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে জানা যায় যে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি নয়জন ব্রাহ্ম বান্ধব স্বাক্ষরিত একখানি মুদ্রত নিবেদন পত্র প্রকাশ করেন। এই মুদ্রিত নিবেদন পত্রখানি আর পাইবার উপায় নাই—তবে তাহাতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা তত্ত্বকৌমুদীর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই মোটামুটি জানিতে পারি। "এই নিবেদন পত্রে তাঁহারা ব্রাহ্ম সাধারণকে কয়েকটি কথা জানাইয়াছেন (১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্বাহক সভার পক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা ভাল হয় নাই। (২) উক্ত সভা তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণের সময় কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। (৩) এই অবিচারের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ গোস্বামীমহাশয়কে প্রচারক পদ পুনঃ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। গোস্বামীমহাশয়ের সহিত কার্য্য নির্বাহক সভার সভ্যগণের যে যে বিষয়ের মতভেদ, নিবেদন কর্ত্তাগণ তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখ করিয়াছেন :— (১) গুরুদত্ত মন্ত্রের শক্তি ও ফলোপদাকিয়তা আছে। (২) ধর্ম সাধনে গুরুর সাহায্যের ও গুরুর আনুগত্যের আবশ্যকতা ও ফলোপদায়িকতা আছে এবং তাহাতে সাধনের বিশেষ উপকার বোধ করেন। (৩) অধিকাংশ স্থলে প্রাণায়াম বা শ্বাস নিয়ামক কোন প্রকার সাধনের আবশ্যকতা আছে। (৪) সাধুবাক্যে নিষ্ঠার

ফল আছে। (৫) গুরুশক্তিতে শিষ্যের অন্তরে কোন প্রকার অব্যক্ত শক্তির সঞ্চার হয়। (৬) বিজয়বাবুর বিবিধ প্রকার অদ্ভুত শক্তি আছে। নিবেদন কর্ত্তাগণ এগুলির কোন প্রতিবাদ করেন নাই, বরং বলিয়াছেন,"এই সমস্ত নূতন কথা বিজয়বাবুর ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের একজন বহু সম্মানাস্পদ প্রাচীন সুবিজ্ঞ প্রচারকের দ্বারা যখন প্রচারিত হইতেছে, তখন ব্রাহ্মসমাজের তৎপ্রতি একেবারে খড়্গহস্ত হওয়া বিধেয় নয়। যদ্যপি এই সমস্ত কথার মধ্যে সত্য থাকে তবে তাহা ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি। অপ্রাপ্ত বয়স্কতা ও অপূর্ণতা হেতু বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ একথা বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, সেই সমস্ত ব্রাহ্মসমাজেরই ঐশ্বর্য্য।" ইহার পর সম্পাদক মহাশয় গোস্বামীমহাশয়ের দুই পদত্যাগ পত্র, গগন হোম ও পুণ্যদা সরকার মহাশয়দ্বয়ের অভিযোগ পত্র ও সাবকমিটির তদন্ত ও রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "কার্য্য নির্বাহক সভা যে গোস্বামীমহাশয়কে সহজে যাইতে দিয়াছেন তাহা আমরা মনে করি না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং প্রচারক সংখ্যা যেরূপ অল্প তাহাতে গোস্বামীমহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে অপসৃত হইতে দেওয়া কি সুখকর ব্যাপার? যাহার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা আর কেহ করেন নাই, যিনি ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্তদিন অনাহারে ও পথশ্রমের পর মৃৎপিণ্ড মাত্র আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করিয়াছেন, যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্থল, তাঁহাকে সহজে ও অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে কে পারে? বরং এই কথাই কি সত্য নয়, তাঁহার সহিত যে যে বিষয়ে মতভেদ তাহার বিচার বহুদিন হইতে হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকাতেই তাঁহার কার্য্যের বহুদিন কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই? বিজয়বাবুকে সহজে অপসৃত হইতে বা কঠোর-ভাবে অপসৃত হইতে দিয়াছে বলিলে অত্যন্ত অবিচার করা হয়। পত্র লেখক-গণের সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মের আদরণীয়; সত্যের অনুসন্ধান কেন হইল না? অর্থাৎ পত্র লেখকগণের অভিপ্রায় এই যে পূর্বোক্ত ছয়টি বিষয় যাহা বিজয়বাবুব নামে উক্ত হইয়াছে তাহার বিষয় কেন অনুসন্ধান করা হইল না? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, সাব কমিটির রিপোর্টেই প্রকাশ যে এ বিষয়ের বিচার হইয়াছে। আর এ সকল বিষয়ের বিচার কি পূর্বে কখনও ব্রাহ্ম-সমাজে হয় নাই? এ সকল কি ব্রাহ্মদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। আর গোস্বামীমহাশয় প্রচারক না থাকিলে কি এ সকল বিষয় অনুসন্ধানের পক্ষে কোন বাধা আছে? এ সকল অনুসন্ধানের পক্ষে যে

তাঁহার প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক তাহার যুক্তি কি? আমরা বলি যদি একজন ব্রাহ্মপ্রচারক খৃষ্টধর্মাবলম্বী হইয়া যান ও বলেন যে খৃষ্টধর্মে-অনেক গূঢ়তত্ত্ব আছে যাহা তোমরা এখনও জান না, আমি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে সে বিষয়েও আমাদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেজন্য তাঁহার প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন নহে। বরং যে স্থানে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে সে স্থানে প্রচারক পদ হইতে দূরে থাকিয়াই বিচার সুন্দর রূপে চলে। সত্যের প্রতি ব্রাহ্মসমাজ কখনই অনাদর করেন নাই, করিবেনও না। তাহা বলিয়া কি বিশ্বাস ও কার্যের কোন ভিত্তি থাকিবে না? গোস্বামী-মহাশয়ের অবলম্বিত যে সকল মত ও কার্যপ্রণালীর উল্লেখ অগ্রে করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ মত কি তাহা সকলেই জানেন। ব্রাহ্মসমাজ অনেক কাল পূর্বেই এ সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছেন। এইগুলিকে পত্র লেখকগণ নিজেরাই নূতন বলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাসেই ওগুলি ব্রাহ্মসমাজের চিরাবলম্বিত মত ও প্রণালীর বিরুদ্ধ। তবেই দেখা যাইতেছে এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ও কার্য্যের স্থির ভিত্তি রহিয়াছে। যদি এক্ষণে কেহ সে ভিত্তি সরাইতে চান, চেষ্টা করুন; কিন্তু তাঁহার যে প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে তাহার যুক্তি কি? গোস্বামীমহাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার যে তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা দ্বারা বিশেষ রূপে ধর্মভাব প্রচার হইতেছে ও হইবে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম বলিলে আমরা যে পূর্ণাঙ্গ নির্মল ধর্মকে বুঝি তাহা আর তাঁহা দ্বারা প্রচারিত হইতেছে না এবং আমরা যতদূর জানি তিনিও ইহা অনুভব করিতেছেন ইহা স্মরণ রাখিয়া সকলে কার্য করিবেন।"

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ই সম্ভবতঃ এই মন্তব্যগুলি লিখিয়া থাকিবেন। তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তিকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কুযুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল—অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিজয়কৃষ্ণের বিচার ব্যাপারটি এতই অসমর্থনীয় ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় একবার বলিলেন—সত্যের প্রতি ব্রাহ্মসমাজ কখনই অনাদর করেন নাই, করিবেনও না। পরক্ষণেই বলিতেছেন ব্রাহ্মসমাজ অনেক কাল পূর্বেই এ সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছেন। মত যদি স্থির করিয়াই ফেলিয়াছেন তবে আর নূতন সত্যের পথ উন্মুক্ত বলা যায় কি করিয়া? শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তব্য শেষ করিলেন এই বলিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম বলিতে যে পূর্ণাঙ্গ নির্মলধর্মকে আমরা বুঝি তাহা যে আর বিজয়কৃষ্ণের দ্বারা প্রচারিত হইতেছে না তাহা বিজয়কৃষ্ণও অনুভব করিতেছেন, অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণের দোষ যে পৃথকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে

তাহাই নহে, এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব confession বা স্বীকৃতিও আছে। অথচ বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার পদত্যাগ পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মধর্মকে সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করি·········আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছি ও করিব।" ইহার দ্বারা কি বিজয়কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন না যে সত্যকার ব্রাহ্মধর্ম প্রচার তিনিই করিতেছেন, সুতরাং দোষ স্বীকৃতি কোথায়? তবে হাঁ ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থিরীকৃত ধারণার রদ বদল হইল কি না, সর্বসম্মতি ক্রমে ঈশ্বর লাভের উপায় যাহা সাব্যস্ত হইল তাহার এতটুকু লঙ্ঘন হইল কিনা, ইহাই যদি বিচার্য্য হয় তবে স্বতন্ত্র কথা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য যে মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই তাহা কালীনাথ দত্ত মহাশয় তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত এক পত্রের মাধ্যমে দেখাইবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে কার্য্যনির্বাহক সভার প্রথম বিচার্য্য হওয়া উচিত ছিল এই যে বিজয়বাবু যে ছয়টি কথা বলিতেছেন, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কোন মূল সত্যের বা কোন লিপিবদ্ধ নিয়মের উপর আঘাত করে কিনা। দ্বিতীয় বিচার্য্য হওয়া উচিত ছিল এই যে ঐ ছয়টি কথা সত্য কি অসত্য এবং তদ্বারা মানবাত্মার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কি না। এই বিচার্য্য দ্বয়ের যথেষ্ট বিচার না করিয়া কার্য্যনির্বাহক সভা একটি মাত্র বিচার্য্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা এই, বিজয়বাবু এখন কি কি বলেন ও করেন। এই বিষয়ের অনুসন্ধানান্তে সেই সমস্ত কথা ও কার্য্য একেবারে "অতীব আপত্তিযোগ্য এবং এতদ্বারা ব্রাহ্মধর্মের গুরুতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ভবিষ্যতে এ গুলিকে বাধা দিবার উপায় করুন" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কার্য্যনির্বাহক সভা একেবারে দ্বিতীয় মন্তব্য বিজয়বাবুর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের মতে প্রথম বিচার্য্যের অনুসন্ধান না করাতে কার্য্যনির্বাহক সভা বিজয়বাবুর প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় বিচার্য্যের অনুসন্ধানে ও বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঐ সভা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার প্রাপ্ত সভার ন্যায় কার্য্য করেন নাই, প্রত্যুত অনুসন্ধান বৃত্তিকে স্ফূর্তি না দেওয়াতে প্রকারান্তরে তাহাকে নিরোধ করিয়াছেন।" সম্পাদকীয় প্রশ্ন "এ সকল বিষয়ের বিচার কি পূর্বে কখনও ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই?" ইহার উত্তরে দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে আমরা জানি পূর্বে কখনও এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান বা বিচার হয় নাই। গোস্বামীমহাশয়ের প্রচারক না থাকিলেও এ সকল বিষয় অনুসন্ধানের পক্ষে কোন বাধা নাই এই ইঙ্গিতের উত্তরে দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, আমরা তাহাতে বাধা আছে বলিয়া আপত্তি করি নাই, তাহাতে বিজয়বাবুর প্রতি অন্যায় ও অবিচার হইয়াছে বলিয়া আপত্তি

করিতেছি। শুদ্ধ অমূলক আশঙ্কা পরবশ হইয়া কাহারও দোষ সাব্যস্ত হইতে পারে না, কাহাকেও পদ হইতে অপসৃত হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। সম্পাদকীয় মন্তব্যে কোন ব্রাহ্ম প্রচারকের খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী হইয়া যাওয়ার উদাহরণ প্রয়োগ সম্বন্ধে দত্তমহাশয় বলিয়াছেন যে এ স্থলে যে রূপ আমূল পরিবর্তনের কথা হইল, বিজয়বাবুর সম্বন্ধে সে রূপ আমূল পরিবর্তনের নাম গন্ধও কাহারও মুখে এমনকি কার্য্যনির্বাহক সভার মন্তেব্যেও ইঙ্গিত করা হয় নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার সাধারণের নিকট নিবেদনে বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের মতের সঙ্গে তাঁহার মতের যে বিশেষ প্রভেদ নাই তাহাও বুঝা যাইবে। সুতরাং এ স্থলে খৃষ্টধর্মাবলম্বীর দৃষ্টান্ত আদৌ প্রযোজ্য নয়। পরে দত্তমহাশয় দেখাইয়াছেন যে বিজয়কৃষ্ণের প্রচারিত মতগুলি ব্রাহ্মসমাজের চিরাবলম্বিত মত ও প্রণালী বিরুদ্ধ নহে। কারণ ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"। ইহাতে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আচার্য্য ও প্রাণায়ামের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। স্বয়ং রামমোহন রায় কোন স্থলে গুরুকে সন্তাপহারক বলিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনীতে সাধনচাঞ্চল্য নিবারণের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি ক্রমোচ্চ সোপান ক্রমশঃ অবলম্বন করিয়া যে সাধক পরব্রহ্মে আত্মার সমাধি সাধনে সমর্থ হয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কোন সংখ্যায় ইহা বলা হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদী হইতেও বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে বিজয়কৃষ্ণ কিছু মারাত্মক রকমের নূতন কথা বলেন নাই। পরিশেষে দত্ত মহাশয় বলিলেন, সেদিন মাঘোৎসবের সময় বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নগেন্দ্র-বাবু ও কৃষ্ণবাবু চৈতন্য ও নানকের জীবনী বিষয়ক বক্তৃতাতে কি আর বলিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন? কৃষ্ণবাবু গুরুদ্বারা শক্তি সঞ্চারের প্রক্রিয়া ও প্রণালী পর্য্যন্ত সেখানে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সেদিন চুঁচড়ায় ভক্তিভাজন প্রাধানাচার্য্য মহাশয় প্রথম উপদেশে সমবেত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মদিগের প্রতি সমভাব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বিজয়বাবু আর অধিক কি করিয়াছেন?" দত্তমহাশয়ের এই পত্রের মন্তব্যে সম্পাদক মহাশয় অর্থাৎ শিবনাথ লিখেন যে কার্য্যনির্বাহক সভার যে কার্যকে দত্তমহাশয় অবিচার বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসাধারণ যদি ইহাকে তাহাই অনুভব করিতেন তবে অন্ততঃ বিগত উৎসবের সময় এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন দেখিতে পাইতাম। কৈ আন্দোলন তো প্রায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আন্দোলন হইয়াছিল কি না তাহা আজ আর বলা শক্ত, তবে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণকেও যদি

ব্রাহ্ম বলিতে হয়, তবে সেখানে বিজয়কৃষ্ণকে প্রধান আচার্য্য রূপে মনোনীত করাকে বিচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের স্পষ্ট প্রকাশ বলিতে হয় বই কি। তার পর আলোচ্য সময়ের পরও বহু ব্রাহ্মের বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ, তাহাও কি বিচারকে অবজ্ঞা করারই প্রমাণ নয়? আর তর্কের খাতিরে আন্দোলন কিছু হয় নাই স্বীকার করিলেও সম্পাদক মহাশয়ের সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় না। বুঝিতে হইবে ন্যায় অন্যায়ের কোন স্বতন্ত্র মাপ কাঠি নাই, বিরুদ্ধ আন্দোলন প্রবল না হইলে ধরিয়া লইতে হইবে বিচার নির্দোষ! গ্যালিলিওর মৃত্যুদণ্ড, যীশুর ক্রুশে জীবননাশও তাহা হইলে বিচারের মানদণ্ডে নির্ভুল হইয়াছিল, কেন না বিরুদ্ধ আন্দোলন তেমন তীব্র হয় নাই।

কালীনাথবাবুর অভিযোগ যে বিজয়কৃষ্ণের অবলম্বিত মত যে মিথ্যা তাহা কর্মকর্তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। সম্পাদক মহাশয় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে ব্রাহ্ম সাধারণের বর্তমান মত ও সাধনপ্রণালীই প্রমাণ দিতেছে যে ব্রাহ্ম সাধারণ এই সমুদায় মতের বিচার করিয়াছেন এবং বিচার করিয়া এই সমুদায় মত অবলম্বনীয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ প্রচলিত মতই মানদণ্ড, তাহার সহিত না মিলিলেই তাহা অসত্য ও পরিত্যাজ্য। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। "তবে সত্যের প্রতি ব্রাহ্মসমাজ কখনও অনাদর করেন নাই, করিবেন ও না" উপরের উক্তির সহিত এই দাবীর যেন কোথায় অমিল হইয়া যাইতেছে! সম্পাদক মহাশয় অভিযোগের একটুকুও যে মানেন নাই তাহা নহে। তিনি বলিতেছেন, "তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এ বিষয়ে আরও গভীরতর চিন্তা ও অনুসন্ধান করা উচিত ছিল, গাঢ়তর বিচার করা উচিত ছিল। এই কথার উত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমরা সকল বিষয়ের যেরূপ বিচার সচরাচর করিয়া থাকি, এ বিষয়েরও সেই রূপ বিচারই হইয়াছে। × × × সমগ্র বঙ্গ সমাজেই গাঢ় চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার বড়ই অভাব, নিতান্ত গুরুতর বিষয়েও আমরা যথেষ্ট চিন্তা ও অনুসন্ধান করি না। বিশেষতঃ ধর্ম বিষয়ে আমাদের চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসা নিতান্তই অল্প। আমাদের এই জাতিগত স্বভাবগত ত্রুটি বর্তমান বিষয়েও ঘটিয়াছে, ইহা যদি কেহ বলিতে চান আমরা তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে প্রস্তুত নই।" এই বলিয়াই যোজনা করিতেছেন, "তবে আমাদের মতে মীমাংসাটা ন্যায়বিরুদ্ধ হয় নাই।" সুতরাং বিচারক যখন বলিতেছেন মীমাংসায় অবিচার নাই তখন আপীল অগ্রাহ্য। বিজয়কৃষ্ণ যে ছয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য কি অসত্য এবং তদ্দ্বারা মানবাত্মার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কি না ইহার বিচার হয় নাই,

কালীনাথবাবুর এই অভিযোগের চূড়ান্ত উত্তর দিলেন সম্পাদক এই বলিয়া—বিচার যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ ও সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ। অকাট্য যুক্তি,—অভিযোগ, যে হেতু উপরিউক্ত বিচার হয় নাই সেই হেতু পদত্যাগ পত্র গ্রহণ উচিত হয় নাই। উত্তর—যে হেতু পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, সে হেতু বিচার যে হইয়াছে তাহা প্রমাণিত। ইহাই কি চক্রাকার যুক্তির (arguing in a circle) চমৎকার উদাহরণ ?

তাহার পর সম্পাদক মহাশয় গোস্বামীমহাশয়ের প্রচারিত মত সমূহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কোন মূল সত্যের বা কোন লিপিবদ্ধ নিয়মের উপর আঘাত করিতেছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনায় বলিয়াছেন, গোস্বামীমহাশয় যে সমাজের নিয়ম পালন এবং সমাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় নহেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।* যাহা হউক ইহা, স্পষ্টতই বুঝা যায় যে একজন সাধারণ ব্রাহ্মের পক্ষে যে যে মত এবং কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা যথেষ্ট, একজন প্রচারকের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। প্রচার কার্য্য চালাইতে হইলে সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধি এবং প্রচারকগণের মধ্যে কেবল মূল সত্য নহে, কতিপয় বিশেষ বিশেষ মত এবং সাধারণতঃ ধর্মসাধন ও প্রচারপ্রণালী সম্বন্ধে ঐক্য মত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বলা বহুল্য যে মূল সত্য বিষয়ে একতা থাকিলেও এই সমস্ত বিষয়ে গোস্বামীমহাশয়ের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে। × × × গোস্বামীমহাশয় বলেন গুরুদত্ত মন্ত্রে বিশেষ শক্তি আছে, ব্রাহ্ম সাধারণ বলেন নাই। গোস্বামীমহাশয় বলেন উচ্চতর ধর্ম সাধনের পক্ষে গুরুর বিশেষ আনুগত্য আবশ্যক, ব্রাহ্ম সাধারণ বলেন আবশ্যক নহে, গোস্বামী-মহাশয় বলেন অধিকাংশ স্থলে প্রাণায়াম বা শ্বাস নিয়ামক সাধনের আবশ্যকতা আছে, ব্রাহ্ম সাধারণ বলেন আবশ্যকতা নাই—আধ্যাত্মিক সাধনই যথেষ্ট। ইহাকে বিরোধ বলে না ত কি বলে ? × × উদার চেতা গোস্বামীমহাশয় এই গুরুতর

---

*এই মন্তব্য দ্বারা সম্পাদকমহাশয় বিজয়কৃষ্ণের প্রতি সমাজ কর্তৃপক্ষের স্থায়ী বিরূপতা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। সমাজ বলিতে স্পষ্টতই সম্পাদক মহাশয় সমাজের কর্তৃপক্ষগণকে ধরিয়া লইয়াছেন। যে বিজয়কৃষ্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ পূজনীয় মহর্ষিকেও ধর্ম প্রচার বিষয়ে সাংসারিক প্রভুত্ব প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিতে বিনীত অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃকনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের ধর্ম প্রচার বিষয়ে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে পারিবেন না তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ এবং সেই জন্যই কর্তৃপক্ষদের মনে একটি প্রচ্ছন্ন বিরূপতা। এই বিরূপতা লইয়া ন্যায় বিচার কিরূপে সম্ভব ? —লেখক

পার্থক্য দেখিয়াই মূল সত্যে একতা সত্ত্বেও পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন এবং কার্য্যনির্বাহক সভাও এই কারণেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। খুব ভাল কথা, কিন্তু গোস্বামীমহাশয়ই ঠিক বলেন কিনা ইহার বিচারের প্রয়োজন ছিল কি না, এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। প্রচলিত ধারণা হইতে পৃথক বলিয়াই তাহা অগ্রাহ্য হইলে অগ্রসরের পথ যে বন্ধ হইয়া যায়। কলম্বাস যদি ভূমধ্যসাগরের সীমান্তে রক্ষিত Thus far and no further আদেশ লঙ্ঘন না করিতেন, তবে আমেরিকা আবিষ্কার হইত কি? আর পার্থক্য হিসাবেই যদি অসহ্য হইয়াছিল তবে বিচারের অবতারণা কেন, স্বেচ্ছায় দত্ত পদত্যাগ পত্র সানন্দে গ্রহণ করিলেই চুকিয়া যাইত।

চৌত্রিশ

অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের Behold the Man পুস্তকে মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের জীবন আলোচিত হইলেও, প্রসঙ্গতঃ বিজয়কৃষ্ণের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া যাইবার কারণ সমালোচকের দৃষ্টিতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পরে লেখা হইলেও, দত্তমহাশয় ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার বিবৃতি প্রত্যক্ষদর্শীরই বিবৃতি। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আলোচনাকে পক্ষপাত দুষ্ট মনে করিবার হেতু অল্প। বিজয়কৃষ্ণের কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা অনেক কিছু লিখিয়াছি, তথাপি দ্বিজদাস দত্তমহাশয়ের ন্যায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিব সাক্ষ্যকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিতেছেন ব্রাহ্মসমাজ মূলতঃ সত্যকার ধর্মোপলব্ধির জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কেশবের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে সকল কর্মকর্তার হাতে পড়িল, তাঁহাদের আদর্শ হইল তথাকথিত রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া, সমাজ সংস্কার ও তত্ত্বালোচনা। যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য দিয়া যাচাই করিতে হয়, তবে উহার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজয়কৃষ্ণকেই ধরিতে হয়। ১৮৭৮ সালের ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে দেখা যায় যে দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় ও ইহাই উচিত মনে করিয়াছিলেন এবং বিজয়কৃষ্ণকে সকল কামিটির প্রথম ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করাই সমীচীন বোধ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক রিপোর্টে প্রচারকগণের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের নামই সর্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৮৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টে কিন্তু প্রচারকদিগের নামের

ক্রম এইরূপ—শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এই ক্রমিক অথচ সুস্পষ্ট পরিবর্তন বিশেষ অর্থজ্ঞাপক এবং আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই যে ১৯১১ সালে শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিন জন প্রধানের নাম এই রূপ করিয়াছেন,—আনন্দমোহন বসু, শিবচন্দ্র দেব, ও উমেশচন্দ্র দত্ত। বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আপন নাম করেন নাই, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের ?

আমরা পূর্বেই অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি যে দ্বিজদাস দত্তের মতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে যদি আত্মশোধন এবং ভগবৎ উপলব্ধির প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা যায়, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসু নন, দুর্গামোহন দাস নন, শাস্ত্রীমহাশয়ও নন তাহার প্রতিষ্ঠাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। দত্ত মহাশয় নাকি সার আলফ্রেড ক্রফট কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ঐ উত্তর দিয়াছিলেন।

১৮৮১ সাল হইতেই শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় বিজয়কৃষ্ণকে খোঁচা দিয়া আসিতে ছিলেন, তিনি অতিমাত্রায় ভাবালু ও অতীন্দ্রিয়-বাদী এবং যথাতথা হরিনাম গ্রহণ করেন এই বলিয়া। ইহা হইতে এই রূপ মনে করা অনুচিত হইবে না যে কেশবের সহিত পাল্লা দিবার জন্য সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় বিজয়কৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল। তারপর সাধারণ সমাজ যখন কতকটা দাঁড়াইয়া গেল এবং বিশেষ করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যখন কেশবচন্দ্র গতাসু হইলেন তখন সাধারণ সমাজের কর্মকর্তাগণ ভাবিলেন যে বিজয়কৃষ্ণের সহিত পৃথক হইলে ক্ষতির সম্ভবনা অল্প। বিজয়কৃষ্ণের সর্বজনবিদিত প্রবল ভক্তিবাদ, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক সংযম প্রচার, আচারে ব্যবহারে বিদেশীয়ানার প্রতি অনাসক্তি কথনই কর্মকর্তাদের মনে সায় পায় নাই, অথচ তাঁহারা দেখিলেন যে যতদিন বিজয় তাঁহাদের মধ্যে ততদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে তাঁহাদের গণ্য হইবার আশা অল্প। বসুমহাশয় ও শাস্ত্রীমহাশয় ভাবিয়া থাকিবেন যে বিজয়কৃষ্ণকে সরাইতে পারিলে তবেই তাঁহারা সমাজে অবাধে বিদেশী আচারব্যবহার চালাইতে পারিবেন। স্ত্রী পুরুষে অবাধ মেলামেশা, যাহার প্রশ্রয় গোস্বামীমহাশয় কখনও দেন নাই গোস্বামীমহাশয়কে সরাইতে পারিলে তবেই তাহার আটক থাকিবে না। কিন্তু তাঁহাকে সরান যায় কেমন করিয়া ? বিরোধের কারণ মিলিতে অবশ্য বিলম্ব হইল না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সিলেট হইতে এক ডাক্তার ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসঙ্গীতে হরিনামের উল্লেখে আপত্তি জানাইয়া পত্র পাঠাইলেন। সমাজের অদ্বৈতবাদী দল দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেল যে বেদীর উপর হরিনাম লওয়া চলিবে না। দ্বিজদাস দত্তমহাশয় বলিতেছেন যে তিনি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাস যাইতে

না যাইতেই দেখা গেল যে বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক আবাস পরিত্যাগ করিয়া সুকীয়া ষ্ট্রীটে দুকড়ি ঘোষের বাসায় আসিয়া উঠিলেন। পরে প্রকাশ পাইল যে হরিনাম নিষেধ প্রস্তাব বিজয়কৃষ্ণের গোচরে আনা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আচার্যের পদ ত্যাগ করেন। দ্বিজদাস দত্তমহাশয় সন্দেহ করেন যে হরিনাম নিষেধ প্রস্তাব বিজয়কৃষ্ণের সহিত বিবাদ বাধাইবার একটা অজুহাত মাত্র। কারণ তাহার পরও বেদী হইতে হরিনাম বহুবার শুনা গিয়াছে এবং কাহারও নিকট হইতে কোন প্রতিবাদ উঠে নাই। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে হরিনাম নিষেধ রূপ শর বিজয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

বোস শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় অবশ্য দেখিলেন যে হরিনাম গ্রহণের মত একটা সামান্য অজুহাতে বিজয়কৃষ্ণের পদত্যাগ গ্রহণ করিলে সাধারণ্যে তাঁহাদিগকে নিন্দিত হইতে হইবে। বিজয়কৃষ্ণের খ্যাতি তখন শাস্ত্রীমহাশয়ের অপেক্ষা বহু গুণ বেশী সুতরাং একটা অতি তুচ্ছ কারণে যদি বিজয়কৃষ্ণকে সমাজত্যাগ করিতে দেওয়া হয়, তবে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিপ্রায়কে লোকে সন্দেহ করিবে। সুতরাং তাঁহাকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাদের অকাপট্যে বিশ্বাস করিয়া পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিলে কি হইবে, বিজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কার্য্যকরী সভার সভ্যগণের দ্বারা সযত্নে জিয়াইয়া রাখা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে যখন তাঁহারা বিজয়কৃষ্ণকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখনও গোস্বামীর বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ পত্র কর্তৃপক্ষদের হাতে বিচারাধীন। বিচারের ইহা অপেক্ষা বিকৃতি কল্পনা করা যায় না।

কর্মকর্তাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ না আসিয়াই পারে না। যদি তাঁহারা বিজয়কৃষ্ণের মতবাদ অসহ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তবে তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হইল না কেন? আর যদি বা পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করানই হইল, তবে অভিযোগ পত্রগুলিকে সযত্নে জিয়াইয়া রাখিয়া তাঁহার উপরে সাড়ম্বরে আবার অনুসন্ধান চালান হইল কেন? বিজয়কৃষ্ণের মতামত কি কার্য্যকরী সভ্যগণ পূর্বাহ্নেই জানিতেন না? তবে এই চালের কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বিজয়কৃষ্ণের অপসারণের একটা কারণ প্রচার করা। বিজয়কৃষ্ণের পদত্যাগ গ্রহণ করিলে সেই সুযোগ মিলে না, সেইজন্যই পদত্যাগ পত্র উঠাইয়া লওয়ার অনুরোধ। কর্তৃপক্ষ যদি অকপটে কাজ করিতে চাহিতেন, তবে তাঁহারা বিজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ পত্রের নিষ্পত্তি করিয়া, তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিব এই সিদ্ধান্ত লইয়া তবে তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার

করিতে বলিতেন। আরও কৌতুকের বিষয় এই যে উল্লিখিত দুইখানি অভিযোগ পত্র কে লিখিয়াছে এবং কি আছে উহাতে, তাহা তখনও বিজয়কৃষ্ণকে জানান হয় নাই এবং ব্রাহ্ম জনসাধারণকেও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে জানান হয় নাই।

বিচারের নামে ইহা একটা কত বড় অবিচার তাহা বলিয়া দত্তমহাশয় ইহাকে সাধারণ সমাজের আমলাতান্ত্রিক জবরদস্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়াছেন। কেশবের সহিত বিরোধের ফলে যখন সাধারণ সমাজ স্থাপিত হয়, তখন অধিকাংশের মতকে সম্মান দেওয়া হইবে ইহাই সাব্যস্ত হয়। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের ব্যাপারটিকে কার্য্যকরী সভ্যদিগের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইল না। সাধারণ সভায় যদি বিজয়কৃষ্ণের পদত্যাগ পত্র উপস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্ম জন-সাধারণকে উহার উপর মতামত দিবার সুযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্ম জনসাধারণ নিঃসন্দেহে কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে মত দিতেন এবং সেই ভয়েই কর্তৃপক্ষ সে পথে যাইতে সাহস করে নাই। কর্তৃপক্ষের কাজ সমাধা হইবার পূর্বেই অবশ্য বিজয়কৃষ্ণ উহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে তাঁহারা অন্ধকারে গোপনে কাজ করিতে চান, ব্রাহ্মসাধারণকে কিছুই জানাইতে চান না, তখন তিনিই সাধারণের দরবারে আপনার মামলা উপস্থিত করিলেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম বন্ধুগণের নিকট বিনীত নিবেদন" কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার আবেদন বা আপিল। অবশ্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার ঐ নিবেদন সত্ত্বেও ব্রাহ্মসাধারণকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হইবে না, তাই তিনি চার দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন।

দত্তমহাশয়ের মতে বিজয়কৃষ্ণের ধর্মমত বিচার করিবার জন্য যে সাব কমিটি গঠিত হইল তাহা ধর্ম বিষয়ে ঠিক ততদূর সমর্থ ছিল, যতদূর সমর্থ ছিল সেই বিচারক সংঘ যাঁহারা গ্যালিলিওকে তাঁহার জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মতামত লইয়া বিচার করিয়াছিল। সাধারণ সমাজের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে যদি কাহারও কথা বলিবার অধিকার ছিল, তবে তাঁহারা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ চক্রবর্তী। অথচ তাঁহারা কমিটিতে স্থান পাইলেন না, স্থান পাইলেন কতকগুলি মুখ্যতঃ রাজনৈতিক এবং অপরিণত ধর্মপ্রচারক। মজা এই যে এই সাবকমিটি বিজয়কৃষ্ণের দ্বিতীয়বার পদত্যাগের পরেও পরম উৎসাহের সহিত আপনাদের কাজে লাগিয়া রহিলেন এবং বিজয়কৃষ্ণকে তাঁহার কার্যকলাপের জবাবদিহি করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ আর তাঁহাদিগকে বাধিত করিতে চাহিলেন না, ঐ সাবকমিটির নিকট জবাবদিহি করিতে তিনি অস্বীকার

করিলেন। তখনও উচিত ছিল অন্য সাবকমিটি গঠন করা, কিম্বা ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট ব্যাপারটি উপস্থিত করা, কারণ ব্যাপারটি যাঁহাকে লইয়া, তিনি যে সে ব্যক্তি নন, প্রতিষ্ঠানের একরূপ জন্মদাতাই তিনি। বসু শাস্ত্রীমহাশয় তাহা করিলেন না, তাঁহারা তত্রাপি আপনাদের পথেই আগাইয়া চলিলেন। বিজয়কৃষ্ণ পদত্যাগ করিলে কি হইবে, তাঁহারা তাঁহার বিচার করিবেনই! পরম অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহারা বিজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে মামলা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, বিজয়কৃষ্ণের অজ্ঞাতে এবং অনুপস্থিতিতে। দত্তমহাশয় বলেন যে, আনন্দমোহনের গভীর ব্যবহার-জ্ঞান যে কিরূপে এই বেআইনী কার্য্যে তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিল তাহা বুঝা দুষ্কর। যে শিবনাথ বিজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন, তিনিই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণের বিচারক হইয়া বসিলেন। আইনের ইতিহাসে এই ব্যবস্থার জোড়া মেলা ভার।

আনন্দমোহন, শিবনাথ এবং তাঁহাদের অনুগত তিন জন শাগরেদ বিজয়-কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যে চার্জশীট প্রস্তুত করিলেন, দত্তমহাশয়ের মতে সেই চার্জশীটের বহু অংশই তাঁহাদের নিজেদের অনেকের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কার্য্যকরী কমিটিতে ছিলেন আদিনাথ চট্টো, হেরম্ব মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মধুসূদন সেন ডঃ পি. কে. রায়, পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবদ্বীপ দাস এবং শশীভূষণ বসু। বিজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলি যে কোন কর্তাভজার বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য ছিল এবং কার্য্যকরী কমিটির অন্ততঃ তিন জন ছিলেন কর্তাভজা। কেশব সেন মহাশয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কয়েক বৎসর পরেই সাধারণ সমাজের অনেক ব্রাহ্মই প্রাণে একটা শুষ্কতা অনুভব করিয়া সমাজের নিয়মিত উপসনা ছাড়া আরও কিছুর সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। প্রাণের এই অভাব বোধের ফলেই অনেকে কর্তাভজার দলে মিশিতে আরম্ভ করেন। দ্বিজদাস দত্তমহাশয়ের মতে তারাকিশোর চোধুরীই প্রথম কর্তাভজার দলে মিশিতে আরম্ভ করেন। পরে উমেশ দত্ত, ও কালীনাথ দত্তমহাশয়ও ঐ দলে মিশিতে শুরু করেন। শাস্ত্রীমহাশয় যদিও কর্তাভজা দলে মিশিতেন না তবে তিনিও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং একটি চাবি দ্বারা পরের মনের কথা বলিবার শক্তির দাবী করিতেন।* সেই সময়ের ব্রাহ্ম প্রধানদিগের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টো, পণ্ডিত সীতানাথ এবং নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেকেই কর্তাভজার দলে যাতায়াত করিতেন। সুতরাং বিজয়কৃষ্ণের মতামত বহু ব্রাহ্ম প্রধানের নিকটেই "লাল টেনা" (red rag) ছিল না।

* এই গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—লেখক

বিজয়কৃষ্ণের মতামত যদি প্রলয়ঙ্করী এবং অসহনীয়ই ঠেকিয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় উহাদিগকে উপস্থিত করা উচিত ছিল। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিচার সাবকমিটি বা কার্যনির্বাহক কমিটির হাতে লওয়া উচিত ছিল না। কেশবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছিলেন যে সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম যাহাতে সায় না দিবে, তাহা ব্রাহ্ম মত হইবে না। গোস্বামীমহাশয়ের মতামত ব্রাহ্ম সাধারণ সমর্থন করিত কি না তাহা যাচাই করার প্রয়োজন ছিল। অথচ শাস্ত্রীমহাশয় উহাদের উপর সরাসরি রায় দিলেন, "ভ্রান্ত ধারণা।" একরূপ গায়ের জোরেই হরিনাম নিষিদ্ধ করা হইল, দেহশুদ্ধির জন্য প্রাণায়ামকে বর্জন করা হইল, ব্রাহ্ম সাধারণের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন স্বীকৃত হইল না। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার মতামতের যে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিলেন তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা হইল না, তাঁহার পদত্যাগ পত্র অত্যন্ত দুঃখের (?) সহিত গ্রহণ করা হইল, যদিও প্রায় অনুরূপ মতামত লইয়া নগেন্দ্রনাথ চট্টো, উমেশচন্দ্র দত্ত, নবদ্বীপ দাস প্রভৃতি অনেকে সমাজে রহিয়া গেলেন। দত্ত মহাশয়ের মতে বিজয়কৃষ্ণকে বিদায় দেওয়া হইল, উচিত অনুচিতের মাপ কাঠিতে নয়, সুবিধা অসুবিধার বিবেচনায়।

সমগ্র বিচার ব্যাপারটাকে দত্ত মহাশয় এইরূপভাবে দেখিয়াছেন, The executive committee whose sole object in making the enquiry was what the lawyers call, to keep the file complete, after all the formalities of a criminal trial had been gone through. When they received the report of the sub-committee, a document full of miserepresentations, exaggerations and slanders, instead of calling and placing the case before the general meeting of the members as they should have done, themselves passed final orders on it, themselves acting as prosecutors, witnesses and judges all three in one. They made the slurs cast by the subcommittee blacker still by adding a few more exaggerations, misrepresentations and perversions of truth, taking absolutely no notice whatever of the explanations given by the Goswami on trial.

ব্রাহ্ম সাধারণ যে কার্যকরী কমিটির আচরণ সম্পূর্ণ অনুমোদন করে নাই

তাহার আভাস পাওয়া যায় ১৮৮৬ সালের সম্পাদকীয় রিপোর্টে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালিক সম্পাদক ডাঃ দুকড়ি ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন, He has to record with deep regret the separation of Pandit Bijay Krisna Goswami from us on account of certain differences of opinion with the Executive committee—অর্থাৎ ব্রাহ্ম সাধারণ বিজয়কৃষ্ণের মতামত ভ্রান্ত ভাবে নাই মতের অমিল যাহা কিছু তাহা কার্যকরী কমিটির সহিত। শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় ডঃ দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের এই অসুবিধাজনক স্বীকারোক্তিকে প্রয়োজন মত সংশোধন করিয়া তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাসে লিখিয়াছেন, বিজয়কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদের কারণ ব্রাহ্ম সাধারণের সহিত তাঁহার মতানৈক্য অর্থাৎ কার্যকরি কমিটি এবং ব্রাহ্ম সাধারণ একই বস্তু! রাজা চতুর্দশ লুই যদি বলতে পারেন, রাষ্ট্র সেত আমিই (L'etat ccst moi) তবে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু অধিষ্ঠিত কমিটি যে বলিবে, ব্রাহ্ম সাধারণ সেত আমরাই, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বিজয়কৃষ্ণের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিতে হইল কারণ ইতিপূর্বে বিজয়কৃষ্ণের কোন চরিতকারই ইহার সকল তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই. উহারা এ যাবৎ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাদিতেই লুকাইয়া ছিল, অথচ বিজয়কৃষ্ণের জীবন আলোচনার পক্ষে ত বটেই এমন কি বাংলার তথা ভারতের ধর্মান্দোলনের সমগ্র ইতিহাস রচনার পক্ষেও এই সকল তথ্যের মূল্য রহিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া আসিবার পর কোন দিন কাহারও উপর কোন রূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। বর্তমান লেখকও ক্ষুব্ধ হইয়া এই সকল বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধার করে নাই—সেরেফ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেই ব্যাপারটি দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে। লেখকের ব্যক্তিগত ধারণা যে, যদিও বিজয়কৃষ্ণকে সহিয়া লইতে পারিলে ব্রাহ্মধর্মের ভালই হইত, তবে উহার সুনির্দিষ্ট মতবাদকে অপরিবর্তিত রাখিয়া বিজয়কৃষ্ণকে আপন অঙ্কে রাখা উহার পক্ষে কোন ক্রমেই বেশী দিন সম্ভব হইত না। ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও যে বেশীদিন তাহা পারিবে না তাহা আমরা পরে দেখিব তবে ছাড়াছাড়ি অনায়াসেই আরও শালীনতার সঙ্গে হইতে পারিত। বিজয়কৃষ্ণ নামের কাঙাল ছিলেন না, প্রতিপত্তির প্রয়াসী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য কোনরূপ তিক্ততার প্রয়োজন ছিল না।